# দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউল

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চৌধুরী

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড,
এলাহাবাদ

প্রকাশক
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড,
এলাহাবাদ



প্রিণ্টার
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড,
এলাহাবাদ

আমার গৃহদেবতা—

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর

রাতুল চরণ-যুগলে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

উৎসর্গ করলাম।

গ্রন্থকার

# মঙ্গলাচরণ

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুন্তলাক্রান্তগণ্ডম্ ।
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরেন্যস্তবেণুং ॥
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা ।
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং বন্ধগোপালবেশং ॥

# সূচীপত্র

| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|


— —

# সূচনা

ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণ-ভারতের দেবালয়গুলির বর্ণনা ও কাহিনী নিয়ে একাধিক বই বেরিয়েছে। হয়ত পরে আরো অনেক বেরুবে। সুতরাং, সাধারণের মনে এ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে, এই বইখানির এমন কি প্রয়োজন হতে পারে! সেই কৈফিয়ৎ দেবার জন্যেই এ ভূমিকার অবতারণা।

প্রথম কথা হচ্ছে, দক্ষিণাপথের দেবমন্দিরগুলি স্থাপত্য-শিল্পে, কারুকার্য্য, ভাস্কর্য্যে এতো অপরূপ ও অচিন্তনীয় যে, একাধিক কেন শতাধিক বইও যদি এ সম্বন্ধে প্রকাশিত হয় তো, এ গুলির সম্যক পরিচয় তাতেও সম্পূর্ণ হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, হিন্দুজাতির সংস্কৃতি, প্রতিভা, ধর্ম্মপ্রাণতা, কীর্ত্তি প্রভৃতির নিদর্শন ও আলেখ্য এই সবের মাঝে থরে থরে সাজানো আছে। এক কথায় জাতের বৈশিষ্ট্য যা, তা এরই মধ্যে বিকশিত। হিন্দুজাতের মত এমন ধর্ম্মপ্রাণ জাত জগতে আর দুটি নেই। আমাদের পরিচয় যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়, আঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতির মাঝে নয়—আমাদের পরিচয় ধর্ম্মপ্রাণতা ও ধর্ম্মানুশীলনের মাঝে। আমরা ঐহিক প্রতিষ্ঠা নিয়ে মাথা ঘামাইনি, যতটা ঘামিয়েছি, আত্মিক উন্নতির জন্যে। এইখানে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের প্রভেদ—এইখানে ওদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য। ওরা দেশ জয় কোরে বড় হতে চেয়েছে, আমরা বড় হতে চেয়েছি নিজেকে জয় কোরে। ওরা খুঁজেছে অর্থ, আমরা খুঁজেছি ধর্ম্ম—ওরা ভোগের জন্যে ব্যাকুল, আমরা ত্যাগের মহিমায় কাঙাল। ওরা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে আনন্দ পায়, আমরা অন্তরে থিতিয়ে গিয়ে রসে মগ্ন হই।

তাই হিন্দু জাতের এই যে বৈশিষ্ট্য, এই যে সম্যক্ পরিচয়, এ সব ধর্ম্মানুষ্ঠান, মন্দিরাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতির মাঝে যত পাওয়া যাবে, এতো আর কিছুতে পাওয়া যাবে না। সুতরাং, এর অনুশীলন, এর প্রচার যত হয়, ততই ভাল। এ থেকে আমরা নিজেকে চিনতে পারব, উপলব্ধি করতে পারব ভালভাবে। সেই সঙ্গে আমরা বুঝতে পারব কোন্ ধারাস্রোতকে অবলম্বন কোরে আমরা বয়ে চলেছি।

দ্বিতীয় কথা—দক্ষিণ-ভারতের দেবমন্দিরাদির আলোচনায় আরো একটা পরিচয় আমরা পাই। পরিচয় পাই, সেই সুদূর অতীতেও আমরা কতো সংস্কৃত, কতো প্রতিভাবান ছিলাম—কতো উন্নতর ছিল আমাদের স্থাপত্যশিল্প, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি, যার কাছে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধিও সসম্ভ্রমে মাথা নোয়ায়। কাজেই, অনুমান করতে পারি যে, বিংশ শতাব্দীর এই উন্নতির বীজ এরই অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল। জাতির এ গৌরবকাহিনী বড় কম কথা নয়। সুতরাং, এ সবের বিচারে আনন্দও প্রচুর, প্রচারে আত্মপ্রসাদও যথেষ্ট।

তৃতীয় কথা হচ্ছে, দেবালয়গুলির সাধারণ বিবরণ ছাড়া পৌরাণিক-কাহিনী ও কিংবদন্তী প্রভৃতির প্রয়োজন আছে। আর প্রয়োজন আছে, দেবালয়স্থিত স্থানগুলির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-বস্তু প্রভৃতির সংবাদ, কিসের চাষ-আবাদ প্রচুর পরিমাণে হয়, তার একটা মোটামুটি বর্ণনা। তাই এ সবের কিছু কিছু দেবার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে।

তারপর, মন্দির-সমিতি (Temple Committee) নিযুক্ত হয়ে ভক্তদের দেবদর্শন কতো অনায়াস-সাধ্য ও সুবিধাজনক হয়েছে, তারও বিবরণ দিয়েছি। পূর্ব্ববর্ত্তী কতকগুলি গ্রন্থে এ সবের উল্লেখ নেই, কারণ সে সময় পুরাতন নিয়মই প্রচলিত ছিল। আগে ব্রাহ্মণেতর জাতকে

বহুদূর থেকে বিগ্রহ দর্শন করতে হতো। এখন মন্দির-সমিতির মহানু-ভবতায় ভগবান সর্ব্বসাধারণের বলে উপলব্ধি করবার সুযোগ হয়েছে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ মন্দিরই হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত।

আগে এদিককার বড় বড় মন্দিরে প্রায়ই দেবদাসী থাকত। বিগ্রহের উৎসব ও আরতির সময় এঁদের নৃত্যগীত প্রচলিত ছিল। শোনা যায়, কোথাও কোথাও এই দেবদাসী সংক্রান্ত ব্যাপারে দুর্নীতির প্রশ্রয় পেয়েছিল। তাই মন্দির সমিতি এই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ কোরে পুরুষ গায়ককে দিয়ে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের প্রবর্ত্তন করেছেন। এই সব নতুন নিয়ম ও সুবিধা তীর্থভ্রমণেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তির কাছেই সুসংবাদ বলে গণ্য হবে।

ইতিপূর্ব্বে যাঁরা উক্ত তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ কোরে এসেছেন, যে মহিমা, যে আনন্দ উপভোগ করেছেন, আমার আনন্দ, আমার অনুভূতি, তা থেকে বিরুদ্ধবাদী না হোক সমবাদী হয়েও পৃথক হতে পারে এবং হওয়া সম্ভবও—সুতরাং, নিজের সে অনুভূতি সাধারণের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন ও আনন্দ, দুইই আছে। তা ছাড়া বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন অনেকেই শুনতে চেয়েছেন, তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী; কাজেই, এ গ্রন্থখানি ছাপানোর মধ্যে তাঁদের শোনাবার চেষ্টাও কতকাংশে বর্ত্তমান।

আর কয়েকটা কথা এই বই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানান প্রয়োজন মনে করি। আমরা নিজের ইচ্ছামত এবং সুবিধামত যে যে জায়গা পর পর ভ্রমণ করেছি, অপর তীর্থাকাঙ্ক্ষীদের পক্ষে তা সুবিধাজনক নাও হতে পারে। কাজেই, তাঁরা সহজ ও সুবিধামত ভ্রমণ-তালিকা পাবার জন্য যদি M. S. R. ও S. I. R. এর (দক্ষিণ অঞ্চলের দুটি রেলকোম্পানীর) প্রচারবিভাগে চিঠি লেখেন তো এর সম্পূর্ণ ও সঠিক সংবাদ তাঁরা পাঠিয়ে দেবেন (M. S. R.-এর হেড অফিস মান্দ্রাজ ও S. I. R.-এর

হেড অফিস ত্রিচিনা পল্লি)। সত্র, হোটেল, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি সব জায়গাতেই আছে। বাহুল্য বোধে সে সবের উল্লেখ করিনি। ভ্রমণকালে সঙ্গে একজন পথপ্রদর্শক দোভাষী থাকলে সুবিধা হয়। অনেক সময় রামেশ্বর মন্দিরের পাণ্ডারা তাদের ছড়িদার পাঠায় মান্দ্রাজে তীর্থযাত্রী ধরবার জন্যে। সেই সব ছড়িদারেরা পথপ্রদর্শক ও দোভাষীর কাজ করে।

শেষ কথা—যে আনন্দে আমার মন আজ কানায় কানায় ভরে উঠেছে, সে আনন্দের এক কণাও যদি কেউ এই বই পড়ে উপভোগ করেন, আমার শ্রম সার্থক হয়েছে ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করব। ইতি—

আরম্ভ—কোজাগর পূর্ণিমা, ১৩৪৮
৫২নং বালিগঞ্জ, সারকুলার রোড,
দক্ষিণ-কলিকাতা
শেষ—দোল পূর্ণিমা, ১৩৪৮
৯নং ক্লাইভ রোড, এলাহাবাদ

গ্রন্থকার

দ্রষ্টব্য :—সামরিক পরিস্থিতির জন্যে নানা বিঘ্ন বাধার মধ্যে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য পরিচালনা করতে হয়েছে। ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারিগণ অনেক চেষ্টা কোরেও ভ্রম ও ত্রুটী সংশোধন করবার সুযোগ কোরে উঠতে পারেন নি। এ দোষ তাঁদের নয়, দোষ উপস্থিত সময়ের। তাই পরিশেষে একখানি সংশোধন-পত্র সন্নিবেশিত করা হল।

মানুষের মধ্যে সাধারণতঃ দুটি মন আছে। একটি সংসারী, আর একটি বৈরাগী। একজন চায় জোট পাকাতে, আর একজন চায় সে জোট খুলতে। সারাজীবন ধরে এরই দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে। কিন্তু মানুষ অমৃতের পুত্র, সুতরাং এই অমৃতের জন্য তার মনের কোণে নিরন্তর ক্ষুধাবহ্নি জ্বলছে। তাই, আমরা দেখি, সংসারের বোঝা বইতে বইতে ক্লান্ত মন যখনই একটু অবসর পায়, তখনই সে বর্ত্তমানকে টেনে ফেলে দিয়ে নিজের ইচ্ছামত কল্পলোক রচনা কোরে, তারই নীলাকাশে মহানন্দে পাখা মেলে দেয়। কল্পনার এই ক্ষণবসন্ত তাকে বিমনা করে......পথ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। চৈত্রশেষের পাতা-ঝরা গাছের মত নিঃস্ব হয়ে গিয়ে আবার নতুন সম্ভাবনায় জেগে ওঠবার জন্যে মন তার ব্যাকুল হয়। এই নতুন ব্যাকুলতার ভারে মন তখন থরথর কোরে কাঁপতে থাকে, যেমন কোরে ভ্রমরের পক্ষসঞ্চালনে সদ্য-ফোটা ফুলের পাপড়িগুলি কাঁপে। এই সুযোগে ভ্রাম্যমান জীবনের মায়ালোক তাকে ইসারা করে, নতুন সম্ভাবনার স্বপ্নলোক মনের সূক্ষ্মতম তারে ঝঙ্কার তুলে মৃদুস্বরে গুঞ্জন করে......বলে, "মামনুসরঃ।"

কে জানে, এ অনুসরণের শেষ কোথায়? কী এর ঋদ্ধি, কী এর সিদ্ধি! তবু, মানুষের অন্তরাত্মা এই অনিশ্চিতের জন্যেই

কেঁদে মরে……ব্যাকুল হয়। সামনের প্রশান্ত, অফুরন্ত পথের দিকে চেয়ে চেয়ে অকস্মাৎ জীবনের এই অপরাহ্ন বেলায় সে হয় ত সূর্য্যোদয়ের শুভক্ষণটির কথা স্মরণ করে। হয় ত মনে পড়ে, সুদূর অতীতে, জীবনের প্রারম্ভে সম্বল ছিল কি? সম্বল ছিল এই পথ। পর্য্যটনক্লান্ত জীবন দু'দিনের জন্যে সংসারের পান্থশালায় আশ্রয় নিয়েছিল। ক্লান্তি যখন ঘুচেছে তখন আর কেন?

তাই পথের গৈরিক ধূলা মেখে মনকে ধূসর করবার জন্য 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' এই মানুষ অমৃতের সন্ধানে যুগে যুগে, কালে কালে এই পথ ধরে চলে……যার আরম্ভ নেই, শেষ নেই। আমারও জীবনের অপরাহ্ন বেলায়……সূর্য্য যখন ডুবুডুবু, তখন এই পথ আমাকে হাতছানি দিলে। আকর্ষণ এর দুর্নিবার। এ আকর্ষণকে উপেক্ষা করবে, এড়িয়ে যাবে—বিশেষতঃ এই বয়সে, এমন মানুষ সংসারে বিরল।

দাক্ষিণাত্যের তীর্থপর্য্যটন-কাহিনীর এইখানেই আরম্ভ, তবু এই আরম্ভের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

এ কাহিনীর সূচনা এমনি করে ঃ—

গত বছর দুই ধরে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে তাগাদা আসে। সুযোগ পেলেই গৃহিনী বলেন, "এখনো যদি না বেরোন হয়…… এ বয়সেও যদি তীর্থ-ধর্ম্ম না করতে পারি তো, আর কি কপালে ঘট্‌বে!"

জবাব বিশেষ দিই না, তবে আশ্বাস দিই, বলি, "ভাবনা কি ! সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ—একবার দু'জনে বেরিয়ে পড়লেই হবে।"

কিন্তু এই "বেরিয়ে-পড়া" আর হয়ে ওঠে না……দীর্ঘসূত্রতা জের টেনে চলে। "যাচ্ছি-যাব" কোরে দিনগুলো হু হু কোরে কেটে যায়।

হতাশ হয়ে নিজে আর সুবিধে হবে না ভেবে গৃহিনী একদিন উকীল দিলেন। বড় ছেলে তাঁর বিলেত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার। মায়ের পক্ষ নিয়ে সে এলো আমার কাছে ওকালতী করতে। সঙ্গে ছোট ছেলেও হাজির। দু'জনে মিলে আমাকে প্রায় কোণঠাসা করে দিলে। সুতরাং, শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা করব বলে স্বীকারোক্তি দিতেই হল।

এ স্বীকারোক্তি সফল করবার মূল হলেন 'গিরিদিদি'।

একদিন আহারের সময় 'গিরিদিদি' তাঁর দক্ষিণ-ভারতের তীর্থ-ভ্রমণের গল্প বললেন। গিরিবালা দেবী আমার আপনার বোন না হলেও, তাঁকে আমি ছেলেবেলা থেকেই 'দিদি' বলে ডাকি। তাঁর অকৃত্রিম স্নেহযত্ন ও ঐকান্তিক আত্মীয়তা আমার জীবনটিকে আশৈশব ঘিরে আছে। তাঁর মুখ থেকে স্বচক্ষে দেখা দেবালয় ও তীর্থস্থানগুলির বর্ণনা আমার মনে একটা নতুন ইচ্ছার রেখাপাত করলে।

হিন্দুর ছেলে। সংস্কার আজন্মের। কাজেই, শুনে অবধি মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। চোখ বুজলেই দেখতাম, পুণ্যতোয়া গোদাবরীর

ছলছল জলপ্রবাহ, সুদূর বিস্তৃত নীল সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস, আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়-সারির ধূসর রেখা······অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-মণ্ডিত অসংখ্য মন্দির। কানে বাজত নির্জ্জন পার্ব্বত্য-উপত্যকা মুখর কোরে শাঁখ-ঘণ্টার পবিত্র ধ্বনিতে দেব-দেবীর নিত্য সন্ধ্যারতি।

দ্বন্দ্ব চললো বৈরাগী আর সংসারী মনে। কিন্তু এতোদিনের খাটুনীতে সংসারী মন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে—কারণ, সে অপচয় কোরেছে, সঞ্চয় করেনি মোটেই······আর, বৈরাগী মন, সে তরুণ, সমস্ত জীবনে তার কাজ ছিল না······সে খাটেনি, ঘুমিয়েছে আর শক্তি সঞ্চয় কোবেছে। সুতরাং, জয় হল তারই। আরম্ভ করলাম তীর্থ-ভ্রমণের আয়োজন।

সে যুগে ভ্রমণ ও পুণ্যার্জ্জন দুইই ছিল কষ্টসাধ্য। এ যুগে মানুষের বুদ্ধি আর বিজ্ঞান, এই দুটিতে যুক্তি কোবে একে সহজ ও অনায়াস কোরে দিয়েছে। এখন 'ছয় দণ্ডে ছ'দিনের পথ' চলে যাওয়া যায়।

তবু, অক্ষম শরীরে, এই সাতষট্টি বছর বয়সে পথে-প্রবাসে অসুবিধাকে যত আয়ত্ত করা যায়, ততই ভাল। সেই ভেবে স্নেহাতুর 'গিরিদিদি'কে নানান প্রশ্নে উত্যক্ত করতে লাগলাম। দিদি যা বললেন, তা থেকে বোঝা গেল যে, ধর্ম্মশালা যতই ভাল হোক, সে বন্দোবস্ত এ শরীরে মোটেই খাপ খাবে না। ভাবনায় পড়লাম, তবে কী করা যায়!

আমাকে চিন্তান্বিত দেখে দিদি পরামর্শ দিলেন, "তার চেয়ে এক কাজ কর ভাই! ফাষ্ট কিম্বা সেকেণ্ড ক্লাসের একটা পূরো

কামরা ভাড়া করো। যখন যেখানে ইচ্ছে হবে জানালেই কামরা-খানা কেটে দিয়ে যাবে। মালপত্তর নিয়ে ওঠা-নামা, মাল-বই করা, তদারক করা, সে সব হাঙ্গামাগুলো চুকে যাবে—এ এক রকম নিশ্চিন্দি।"

কথাটা মন্দ নয়। কাঞ্চনমূল্যে অনেক সুখ-সুবিধা কেনা যাবে। সেই ভাল। কিন্তু, আব একটা ভাবনা আবার দেখা দিল ঃ—গাড়ীতে না হয় "কাকবাসা" বেঁধে ঘুমোলাম, কিন্তু খাবার বন্দোবস্ত কি হবে ! স্টেশনেব বা হোটেলেব খাবার খেয়ে এই বুড়ো বয়সে তো কাটান যায় না ! এব উপায় কি করি !

কেমন কোবে এ সমস্যাব সমাধান করা যায় ভাবছি, এমন সময় বৈবাহিক স্যার বি, এল, মিত্রের (ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র) ছেলে ভাস্কব এসে উপস্থিত। বৌমাকে মা বলে ডাকি, সেই সূত্রে ভাস্করকে বলি মামা। তাকে কাছে পেয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম ; শুনে ভাস্কব যুক্তি দিলে, "বেশ তো, এক কাজ করুন না, একটা 'টুবিষ্ট কাব' ভাড়া করুন। খরচ অবশ্য একটু বেশী হবে, তেমন সুবিধেও হবে অনেক। ধরুন বাসা ভাড়া আপনাব লাগবে না। মালপত্তব ওঠান-নামান, তার খরচ, হ্যাঙ্গাম-হেপাজৎ সেও তো বড কম নয়—তাও বেঁচে যাবে। এক এক জায়গায় 'টুবিষ্ট কাব' খানা দাঁড় কবাবেন, আব তারই চারিধারে পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে যে সব তীর্থ আছে সেরে নেবেন। রাত্তিরে ওই টুরিষ্ট কারই আপনাদের বাসা হবে। রান্না-বান্না, স্নান-খাওয়া সবই ওর ভেতব। তারপর, এক একটা জায়গা দেখা হয়ে গেলে বেলকোম্পানী ঠিক

সময়মত আবার পরের জায়গায় পৌঁছে দিয়ে যাবে। মোটের মাথায় এমন সুন্দর বন্দোবস্ত আর কিছুতে হবে না।”

ভাস্করের যুক্তিকেই অনুমোদন কোরে রেলকোম্পানীর প্রচার-বিভাগে চিঠি লিখলাম। বি, এন, আরের, প্রচার-বিভাগের কর্ম্মসচিব আমার পূর্ব্বপরিচিত। তিনি নিজে ভার নিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক কোরে দিলেন। ঠিক হল যে, হাওড়া থেকে একখানি কামরা রিজার্ভ কোরে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত যাব, তারপর দক্ষিণ-ভারত রেল কোম্পানীর কাছ থেকে ‘টুরিষ্ট কার’ ভাড়া কোরে ওই অঞ্চলের তীর্থস্থানগুলি দেখা যাবে। প্রচার-সচিব আমাদের একখানি টুরিষ্ট কারের ছবি দেখিয়ে এর সুবিধে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি বর্ণনা দিলেন। তা থেকে বোঝা গেল যে, এতে পাঁচটি লোকের শোবার ব্যবস্থা, দুটি পায়খানা, দুটি স্নানের ঘর, একটি রান্নাঘর এবং একটি চাকর-বাকরের ঘর আছে। এ ছাড়া বসবার ঘর ও খাবার ঘরের বন্দোবস্ত আলাদা। মোটকথা, এটি একটি ভ্রাম্যমান বাড়ী বললেই হয়। টুরিষ্ট কারের ব্যবস্থা দেখে খুবই খুসী হলাম।

এবার জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল, কে কে পাঁচজন যাবে! সব কথা গুছিয়ে লিখে বিলুর মাকে এলাহাবাদে একখানি চিঠি দিলাম। বিলুর মা আমার বড় ভাজ। বিলু তাঁর ছেলে, ভাল নাম রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী; কেম্‌ব্রিজের এম, এ,—উপস্থিত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক। ছোট ভাই প্রভাতকে ডেকে সব কথা বললাম। শুনে সে খুবই উৎফুল্ল হয়ে

উঠল। এবং কি কি সঙ্গে নিলে তীর্থভ্রমণকালে অপ্রত্যাশিত অসুবিধা, অভাব প্রভৃতি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে লাগল। খবরটা পৌঁছল বৌদিদের কাছে। তাঁদের আদরের দেওরও সঙ্গে যাবেন শুনে সবাইয়ের আনন্দ আর ধরে না।

সত্যি, প্রভাতকে সঙ্গে না নিয়ে যাওয়াও যায় না। আজ দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে সে আমার পাশে পাশে আছে। ছেলেবেলায় রুগ্ন ছিল বলে মা বাবার, এমন কি সংসারের সবারই বড় আদর-যত্নের পাত্র ছিল সে। মা মারা যাবার পর বাবার সমস্ত স্নেহের অধিকারী সে-ই হয়েছিল। তারপর লেখাপড়া সাঙ্গ কোরে. সে এসে আমার পাশে দাঁড়ায়······একসঙ্গে স্নেহ ও ব্যবসায়ের অংশীদার হয়। এই ষাট বছর বয়সেও সে বৌদিদের তেমনি স্নেহের পাত্র······আমারও তেমনি স্নেহের ছোট ভাই।

'টুরিষ্ট কার' অর্থাৎ আমাদের ভাষায় সেলুনগাড়ীর বন্দোবস্ত যখন ঠিক হয়ে গেল, তখন আরো পাকাপাকি ভাবে ঠিক করবার জন্যে 'সা ওয়ালেস' কোম্পানীর মাদ্রাজ-শাখার একজন ইংরাজ কর্ম্মচারীকে দিয়ে দক্ষিণ-ভারত রেলকোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে ত্রিচিনপল্লীতে চিঠি লেখালাম। উক্ত ইংরাজ কর্ম্মচারী আমার বিশেষ বন্ধু। গত চল্লিশ বছর ধরে আমি 'সা.ওয়ালেস' কোম্পানীর সঙ্গে কর্ম্মসূত্রে জড়িত। উক্ত কর্ম্মচারী যখন কলকাতার শাখা-অফিসে ছিলেন, তখন থেকে আমাদের দু'জনের পরিচয়। সে আজ প্রায় বিশ বছর আগের কথা। সুতরাং, বন্ধুত্বের খাতিরটুকু তিনি

এড়াতে পারলেন না। তা ছাড়া, দেবস্থানমের (ওদেশে দেবস্থানম্ বলে) কমিশনর সাহেবকে চিঠি দিলেন, যাতে কোনরকমের অসুবিধা বা কষ্ট আমাদের পেতে না হয়। মদ্রদেশীয় কতকগুলি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বন্ধুদের কাছে পরিচিতি-পত্রও লিখে দিলেন। বন্দোবস্ত সবই হল। যাবার কিছুদিন আগে একজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, শ্রীযুত গোষ্ঠবিহারী ধরের "তীর্থভ্রমণ-কাহিনী" বইখানি পড়তে দিলেন। আর একজন দিলেন, অধ্যাপক সারদাপ্রসন্ন দাসের "দক্ষিণ-ভারতের তীর্থ-প্রসঙ্গ।" দুখানি বইই যাবার পূর্ব্বে যত্ন-সহকারে পড়ে নিলাম। গোষ্ঠবাবুর বইখানি পড়বার সময় এক জায়গায় দেখলাম, তিনি তীর্থযাত্রীদের সযত্নে সংগ্রহ করবার জন্য কতকগুলি জিনিষের তালিকা দিয়েছেন। গ্রন্থকারের মতে জিনিষগুলি বোধ হয় ওদেশে পাওয়া যায় না। সুতরাং, প্রত্যক্ষদর্শীর বাক্য অবহেলা করতে না পেরে আমরাও চাল, মুগের ডাল, ঘি, সরষের তেল, সমস্তপ্রকারের মশলা—আরতি ও পূজার জন্য দু'সের আন্দাজ কর্পূর, পঞ্চরত্ন, সোনার বিল্বপত্র, নথ, বালা, ধনুষ্কোটিতে ধনু-পূজার জন্য সোনার ধনুর্ব্বাণ ইত্যাদি বহু জিনিষ সংগ্রহ কোরে নিলাম। এমন কি, একজন একপাত্র গঙ্গোত্রীর জল দিলেন, তাও নিতে ভুললাম না। এদিকে বিলুর মাও এলাহাবাদ থেকে প্রয়াগ-সঙ্গমের জল নিয়ে এলেন প্রচুর। পরে দাক্ষিণাত্যে পৌঁছে দেখলাম, ভূতের বোঝা বয়েছি। সরষের তেল ছাড়া, আর কোন জিনিষেরই অভাব এখানে নেই। এখানকার লোকেরা সব তাতেই নারিকেল বা তিলের তেল ব্যবহার করে।

*  *  *  *

প্রায় মাসাবধি কাল ধরে উদ্‌যোগ-আয়োজনের পর দুনিয়ার যাবতীয় জিনিষ সঙ্গে নিয়ে বিগত ৯ই জানুয়ারী দক্ষিণে মঙ্গল ঘট রেখে যাত্রা সিদ্ধির মন্ত্রজপ করতে করতে বেরিয়ে পড়লাম।

ফেব্রুয়ারী মাস। শীতের মাঝামাঝি। গরম জামা-কাপড়ও সঙ্গে নিলাম বেশী কোরে। মোট-ঘাটের পরিমাণটা সর্ব্বসমেত কী বিপুল যে হল, তা বিশদভাবে আর বোধ হয় বুঝিয়ে বলতে হবে না। মনে হল, আমাদের লট্-বহরের বহর দেখে লোকে না ভাবে যে, কাছাকাছি কোন একটা মেলায় আমরা 'হোয়াইট ওয়ে লেড ল' ধরণের একটা দোকান ফাঁদতে যাচ্ছি।

এতো আয়োজন, এতো চেষ্টা, এতো আবেগ, তবু পথে বেরিয়েই মনটা কেমন কোরে উঠল। হু হু শব্দে মোটর ছুটেছে হাওড়া স্টেশনের দিকে। যানবাহনের শব্দ, মানুষের কোলাহল, পথের জনবাহুল্য সব ছাপিয়ে কানে বাজতে লাগল বিষ্টুর কান্না, আর মনটা বারবার কোরে তারই কাছে ছুটে যেতে লাগল। বিষ্টু আমার দৌহিত্র—মা-হারা বালক সে, তার দিদিমার কাছে মানুষ হচ্ছে। ছেলেমানুষ সে······একেবারে অবুঝ। তীর্থ ভ্রমণও তার কাছে যেমন নিরর্থক, পুণ্যার্জ্জনও তেমনি অকিঞ্চিৎকর। তার সাধ্য নেই যে, আমায় বাধা দেয়, সামর্থ্যও নেই যে নিবারণ করে। "যেতে নাহি দিব" বোলে পথ আগলেও সে দাঁড়াল না, শুধু কাতর বেদনায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তার কান্না শুনে কেবলই মনে হতে লাগল—এই

স্নেহ, এই মায়া, এই আকর্ষণ—এই সবই আজন্মকাল ধরে বৈরাগী ও সংসারীর মধ্যে ব্যবধান রচনা কোরে রেখেছে। মনে হল, এই যে দুঃখানুভূতি, এই যে টান্, এই যে বন্ধন, এইখানেই তো জীবনের সার্থকতা। বৈরাগীর কষ্টি পাথরে এ সবের মূল্য না থাক, সংসারীর কাছে এই যে মূলধন। তাই ভাবি, মানুষের জীবনে কোনোটারই মূল্য কম নয়। সংসারের প্রয়োজনও যতখানি, বৈরাগ্যের প্রয়োজনও ঠিক তৎখানি।

যাত্রী আমরা পাঁচজন। পুরুষেব মধ্যে, আমি আর আমার ছোট ভাই প্রভাত। আর মেয়েদের মধ্যে বিলুর মা, আমার সহধর্ম্মিণী ও খুকুমণি। এদের পরিচয় আগে দিয়েছি, কেবল খুকুমণির পরিচয় দেওয়া হয় নি।

খুকুমণি আমার ভাইঝি—প্রভাতের মেয়ে। নামে খুকুমণি হলেও আটটি সন্তানের জননী সে। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংস্কার ও পুণ্যার্জ্জন লিপ্সা, দুইই বেশী। আমাদের এই বুড়ো-বুড়ীদের সঙ্গে বয়সে পাল্লা দিতে না পারলেও ভগবদ্‌ভক্তি ও তীর্থানুরাগে সে আমাদিগকেও ছাপিয়ে যায়।

ক্রমশঃ বিদায়ের ক্ষণ আসন্ন হল। তাকিয়ে দেখলাম, ট্রেণের কামরার দরজা ঘিরে আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীর দল। ছেলে-বৌ, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাত্নী, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির দল যারা স্টেশনে বিদায় দিতে এসেছিল, তাদের দিকে বারবার কোরে চেয়ে দেখি, আর কেবলই মনে হয়, আমরা যেন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছি।

খুকুমণির বড় ছেলে গোবিন্দও স্টেশনে এসেছিল। গোবিন্দ

বি. এ. পড়ে ; বয়স বোধ হয় বছর আঠারো। আমার স্ত্রীকে উদ্দেশ কোরে কৃত্রিম দুঃখম্লান কণ্ঠে বললে, "দিদি ভাই, এইটে কি তোমার ভাল কাজ হল ? আমাকে ফাঁকি দিয়ে বুড়োর হাত ধরে চললে ?"

গোবিন্দর কথাগুলো আসন্ন বিদায়ের ভারটাকে কতকটা হাল্কা কোরে দিলে। সবাইয়ের মুখে হাসির ঢেউ বয়ে গেল।

গোবিন্দর কথায় সায় দিয়ে আমার বড় ছেলে শচীন বললে, "ধর্ বাবা গোবি......তুইও ধর্, আমিও ধরি। চ, তোর আর আমার মা দুজনকেই ফিরিয়ে নিয়ে যাই। মামা, ভাগ্নে দুজনেরই মা আজ পালাবার ফিকির করেছে।" ভীড়ের ভেতর থেকে কে একজন মন্তব্য করলে, "আগে দলের দলপতির বিরুদ্ধে 'ইনজাংশন' ( নিষেধাজ্ঞা ) জারী কর।"

আর একবার সবাই হেসে উঠল মৃদুগুঞ্জনে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছাড়বার সঙ্কেত-ধ্বনি শোনা গেল।

ট্রেণ ছাড়তেই খোলা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আত্মীয় স্বজনের দিকে চেয়ে রইলাম......যতক্ষণ দেখা যায়। তারপর একসময় আর দেখা গেল না। নিকট গেল দূরে......বর্ত্তমান পড়ল পিছনে। এইবার দূর কখন কাছে আসবে, ভবিষ্যৎ কখন বর্ত্তমানের অন্তরাল দিয়ে উঁকি মারবে, তারই অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইলাম।

শীতের হ্রস্ব বেলা। খানিক পরেই সূর্য্য ডুব দিলেন দিগন্তের আড়ালে। স্থরু হল সন্ধ্যার ভূমিকা। গতিশীল গাছের

পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখলাম ধোঁয়ার কুয়াসা জমছে······থরে থরে। বিবর্ণ······ধূসর হয়ে আসছে দিনের আলো। রেল লাইনের দুপাশে বড় বড় মাঠ······গ্রামের অস্পষ্ট ইঙ্গিত। মনে পড়তে লাগল, বিশ্বকবির লেখনী তুলিকায় আঁকা বর্ণনা ঃ—

"মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এ ধারে পুরাতন, শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁষে।

অনেক দূরে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, এই আকাশে-মেশা গ্রামছবি······সারি সারি ঘরের চাল। হয়ত সম্পদের ভেতর ছোট একটি মরাই······একটুখানি লাউমাচা······দু-একটি জীর্ণ-শীর্ণ গরু ······পানা-ভরা পচা পুকুর। একেই আঁকড়ে তারা আজো গ্রামে পড়ে আছে। পূর্ব্বপুরুষদের ভিটে, বাপ-ঠাকুদ্দার খেলাঘর এদের কাছে পুণ্যতীর্থ······মৃত্তিকার মায়া মাতৃস্নেহের মত পবিত্র।

দেখতে দেখতে দূরের ছবি মিলিয়ে এলো। সন্ধ্যা নামল ফিকে নীলাম্বরী পোরে। ক্রমে ঘন হল সে নীলাম্বরীররঙ, তারই ওপর ফুটে উঠল এক একটি কোরে অসংখ্য তারার চুম্‌কি······ অগণ্য নক্ষত্রে ছেয়ে গেল নিস্তব্ধ আকাশের নিঃশব্দ সভামণ্ডপ। সবুজে-সুনীলে সমালঙ্কৃতা, সুজলা-শ্যামলা বাংলাদেশের সীমারেখা পার হবার আগেই পৃথিবী ছেয়ে নামল নিবিড়-ঘন রাত্রি।

চলন্ত ট্রেণে রাত্রিটা ভালই কাটল। ভেবেছিলাম ট্রেণের

ঝাঁকানিতে ঘুম বোধ হয় চোখের ত্রিসীমানায় আসবে না, কিন্তু ঠিক তার উল্টো হল। বেশ নিরুদ্বেগে ঘুমোলাম সমস্ত রাত্রি। ঘুম যখন ভাঙল, তখন সবেমাত্র সকাল। কুয়াসায় চারিদিক ঝাপসা। মনে হয়, যেন ধোঁয়ার রাজত্ব দিয়ে চলেছি। ঘড়ি খুলে দেখলাম ছটা বেজে চোদ্দ মিনিট। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণ বহরমপুর গঞ্জাম স্টেশনে পৌঁছল।

ট্রেণ ছাড়বার কিছু আগে রেলকোম্পানীর খাবার সরবরাহ-কারক (Catering Superintendent) এসে খানিকটা গরম দুধ দিয়ে গেলেন।

খানিক পরে প্রাতঃকৃত্যের পালা চলল। দেখলাম একটিমাত্র স্নানাগারে সবাইয়ের বড় অসুবিধা হচ্ছে, বিশেষ কোরে মেয়েদের।

বললাম, "তাই ত, তোমাদের জন্যে একটা আলাদা বন্দোবস্ত করতে পারলে বোধ হয় ভাল হয়।"

খানিকটা হেসে খুকুমণি জবাব দিলে, "ভাল তো হয়ই, কিন্তু বন্দোবস্তটা তো আপনার হাতে নয়—রেলকোম্পানীর হাতে যে!"

বললাম, "রেলকোম্পানীর হলেও চেষ্টা করলে একটা কিছু সুবিধে করা যায় বই কি।"

পরের স্টেশনে ট্রেণ থামতেই গার্ডকে খবর দিলাম। তিনি এসে বিনীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "বলুন, আপনাদের জন্যে কি করতে পারি।"

স্নানাগারের অসুবিধার কথা জানালাম।

গার্ডসাহেব তখুনি একখানা খালি কামরা মেয়েদের স্নানের

জন্যে ব্যবস্থা কোরে দিলেন। একখানা গোটা কামরা নিজেদের একারে পেয়ে মেয়েরাও "বত্তে" গেল।

এদিকে আমরাও প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ নির্ব্বিঘ্নে সেরে নিয়ে জানালার ধারে বসে দু'ভায়ে দু'পাশের প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করতে লাগলাম।

খানিক পরে প্রভাত বললে, "দেখো দাদা……!

মুখ তুলে ওর দিকে চাইলাম।

"তোমার ওপর ভাব রইল, ডায়েরীতে নোট করার……ও সব আমার দ্বারা হবে না। আমি বরং ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলার কাজটা করব। আর বড় বৌদিকে ( বিলুর মা ) বলি, সেও একটু-আধটু টুকে রাখুক। পরে ছবি-টবি দিয়ে বেশ সাজিয়ে একখানা বই বের করতে হবে।"

কথাটা মন্দ নয়। সেইদিন থেকে রোজনামচা ফাঁদলাম। ভরসা রইল, বিলুর মা পেছনে আছেন। কারণ, তাঁর "শিক্ষা-সহবৎ" দুইই আছে; আমার যদি কোথাও ফাঁক পড়ে যায়, সে ফাঁকটুকু তিনি ভরিয়ে দিতে পারবেন। আমার স্ত্রী পারতপক্ষে কলম ধরেন না, কাজেই তার স্মরণশক্তির উপরও কতকটা নির্ভর করলাম।

জানালার ধারে বসে বসে চেয়ে দেখি। ট্রেণ যতই অগ্রসর হয়, ততই চোখে পড়ে নানানরকমের ছোট-বড় নদী। ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। জলের অভাব এদেশে বড় একটা দেখা যায় না। রেল-লাইনের দু'পাশে যতদূর দৃষ্টি যায়, দীর্ঘশীর্ষ তাল-নারিকেলের গাছ……এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি সারি

দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যকিরণের ঝিলিমিলি……সোনালী রোদের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা। এ অঞ্চলে চাষ-বাসের প্রাচুর্য্য বড় কম নয়……শস্যসম্ভারে ভরে আছে দু'দিকের মাঠ। যতদূর নজর চলে, বায়ুপ্রবাহ ঢেউ তুলে সবুজ ক্ষেতের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। মনে হয়, শস্যসমৃদ্ধ মাঠগুলি যেন খর শীতের মিষ্টি রোদে গা মেলে রোদ পোহাচ্ছে। বাঙালী ভাবপ্রবণ জাত। তার জীবনের সঙ্গে, জন্মের সঙ্গে প্রকৃতির লীলাবিলাস পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। আষাঢ়ের নবঘন নীলগগন, শরতের শিশিরবিন্দু, হেমন্তের ধান্যমঞ্জরী, বসন্তের কচি কিশলয়……ঋতুতে ঋতুতে ফুলের মেলা……দোয়েল-শ্যামার শীষ, ভিজে-মাটির সোঁদা গন্ধ, গাছের সুশীতল স্নেহচ্ছায়া—এ যে তার অতি-পরিচিত সম্পদ। কতো দেখেছি এ সব, তবু দেখে দেখে আশা যেন আর মেটে না। এরই গৌরবে, এরই পুলকে আমরা বিমুগ্ধ, মগ্ন, সমাহিত।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে ক্রমশঃ বেলা বেড়ে উঠল। মেয়েরা ততক্ষণে এ গাড়ীতে ফিরে এসেছে। স্নানাহারের জন্যে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে তাগাদা আসছে। সময়ানুবর্ত্তিতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা দুইই এখানে অটল। কর্ত্রী আছেন বিলুর মা……মন্ত্রণাদাত্রী আছেন সহধর্ম্মিণী, স্নেহশাসিকা আছে খুকুমণি। আর প্রভাতের কথা না বললেও চলে। বয়স বেশী হলে নানানপ্রকারের রোগ যে শরীরকে ব্যাধি-মন্দির কোরে তুলে কাবু করবে, এ সহজ সত্যটুকু তাকে কিছুতে বোঝান যায়

না। সে ভাবে, তার কড়া নজরে এ দুর্নিবার সত্যও ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। তাই ভাবি, নিজের অদৃষ্টের জোরে না হোক, এদের সুকৃতি ও স্নেহদৃষ্টির মহিমায়, আজো কোনরকমে জের টেনে চলেছি।

তাগাদার দৌরাত্ম্যে স্নানাহার পর্ব্ব সমাধা কোরে নিলাম। ভাবছি, এইবার একটু বিশ্রাম করব, এমন সময় মৃদুমন্দ-গতিতে ট্রেণ প্রবেশ করল ওয়ালটেয়র স্টেশনে। ঘড়ি খুলে দেখলাম, একটা বেজে সতেরো মিনিট।

ট্রেণ থামতেই গিরিদিদির এক আত্মীয় এসে দেখা করলেন। ইনি এসেছিলেন ওয়ালটেয়রে—স্বাস্থ্যান্বেষণে। আমরা ওয়াল-টেয়রে আসব শুনে স্নেহপরবশ হয়ে গিরিদিদি বোধ হয় এঁকে চিঠি দিয়ে থাকবেন। সুতরাং, তার ওখানে ওঠবার জন্যে তিনি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। এদিকে ওয়ালটেয়রের পাবলিক প্রসিকিউটর দেওয়ান বাহাদুর রামস্বামী আয়ারের ছেলে সীতারাম-স্বামী আয়ার এসে উপস্থিত। রামস্বামী আয়ারকে আমি আগে থেকে চিঠি দিয়ে রেখেছিলাম। কি করি, কার আতিথ্য গ্রহণ করি, এই নিয়ে একটা সমস্যা উপস্থিত হল। গিরিদিদির আত্মীয়, একহিসাবে তিনি ঘরের লোক, সুতরাং তাকেই সব ঘটনা খুলে বললাম।

মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ভদ্রলোক ফিরে গেলেন এবং যাবার আগে বারবার কোরে জানিয়ে গেলেন যে, কোনরকম অসুবিধা হলে তাঁর ওখানে গিয়ে উঠতে বা তাঁকে জানাতে যেন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করি।

সীতারাম স্বামীর সঙ্গে দু-একটি কথা কইতে না কইতেই একটি ভদ্রলোক এসে নমস্কার কোরে একখানি চিঠি দিলেন। চিঠিখানা পড়ে জানতে পারলাম যে, এই পত্রবাহকই আমাদের গাইড বা পথপ্রদর্শক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। অচেনা জায়গায় একটি উপযুক্ত গাইড পেলে সমস্ত তীর্থস্থানগুলি বেশ খুঁটিয়ে দেখার সুবিধে হবে ভেবে 'সা ওয়ালেস' কোম্পানীর মান্দ্রাজ-শাখার ম্যানেজার সামনার সাহেবকে একটি ভাল লোক ঠিক কোরে দেবার জন্যে চিঠি লিখি। চিঠি পেয়ে তিনি ভার দেন স্থানীয় পর্য্যটন-পরিচালক ( Travel Agent ) রামমোহন কোম্পানীকে। এই কোম্পানীই ভদ্রলোককে গাইড নির্ব্বাচিত কোরে পাঠিয়েছেন। পারিশ্রমিকের কথাও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন—দৈনিক পাঁচ টাকা।

গাইড ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে সীতারাম স্বামীর সঙ্গে আমরা তাঁর বাগান-বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। চমৎকার জায়গায় বাগান-বাড়ীখানি—একেবারে সমুদ্রের বেলাভূমিতে। বাগান-বাড়ীর খোলা জানালা দিয়ে দৃষ্টি বিস্তার কোরে দেওয়া যায় সমুদ্রের নীলাম্বুরাশির ওপর। বাগান-বাড়ী বলতে যা বোঝায়, এটি ঠিক তাই। খানিকক্ষণ এখানে আরাম করলে শরীর ও মন উভয়েরই ক্লান্তি ঘুচে যায়। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে জানালার ধারে গিয়ে বসলাম। ঝিরঝির্ কোরে সাগরের হাওয়া আসছে…… সূর্য্যের আলোয় জ্বলে জ্বলে উঠছে বেলাভূমির বালুকণা……। লঘু মেঘখণ্ডের সঙ্গে আকাশের গায়ে সূর্য্যের লুকোচুরি খেলা

চলছে……ঘন ঘন সমুদ্রের রঙ বদলাচ্ছে, সেই আলোছায়ার খেলায়……আকাশের গায়ে, অনেক উঁচুতে মহানন্দে ডানা মেলে

সমুদ্র ও আকাশ—ওয়ালটেযব

দিয়ে পাখীবা পাক খাচ্ছে চক্রাকাবে। বেশ জায়গাটি, আবামে দু'চোখ বুজে আসছে। কিন্তু, বিশ্রামেব ইচ্ছায় একবাব গা এলিয়ে দিলে আর রক্ষে আছে! নিদ্রায চোখ জুড়ে আসবে।

## ওয়ালটেয়ার

সীতারাম স্বামী আয়াবেব বাগানবাড়ী থেকে আমরা বেলা চারটে নাগাদ সহব দেখতে বেরুলাম। প্রথমে ওয়ালটেয়রেব বাজারের ভেতর দিয়ে আমাদেব মোটব গিয়ে দাঁড়াল তাঁর বসত বাড়ীতে। সীতারাম স্বামী সযত্নে ও সসম্ভ্রমে আমাদেব বাড়ীর

ভেতর নিয়ে গেলেন। এখানকার রীতি অনুযায়ী 'গুয়া-পান' এলো। এই গুয়া-পানের খাতির আমাদের দেশের খুব পুরাতন পদ্ধতি। এর উল্লেখ ভারতচন্দ্র * প্রভৃতি কবিদের কাব্যে পাওয়া যায়। সেই পুরাতন পদ্ধতি আজো (বিংশ শতাব্দী) দক্ষিণ দেশে বেঁচে আছে দেখে সত্যিই আনন্দ হল। সেজে পান দেওয়ার রীতি এদেশে নেই, কাজেই, আস্তপান, অল্প চূণ ও প্রচুর চিকি (চিক্কণ) সুপুরী একটি রেকাবী কোরে গৃহস্বামী আমাদের সামনে ধরে দিলেন। দেখে মনে হল, সুপুরী ছাড়া অন্য কোন মশলা এ অঞ্চলের লোকে বোধ হয় ব্যবহার করে না। শুনলাম, এখানকার চিকি সুপুরীই খয়েরের কাজ করে, কাজেই পানে আমাদের দেশের মত আলাদা খয়ের দেবার দরকার হয় না।

সীতারাম স্বামীর বাড়ীতে গুয়া-পানের খাতির উপভোগ কোরে মিনিট পনেরো পরেই আমরা অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে বেরুলাম।

পথে যেতে যেতে শুনলাম, কিছুদিন আগে এখানে উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়েই ছিল। স্থানীয় উচ্চ শিক্ষার্থীরা মান্দ্রাজ সহরে গিয়ে অনেক আয়াসে তবে লেখাপড়া শিখিত। কিন্তু, গত কয়েক বছর থেকে এ অসুবিধা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে এবং শিক্ষার প্রসার ও সুযোগ দুইই উন্নততর হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো হবে। এখন এই জেলার মধ্যে ৮১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়,

* "শুনহ বিশাই-বাছা লহ গুয়া-পান"—অন্নদা মঙ্গল

এগারোটি মধ্য ইংরাজী ও তিনটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। এ জেলার অন্তর্গত পালকোন্ডা এবং ইলামঞ্চিলি অঞ্চলে নর্ম্ম্যাল ও নাইট স্কুল হয়েছে। স্থানীয় উৎসাহী যুবকেরা এই সব স্কুলের অধ্যাপনা ও তত্ত্বাবধানের ভার নেন। এখন ওয়ালটেয়রকে দক্ষিণ ভারতের একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র বলা চলে। কারণ, কয়েক বছর আগে এখানে বিখ্যাত অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ভিজিয়ানগ্রামের মহারাজা ( Maharaja of Vizianagram ) ওয়ালটেয়রে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তা ছাড়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর আধা-সরকারী দুটি কলেজও বর্ত্তমান। ভিজিয়ানগ্রামের মহারাজার সহরের ওপর মমতা খুব। সহরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করেন।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ও মনোরম সৌধমালা দেখে সত্যিই আমরা মুগ্ধ হলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি আরো প্রশংসনীয়। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-শাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যা-শিক্ষার জন্য জয়পুরের মহারাজা প্রতি বছরে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করেন। বিদ্যালয়-সংলগ্ন ছাত্রাবাসটি ঘুরে দেখতে দেখতে মনে মনে তাঁদের ধন্যবাদ দিতে লাগলাম, যাঁদের অনুগ্রহ ও মহানুভবতায় ওয়ালটেয়র আজ ভারতের একটি বিখ্যাত শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছে।

বিদ্যালয় দেখা শেষ কোরে আমরা "ভিজাগ হারবার" বা ভিজাগাপট্টম্ বন্দর দেখতে গেলাম। বন্দরটি সমুদ্রের বাঁকের ওপর। সহরের সমস্ত পূর্ব্বদিকটি ঘিরে সমুদ্র দিবারাত্রি উন্মাদ

তরঙ্গ-নৃত্যে খেলা করছে। কলকাতা থেকে রেলপথে এই বন্দরের দূরত্ব ৫৪৭ মাইল। এখানকার বন্দরে বিদেশজাত কতকগুলি ছোট ছোট দ্রব্য ও ইংলণ্ডের কয়েকটি ধাতু আমদানী হয়। আগে এখান থেকে গুড় এবং অন্য কয়েকপ্রকার শস্য ভারতের অন্যান্য স্থানে রপ্তানী হোত। এই প্রকারের রপ্তানী আজকাল ট্রেণ যোগেই হয়। বি, এন, আর রেলপথ হওয়ার পর থেকে কলকাতাকে
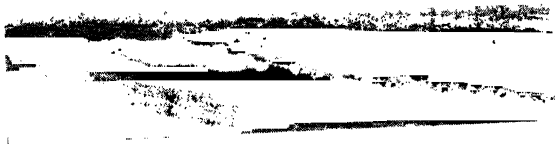
সূর্য্যোদয়—ভিজিগাপট্টম্

বাণিজ্য-কেন্দ্র কোরে আমাদের এ অঞ্চলে অনেক দ্রব্য চালান আসে। সমুদ্রকে এখানে খাল কেটে পাহাড়ের নীচে দিয়ে সহরের ভেতর আনা হয়েছে। সমুদ্রগামী জাহাজ এই খালের ভেতর দিয়ে বন্দরে এসে লাগে। তারপর পণ্যসম্ভার উজাড় কোরে দিয়ে নূতন পণ্যদ্রব্যে উদর পূরণ কোরে দেশান্তরের উদ্দেশে পাড়ি দেয়। বন্দরের একপাশে ডক বা জাহাজ মেরামতের কারখানা দেখলাম।

এখান থেকে বেরিয়ে সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠাগার, পুস্তকাগার, হাঁসপাতাল প্রভৃতি দেখতে গেলাম।

ওয়ালটেয়র ও ভিজিগাপট্টম্ পাশাপাশি। নামে প্রভেদ থাকলেও এ-দুটি একই জায়গা। অর্থাৎ এক সহরের দুটি অংশ, যেমন উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতা বা বালি ও উত্তরপাড়া। সহরের উঁচু জায়গাটিকে বলে ওয়ালটেয়র, আব নীচু জায়গাটির নাম ভিজিগাপট্টম। ওয়ালটেয়রে বাস করেন, রাজকর্ম্মচারী, অপেক্ষাকৃত ধনবান ও সৌখীন ব্যক্তিরা। এখানে জয়পুরের মহারাজা (এই জয়পুর উড়িষ্যার করদরাজা—রাজপুতানার বিখ্যাত জয়পুব নহে) ও ভিজিয়ানাগ্রামের মগারাজা প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর কয়েকটি স্বাস্থ্যাবাস আছে। আর ভিজিগাপট্টম্ হচ্ছে সাধারণ গৃহস্থের—এখানে বেশীর ভাগ এ দেশীয় লোকই বাস করে।

পুরাতন ইতিহাসে ভিজিগাপট্টমের নাম হচ্ছে বিশাখপত্তন বা বিজাগাপত্তন। বিশাখ অর্থে কার্ত্তিক। দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকের নামে এ সহরের নামকরণ হয়েছে। শোনা যায়, বিশাখস্বামীর একটি মন্দিরও এখানে ছিল। তারপর কালক্রমে সেটি সমুদ্রের কবলে গেছে। স্থানীয় লোকেরা যোগ উপলক্ষে এখনো বিশাখ-স্বামীর মন্দিরস্থিত সমুদ্রের কাছে স্নান কোরে পুণ্যার্জ্জন করে।

ইতিহাসে দেখা যায়, বিশাখপত্তন এক সময় কলিঙ্গরাজার অধিকারভুক্ত ছিল। তারপর বাহমনী বংশীয় দ্বিতীয় মহম্মদের রাজত্বের সময় মুসলমানদের হাতে আসে। পরে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমস্ত স্থানটি অধিকার করেন।

বিশাখপত্তন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে একটি বিখ্যাত জেলা। জয়পুর রাজ্যের অধিকার আর ভিজিয়ানাগ্রামকে একত্র করলে সম্পূর্ণ জেলাটির পরিমাণ হবে প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার বর্গ মাইল। চোদ্দটি জমিদারী ও সাঁইত্রিশটি সত্বাধিকারী ভূসম্পত্তি নিয়ে বিশাখপত্তন জেলা। জেলাটি শাসন-কেন্দ্রভুক্ত। এর ভেতর ইংরাজ সরকারের তিনটি খাস তালুক আছে। এই তিনটির নাম, গোলকোণ্ডা, পালকোণ্ডা ও সর্ব্বসিদ্ধি। বিশাখপত্তনে অলকাপল্লী, বিমলীপত্তন, কাসিমকোটা, বেব্বিলি প্রভৃতি দশটি সহর আছে এবং ছোট-বড় গ্রামের সংখ্যা প্রায় ন'শো। বিশাখপত্তনের চতুঃসীমার বিবরণে দেখি,—পূর্ব্বদিকে গঞ্জাম জেলার খানিকটা ও বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরে মধ্যপ্রদেশের কতকাংশ ও গঞ্জাম জেলা, আর দক্ষিণে গোদাবরী জেলা ও বঙ্গোপসাগর।

বিশাখপত্তন জেলায় নানানবর্ণের, নানান জাতের লোক বাস করে। হিন্দুর সংখ্যাই খুব বেশী, এর নীচে খৃষ্টানের সংখ্যা।

সহরের মাঝখান দিয়ে পূর্ব্বঘাট পাহাড়ের লম্বা সারি দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। এই পাহাড়-সারির পশ্চিম দিকটা জয়পুর জমিদারীর অন্তর্গত। সহরের উত্তরপ্রান্তেও একটি পাহাড়ের সারি নজরে পড়ে। এই পাহাড়-সারির নাম নিমগিরি শৈলমালা। নিমগিরির সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গটি শুনলাম প্রায় পাঁচহাজার ফিট। এই পাহাড়-সারির ঢালু জায়গা দিয়ে কতকগুলি ছোট ছোট নদী সমুদ্রে এসে মিশেছে এবং কতকগুলি ইন্দ্রাবতী, শবরী, সিল্লর প্রভৃতি নদীর সঙ্গে মিশে মহানদী ও

গোদাবরীর বুকে আত্মসমর্পণ কোরে বিলীন হয়ে গেছে। শুনলাম, মহানদীর প্রধানতম শাখা তেল নদীর জন্ম এই বিশাখপত্তন জেলায়। এখানকার পাহাড়ের ঢালু জায়গাগুলি খুব উর্ব্বরা। পাহাড়ে উদ্ভিদ, আগাছা, লতাগুল্ম ছাড়া এখানে অনেক ফলমূল, শাক-সব্জীও হয়। এ অঞ্চলের অনেক বাঁশ পাহাড়ের এই ঢালু জায়গাটিতে জন্মে। আগে ইংরাজ সরকারের যে তিনটি তালুকের উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে দুটি তালুকই বেশ সম্পন্ন এবং ইংরাজ সরকার এ দুটি থেকে প্রচুর লাভবান হন। সর্ব্বসিদ্ধি তালুকে বড় বড় জঙ্গল আছে। এই সব জঙ্গলে জ্বালানী কাঠের বড় বড় গাছ হয়। তা ছাড়া, সবচেয়ে বেশী পরিমাণ জন্মায় হরিতকী ও আমলকী। এতো বেশী পরিমাণ হরিতকী এখানে জন্মায় যে, ভারতবর্ষের বাংলাদেশ অঞ্চলে এবং আরো নানান জায়গায় এই সব হরিতকী প্রচুর পরিমাণে চালান হয়। তা ছাড়া, সাগর পারে চামড়ার কষ ধরাবার জন্যে এই সব হরিতকীর অনেকাংশ ভিজাগ বন্দর দিয়ে চালান যায়। সর্ব্বসিদ্ধি তালুকের জঙ্গলে আশ্‌না, গুগ্‌গুল, অর্জ্জুন, শাল প্রভৃতির গাছও জন্মায়, তবে এ সবের পরিমাণ খুব বেশী নয়। দাক্ষিণাত্যের আমলকী সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদকারেরা একবাক্যে প্রশংসা করেছেন। ইংরাজ সরকারের অপর তালুক পালকোণ্ডায় খুব ভাল সূক্ষ্ম কাপড় তৈরী হয়। এখানকার রকমারী বাসনপত্র ও আসবাবপত্র প্রশংসনীয়। বিশাখপত্তনেও অনেকরকম ভাল ভাল সৌখীন জিনিষ পাওয়া যায়। এ সব জিনিষ বাইরে থেকে চালান আসে না। বিশাখপত্তনের এ সব নিজস্ব

সম্পদ। যেমন, ফারফোরের বাক্স, হাতীর দাঁতের কারুকার্য্য-সমন্বিত জিনিষপত্র, মোষের শিংএর, সজারুর কাঁটার ছোটখাট ব্যবহারোপযোগী জিনিষ বা সৌখীন ঘর-সাজানো আসবাব, দাবাখেলার ছক ইত্যাদি। রূপোর অনেকরকম মডেল, ডিবে, কৌটো প্রভৃতিও পাওয়া যায়। এখানকার তোয়ালে, সুজ্‌নী, টেবিল-ঢাকা প্রভৃতি খুব চমৎকার ও লোভনীয়।

বিশাখপত্তনের বিভিন্নস্থানে যে জিনিষগুলি তৈরী হয়, তার মধ্যে সবগুলিই ভিজিগাপট্টমের বাজারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমনেচ্ছু ব্যক্তি উপহারের উদ্দেশ্যে বা স্মারক চিহ্ন হিসাবে এগুলি কিনে আনতে পারেন।

সহরের দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখা শেষ কোরে আমরা প্রাচীন দুর্গসীমার দিকে গেলাম। এখানে ডিষ্ট্রিক্ট জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, সব-ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী, মুন্সেফ প্রভৃতি সকলেরই কাছারী আছে। ট্রেজরী, কালেক্টর আফিস ও আরো দু-একটি সৌধ-শোভায় এ স্থানটি বেশ সুন্দর। সারি সারি বড় বাড়ী......পৃষ্ঠপটে পাহাড়ের ধূসর রঙ, তারই ওপর পার্ব্বত্য-উদ্ভিদের করুণায় অস্পষ্ট সবুজের ইঙ্গিত......দূর থেকে বেশ দেখায় স্থানটি। একটু দূরে আগে যেখানে "ডল্‌ফিন্ নোজ" ( Dolphin Nose ) পাহাড়ের গায়ে সেনা-নিবাস ছিল, সেখান অবধি ঘুরে এলাম আমরা। এখানে এখন সেনা-নিবাস নেই, তার বদলে ডিভিসনাল পাবলিক ওয়ার্কস এণ্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের আফিস হয়েছে।

এখান থেকে আমরা আরো কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে কয়েকটি

ছোট ছোট দেবমন্দির দেখলাম। সুব্বারাও ( আমাদের গাইডের নাম, এঁকে আমরা ভবিষ্যতে 'রাও' বলে উল্লেখ করব ) বললেন, এখানকার নাম বলতেয়র। নামটি শুনে মনে হল ওয়ালটেয়র কথাটি বোধ হয় এই থেকে এসেছে। কারণ, 'ব'টি অন্তস্থ "ব" ; কাজেই অক্ষরটী 'ওয়া'র মত উচ্চারিত হয়।

এখান থেকে বেরিয়ে প্যাগোডা ষ্ট্রীটে কোদণ্ড স্বামীর মন্দির দেখে আমরা বড় রাস্তায় এসে জগন্নাথ স্বামীর মন্দিরের সুমুখে মোটর থামালাম। দুটি পাশাপাশি মন্দির এখানে দেখা গেল। এই দুটি পাশাপাশি মন্দিরের নাম জগন্নাথ স্বামী ও ঈশ্বর স্বামী। ঈশ্বর স্বামীর মন্দিরে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান।

রাও ঈশ্বর স্বামীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার নাম বললেন, "গরুড় পদ্মনাভ।"

জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, মিঃ রাও, এখানকার সব দেবতার নামের সঙ্গেই কি 'স্বামী' প্রয়োগ করা হয় ?"

'প্রায়ই দেখবেন' বলে রাও "স্বামী" কথাটির এ অঞ্চলে যা অর্থ, তাই আমাদিগকে বুঝিয়ে দিলেন।

'স্বামী' কথার অর্থ দেবতা বা দেব। আমরা যেমন বলি, জগন্নাথ দেব, বিষ্ণু দেব, এঁরা তেমনি বলেন জগন্নাথ স্বামী, বিষ্ণু স্বামী প্রভৃতি। এখানকার দেখা একরকম শেষ হল। ঠিক করলাম, কালই 'সিংহাচলম্' দেখে এসে 'রাজমাহেন্দ্রী' যাব।

বাগান-বাড়ীর বাসায় ফেরবার মুখে সীতারাম স্বামীর যুক্তিমত রাওকে আগে থেকে 'রাজমাহেন্দ্রী' পাঠিয়ে দিলাম। যাতে সেখানে

গিয়ে ওঠবার জন্যে তিনি বাসা ঠিক কোরে রাখা ও অন্যান্য বন্দোবস্ত সেরে রাখতে পারেন।

বাগান-বাড়ীতে পৌঁছে সীতারাম স্বামীকে ধন্যবাদ জানালাম। বেশ অমায়িক ও মধুর প্রকৃতির লোক ইনি। সমস্তক্ষণ আমাদের সঙ্গে থেকে এখানকার দেখবার জিনিষগুলি বেশ যত্নসহকারে দেখিয়ে দিলেন। বিদায় নেবার পূর্ব্বে বলে গেলেন, "কাল সকালে আমার মুহুরীকে আপনাদের সঙ্গে দিয়ে দোব। সীমাচলম্ (সিংহাচলম্) দেখবার সমস্ত ব্যবস্থা সেই কোরে দেবে।"

## সীমাচলম্ (সিংহাচলম্ বা নৃসিংহক্ষেত্র)

পরদিন খুব ভোরে—তখনও ঘুমের আলস্য ভাঙেনি—সীতারাম স্বামীর মুহুরী এসে উপস্থিত, সঙ্গে একজন পূজারী ব্রাহ্মণ। বললেন, "এই পূজারী ব্রাহ্মণটিকে সঙ্গে এনেছি, আগে থেকে সেখানে পাঠালে আপনাদের সুবিধে হবে।"

বললাম, "আর আপনি" ?

বললেন, আমি "আপনাদিগকে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

মুহুরীর পরামর্শ মত পূজারীকে ট্রেণের ভাড়া দিয়ে সীমাচলম্ পাঠিয়ে দিলাম।

সীমাচলম্ ওয়ালটেয়রের আগের স্টেশন। এখানে ডাকগাড়ী

থামে না, সুতরাং ওয়ালটেয়রে নেমে এখান থেকে যাওয়াই সুবিধে। এ-দুটি স্টেশনের দূরত্ব হবে প্রায় পাঁচ মাইল।

সীতারাম স্বামীর মুহুরীকে জিজ্ঞেস কোরে জানলাম যে, সীমাচলম্ স্টেশন থেকে সীমাচলম্ পর্ব্বত অর্থাৎ যার ওপর নৃসিংহ দেবের মন্দির, সেটি প্রায় তিন মাইল দূরে। কাজেই ট্রেণে গেলে সবশুদ্ধ দূরত্ব হবে প্রায় আট মাইল। কিন্তু সরাসরি যদি মোটরে ওয়ালটেয়র থেকে যাওয়া যায়, তাহলে মাইল খানেক রাস্তা কম পড়ে এবং ট্রেণের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। রাস্তা বেশ ভালই। আমরা ঠিক করলাম মোটরে যাব। বেলা নটা আন্দাজ আমাদের মোটর দুখানি সীমাচলম্ অভিমুখে যাত্রা করলে।

ওয়ালটেয়রের শেষ প্রান্ত থেকে রাস্তার দু-পাশে আম-বাগান দেখতে পেলাম। চলেছে তো চলেছেই......এ আম-বাগানের যেন শেষ নেই, এত বিস্তৃত বাগানগুলি। ইতিপূর্ব্বে এতোবড় আমবাগান কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। সীতারাম স্বামীর লোকটিকে জিজ্ঞেস কোরে জানলাম যে, এখানকার আম খুব বিখ্যাত। এই সব বাগানের আমই দেশ-বিদেশে চালান হয়ে মান্দ্রাজী আম নাম নিয়ে বিক্রি হয়। বোম্বাই থেকে আলফানজো আমের কলম নিয়ে এসে এখানে চাষ করা হয়েছে এবং সে চাষের ফল খুবই সন্তোষজনক।

আম-বাগান পার হতেই ভদ্রলোক আমাদের সীমাচলমের পৌরাণিক কাহিনী জানি কি না জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, "জানি। তবে আপনাদের মুখ থেকে আর একবার শুনলে মন্দ হয় না ; যদি নতুন কিছু জানা যায়।"

তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "সীমাচলম্ খুব প্রাচীন তীর্থ-স্থান। পুরাণে এর উল্লেখ আছে। ভক্ত প্রহ্লাদ শেষ জীবনে এই সীমাচলমে নৃসিংহদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা কোরে পূজার্চ্চনা করতেন। তারপর ভক্ত প্রহ্লাদের দেহত্যাগের পর কালক্রমে সে মূর্ত্তি বল্মীকস্তূপে চাপা পড়ে যায়। ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাবের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। নিজের মহিমা প্রচারের জন্য, ধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য কখনো কখনো লোকচক্ষে তাঁর তিরোভাব প্রতিপন্ন হয়। তাই চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবা একদিন স্বপ্ন দেখলেন যে, ভগবান বিষ্ণু তাঁকে এই বল্মীকস্তূপে ঢাকা বিগ্রহের বার্ত্তা বলছেন। সংবাদ পাবা মাত্রই ধর্ম্মপ্রাণ রাজা সেই বিগ্রহমূর্ত্তি উদ্ধার করলেন এবং বৈশাখ মাসের অক্ষয়-তৃতীয়ায় এই মূর্ত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। কেউ কেউ বলেন, এ মন্দির উড়িষ্যার রাজা লাঙ্গুলিয়ার কীর্ত্তি। যাই হোক, সেই ভক্ত প্রহ্লাদের কাহিনীকে কেন্দ্র কোরে এটি দক্ষিণ-ভারতের একটি নামজাদা পুণ্যতীর্থ।"

ঘটনার সমস্তই আমার জানা। নতুন কিছু পেলাম না এঁর মুখ থেকে শুনে। তবু সময়টা কাটল বেশ, কথা কইতে কইতে বেশ এলাম রাস্তাটা। সর্ব্ব সমেত ঘণ্টাখানেক বা তারও কম লেগেছিল। সীমাচলম্ পাহাড়ের নীচে পৌঁছে ঘড়ি দেখলাম দশটা।

পাহাড়ের নীচে আমাদের মোটর পৌঁছুতেই জয়পুরের মহারাজার 'গেষ্ট হাউস' থেকে লোক এসে আমাদের সঙ্গে কোরে

মহারাজার অতিথি-ভবনে উপস্থিত হল। আমরা হাত মুখ ধুয়ে একটু তাজা হয়ে পাহাড়ে ওঠবার আগে বিশ্রাম কোরে নিতে লাগলাম। ইত্যবসরে সীতারাম স্বামীর লোকটি আমাদের পাহাড়ে ওঠবার বন্দোবস্ত কোরে দিলেন। ঠিক হল, পুরুষদের জন্য সীডান চেয়ার ও মেয়েদের জন্যে পালকী। সীডান চেয়ারগুলি কতকটা চতুর্দ্দোলার মত, চারজন বাহকে নিয়ে যায়।

সাধারণ যাত্রীরা হেঁটেই যায়। অসমর্থদের জন্য সাধারণ ব্যবস্থা শুনলাম ডুলি। যাতায়াত—প্রতি ডুলির ভাড়া তিন টাকা।

ওঠবার পূর্ব্বে ভেবেছিলাম, পার্ব্বত্য-পথ নিশ্চয়ই দুর্গম হবে, কিন্তু দেখলাম মোটেই তা নয়, যথেষ্ট সুগম। সক্ষম যাত্রীরা পায়ে হেঁটে ওপরে উঠছে। সমস্ত রাস্তাটিতে সিঁড়ি তৈরী করা আছে। শুনলাম, প্রাতঃস্মরণীয়া ধর্ম্মপ্রাণা রাণী অহল্যাবাঈ প্রায় হাজার সিঁড়ি তৈরী কোরে দিয়েছিলেন। কথাটি শুনে বড় আনন্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম, এগুলি পাথরের সিঁড়ি নয়, যেন পুণ্যবতী রাণীর সহস্র কীর্ত্তিগাঁথা—পাথরে গাঁথা হয়ে অক্ষয় হয়ে আছে।

ওপরে উঠতে উঠতে চারিদিকের শোভা নজরে পড়ল। সিঁড়ির দু'পাশে নানানপ্রকারের বৃক্ষশ্রেণী ও আজন্মবর্দ্ধিত লতাগুল্ম। ছোট ছোট পার্ব্বত্য ঝরণা উপলখণ্ডে ঘা খেয়ে খেয়ে জলতরঙ্গ বাজিয়ে ঝিরঝির কোরে বয়ে চলেছে। কোথাও বা থরে থরে ফুল ফুটে আছে—পার্ব্বত্য, বনজ অথবা নাম-না-জানা ফুল। কেউ বা বর্ণ-বৈভবে সম্পন্ন, কেউ বা গন্ধ-গৌরবে প্রতিপন্ন। মাঝে

মাঝে মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে পাখীর দল উড়ে যাচ্ছে। কোথাও বা বনের অন্তরালে, গাছের শাখা-প্রশাখায় বসে বসে অনবরত পাখী ডাকছে। অপরিচিত এদের ভাষা, নতুন এদের কাকলী। বেশ লাগতে লাগল। মনে হল, এই ত ভগবানের অবস্থানের স্থান। মাথার ওপর সুদূর-বিস্তৃত ঘন-নীল আকাশ, চাবিদিক ঘিরে প্রকৃতির অকৃপণ, উদার বিলাস-বাহুল্য। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে গভীর আনন্দে মন যেন বলে উঠল, "এতোদিনে ছাড়া পেয়েছি!"

মোট ৯৯৭টি সিঁড়ি পার হবার পর একটি সমতল স্থানে আমাদের দলটি দাঁড়িয়ে পডল। দেখলাম, পূর্ব্ব প্রেরিত সেই পূজারী ব্রাহ্মণটি এখানে অপেক্ষা করছেন। আমার কাছে এগিয়ে এসে তিনি বললেন, "আগে গঙ্গাধারায় স্নান করতে হয়।"

বললাম, "বেশ তো, তাই চলুন না।"

এইখান থেকে পূজারীর নির্দ্দেশমত আমাদেব দলটি বাঁ দিকে মোড ফিরল।

খানিক পরেই গঙ্গাধারা প্রস্রবণ দেখতে পেলাম। পাথরের একটি গোমুখী-নলেব ভেতর দিয়ে ঝরঝর কোরে জল পড়ছে। ঝরণাটির ওপর-নীচে গ্রেনাইট পাথর দিয়ে বাঁধান। পাশেই একটি মণ্ডপে দেখলাম নানানদেশীয় বহু লোক মস্তক মুণ্ডন করছে।

পূজারী ব্রাহ্মণটি আমাদের মস্তক মুণ্ডনের ব্যবস্থা করছেন দেখে তাঁকে নিষেধ করলাম। বললাম, "আমাদের কুলপ্রথা অনুসারে কেউ কোথাও মস্তক মুণ্ডন করেন না।"

সুতরাং, তিনি নিবৃত্ত হলেন।

যেখান দিয়ে গঙ্গাধারা প্রস্রবণের জল পড়ছিল, তারই নীচে মাথা পেতে আমরা সবাই স্নান করলাম। পূজারী ব্রাহ্মণটি এই সময়ে গঙ্গাধারায় স্নানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে লাগলেন। শুনলাম, এতে স্নান করলে, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—এই ত্রিধারার সঙ্গমে স্নান করার পুণ্য হয়।

স্নান শেষ কোরে আমরা এখানকার শিবলিঙ্গ দর্শন করলাম। এইবার আমাদের দলটি ফিরে চললো সেই সমতল স্থানটুকুতে, যেখান থেকে আমরা বাঁ দিকে মোড় ফিরেছিলাম। এখানে এসে এবারে ডানদিকে মোড় ফিরলাম। অল্পদূর যাবার পরেই নৃসিংহ-দেবের মন্দির পাওয়া গেল। যে রাস্তাটি সোজাসুজি মন্দিরে গেছে, সেটি বেশ চওড়া। রাস্তার একদিকে মন্দির, মণ্ডপ প্রভৃতি এবং অন্য দিকে মন্দির-সমিতির আফিস, সত্র, দোকানপাট প্রভৃতি।

মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারে আমাদের দলটি পৌঁছবামাত্রই অনেক বাজনা-বাদ্য শুনতে পেলাম। মন্দির-সমিতির কর্ম্মচারীরা সঙ্গে সঙ্গে এলেন সম্বর্দ্ধনা করতে। চন্দন, মালা প্রভৃতি দিয়ে ভূষিত কোরে আমাদের সবাইকে তারা সসম্মানে নিয়ে গেলেন মন্দিরাভ্যন্তরে। এখানকার মালার একটু তারতম্য আছে দেখলাম। আমাদের দেশে যেমন সূতো বা অন্য রকম লতাতন্তু দিয়ে মালা গাঁথে, এখানে সে রকম নয়। এঁরা একপ্রকার জরির জাল তৈরী করেন, —যেমন টাকা-পয়সা রাখবার জন্য আমাদের দেশে লম্বা "গেঁজে"

তৈরী হয়, ঠিক তেমনি—এই জরির জালের ভেতরে নানানরকমের জুঁই, মল্লিকা, গোলাপ প্রভৃতি ফুল ভরে দিয়ে মাল্য-রচনা হয়।

নৃসিংহমূর্ত্তি দেখলাম, চন্দনে ঢাকা। এমনভাবে ঢাকা যে, বিগ্রহ আছেন বলে বোধ হয় না। পুরোহিত বললেন, "প্রভুর মূর্ত্তি বছরে একদিন মাত্র প্রকাশিত হয়। সে শুভদিন বৈশাখের অক্ষয়-তৃতীয়া। ঐ দিন নৃসিংহদেবের জন্মোৎসব হয়।" কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি, রাজা পুরূরবা এই মূর্ত্তিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন বৈশাখ মাসের অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় শ্রীচৈতন্য দেব যে এই মন্দির দর্শনে এসেছিলেন, তার উল্লেখ আমরা চৈতন্যচরিতামৃতে পাই।

"পূর্ব্ব-রীতে প্রভু আগে করিলা গমনে।
জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে গেলা কথো দিনে॥"

আর একটি নৃসিংহ দর্শনের কথা পরে আছে। সেটি খুব সম্ভব পানা-নরসিংহ দেব। সে কথা বিস্তৃতভাবে "বেজোয়াদায়" আলোচনা করব।

শুনলাম, আগে ব্রাহ্মণেতর জাতকে অনেক দূর থেকে বিগ্রহ দর্শন করতে দেওয়া হত। আজকাল সবাই সমান—কাছে গিয়ে প্রাণভরে সবাই বিগ্রহ দর্শন করতে পারে, কোন বাধা নেই।

ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার তত্ত্বাবধানে আসার পর থেকে মন্দিরের এই সব নতুন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়েছে। শুনে মনটা তৃপ্ত হল। সত্যিই ত, ভক্তের জন্যই ভগবান। তাঁর কাছে জাতি, অর্থ, উঁচু, নীচু কিছু ভেদাভেদ নেই, থাকতে পারেও না। আমরা ভুল বুঝে,

ছোট, বড়, ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতির বিচার করি। আরে, ভগবানের কি জাত আছে? তিনি কি ছোঁয়াছুয়ির ধার ধাবেন! তিনি সবায়ের। মায়ের কাছে বিদ্বান ছেলেটাবও যে আদর, মূর্খেরও ততটা—যে পয়সা আনে তারও যতখানি, যে আনে না তারও ততখানি।

শুনলাম, আগে দক্ষিণার জন্য জুলুম চলত। ভক্তের ব্যাকুলতা, ভক্তি ও অনুরাগের পবিমাপ হোতো অর্থদানের সামর্থ্যের ওপর। কিন্তু এখন আর সে সব নেই। মহারাজার স্থাপিত মন্দিরের আপিস থেকে নিয়ম কোরে দেওয়া হযেছে যে, মন্দির প্রবেশের জন্য দক্ষিণা জন পিছু এক আনা মাত্র। তারপর কর্পূরারতি, ভোগ প্রভৃতির জন্য যার যা খুসি তাই দিতে পারে।

ভগবান নৃসিংহদেবের কর্পূরারতি, পূজার্চ্চনা সেরে ভোগ দেবার বন্দোবস্ত কোরে আমরা মন্দিরটি ঘুরে ঘুরে এর শিল্পকার্য্য প্রভৃতি দেখতে লাগলাম। মনে পড়ল, মোটরে আসতে আসতে সীতারাম স্বামীর মুহুরী বলেছিলেন—সাধারণের বিশ্বাস, এ মন্দির উড়িষ্যার রাজা লাঙ্গুলিয়ার কীর্ত্তি। এখন বুঝতে পারলাম এ বিশ্বাসের মূলে কি ভিত্তি আছে। নৃসিংহ স্বামীর মন্দিরের নির্ম্মাণ-কৌশল পুরীর কোনারকের সূর্য্য-মন্দিরের মত। কাজেই, সাধারণের এ বিশ্বাস পোষণ করা খুব আশ্চর্য্যকর নয়। একটু দূরে একটি দুর্গ দেখলাম। কতোদিনের দুর্গ, কার তৈরী, সে সংবাদ কেউই বিশেষ বলতে পারলে না। মন্দির-স্তম্ভে দু-চারটি উৎকীর্ণ শিলালিপি চোখে পড়ল। সকলে বললেন, শিলালিপিগুলি

পড়বার উপায় নাই। তবে যে দুটি একটির পাঠোদ্ধার হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় যে, ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের তদানীন্তন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই মন্দির দর্শনে এসেছিলেন। আর একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, কোন রাজা বিগ্রহের জন্য কিছু ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন।

ইতিহাসেও এমনি দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। একসময়, দাক্ষিণাত্যের বহু রাজা মন্দিরের জন্য, বিগ্রহের জন্য অনেক সম্পত্তি দেবত্র কোরে দিয়েছিলেন।

মন্দিরের পাশেই দেখলাম, রাজা সীতারাম রায়ের বাগান।

জিজ্ঞাসা করলাম পূজারীকে, "আচ্ছা, স্ফটিকস্তম্ভে হরি আছেন শুনে হিরণ্যকশিপু লাথি মেরে যে স্ফটিকস্তম্ভ ভেঙেছিলেন, সেটি কই, দেখছি না যে!"

পূঝারী উত্তর দিলেন, "স্তম্ভ আছে, কিন্তু স্ফটিকস্তম্ভ নয়—ঐ যে।"

আঙ্গুল দেখিয়ে তিনি মন্দির-প্রাঙ্গনের একটি প্রস্তর-স্তম্ভ নির্দ্দেশ করলেন, তারপর সমবেত যাত্রীদের দেখিয়ে বললেন, "ঐ যে ওরা কোল্ দেবে বলে এসেছে।" "কোল্ দেওয়া" এ দেশে খুবই প্রচলিত। আমাদের দেশেও এমনি একটা শুনেছি বলে মনে হয়। মনে হল, দাক্ষিণাত্যের তীর্থ সেরে ফিরলে আত্মীয়-স্বজনেরা জিজ্ঞাসা করেন, "কোল্ দিয়ে এসেছ?"

শুনলাম, নৃসিংহক্ষেত্রে এলে শ্রদ্ধা, ভালবাসা বা স্নেহের পাত্র দু-জন এই স্তম্ভটিকে মাঝে রেখে সামনা-সামনি দাঁড়ায়, তারপর

উভয়ে উভয়ের হাত ধরে মাল্য রচনা কোরে মনের ইচ্ছা, মানত প্রভৃতি জানায়। সাধারণের বিশ্বাস, সংকল্পিত মানস সার্থক হয়...... নাকি কখনো ব্যর্থ হয় না।

মন্দির প্রভৃতি দেখা শেষ কোরে আমবা মহারাজার সত্র, আপিস ইত্যাদি দেখতে গেলাম। মন্দির-সমিতির আপিস দেখবার ইচ্ছা জানাতেই এখানকার কর্ম্মচারীরা আমাদের সসম্ভ্রমে নিয়ে গেলেন। রাজার এই মহানুভবতার জন্যে মন্দিরের কর্ম্মচারী ও কর্ম্মাধ্যক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালাম।

মন্দিরের আয়ের কথা উঠতে কর্ম্মাধ্যক্ষ বললেন, "বছবে মন্দিরের আয় প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজাব টাকা। তার মধ্যে গঙ্গাধারায় মস্তক মুণ্ডনের মূল্য ও দক্ষিণা বাবদ যা পাওয়া যায়, তারই পরিমাণ প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা। মস্তক মুণ্ডনেব পব চুলগুলি সযত্নে সংগ্রহ কোরে রাখবার জন্য মন্দিরের আপিস থেকে নিযুক্ত করা লোক আছে। এই চুলগুলি নানানপ্রকাবেব ব্যবসাব উদ্দেশ্যে বিক্রী হয়, আট আনা পাউণ্ড হিসাবে। এই চুল বিক্রী কোরে বছরে আয় হয় প্রায় তিন হাজার টাকা। তা ছাড়া, মন্দিরের দর্শনী, কর্পূরারতি, পূজা, ভেট প্রভৃতি থেকে অনেক টাকা সংগ্রহ হয়।"

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে তীর্থ প্রব্রজ্যার সময় নীলাচল থেকে বেরিয়ে প্রথম আলালনাথ আসেন, তারপর শ্রীকূর্ম্মমে উপস্থিত হন। তাঁর দক্ষিণ-ভারত তীর্থ ভ্রমণের আরম্ভ এই শ্রীকূর্ম্মম্ থেকে। শ্রীকূর্ম্মমে ভগবানের কূর্ম্মাবতার মূর্ত্তি। কারো মতে

শ্রীকূর্ম্মম্ ভিজিগাপট্টমের উত্তর-পূর্ব্বে চিকাকোল তালুকের মধ্যে এবং চিকাকোল সহর থেকে ৭।৮ মাইল পূর্ব্বে। কারো মতে শ্রীকূর্ম্মম্ রসালকুণ্ডে। কোন্‌টা ঠিক বোঝা দুষ্কর। রসালকুণ্ড চিকাকোল থেকে বহুদূরে, উত্তর-পশ্চিমে।

তবে, আমরা ভিজিগাপট্টম্, সীমাচলম্ এবং রাজমাহেন্দ্রীর দেবস্থানমের কর্ম্ম-সচিব (Executive Officer)-দের জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁরা বললেন, "রসালকুণ্ডে শ্রীকূর্ম্মমের কোন মূর্ত্তি বা মন্দির নেই"। কাজেই মনে হয়, চৈতন্যদেবের সময় অন্য একটি কূর্ম্মমূর্ত্তি কাছাকাছি কোথাও ছিল। কারণ, কবিরাজ গোঁসাইয়ের চৈতন্য চরিতামৃতে দেখি, কূর্ম্মস্থান দর্শন কোরে মহাপ্রভু জীয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে এসে ভাবে বিভোর হয়েছিলেন। জীয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র এই সীমাচলমেরই নাম।

মন্দির-আপিস থেকে বেরিয়ে রাজার সত্রে এসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। খানিক পরে পুরোহিতরা ভোগ পাঠিয়ে দিলেন—সকলে প্রসাদ পেলাম।

ভোগ খেয়ে আরো খানিকটা জিরিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে নামতে আরম্ভ করলাম যখন, তখন বেলা প্রায় দুটো।

বলতে ভুলে গেছি, পাহাড়ে ওঠবার সময় দেখেছি এবং নামবার সময়ও দেখলাম, সিঁড়ির দুধারে অসংখ্য রোগদুষ্ট বিকলাঙ্গ ভিক্ষুক বসে আছে। ভিক্ষার জন্য তারা নানান ভাষায় কাতরতা জানাচ্ছে। এই ভিক্ষুকদের সম্বন্ধে একটি মজার তথ্য আবিষ্কার করেছিলাম, সে কথা পরে তিরুপতি-মলয়ে "বালাজী" প্রসঙ্গে বলব।

পাহাড়ের নীচে রাজার অতিথি-ভবনে এসে যখন পেঁাছুলাম, তখন বেলা পড়তে আরম্ভ করেছে……সূর্য্যের আলো হয়ে আসছে তরল……পাণ্ডুবর্ণ।

বেশীক্ষণ বিশ্রাম না কোরে ওয়ালটেয়র ফেরবার জন্য মোটরে উঠলাম। কারণ, কথা ছিল, আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে রাজমাহেন্দ্রী যাব।

## রাজমাহেন্দ্রী

প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় ওয়ালটেয়র থেকে বেরিয়ে রাজমাহেন্দ্রী এসে পেঁাছুলাম, রাত্রি এগারোটা সাতচল্লিশ মিনিটে। রেলকোম্পানীর বিবরণ-পুস্তকে দেখা যায়, ওয়ালটেয়র থেকে রাজমাহেন্দ্রীর দূরত্ব একশ পঁচিশ মাইল। ভৌগোলিক বিবরণে রাজমাহেন্দ্রী মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটি তালুক। এর পরের স্টেশনের নামই গোদাবরী, দূরত্ব রেলযোগে মাইল দুই হবে। গোদাবরী জেলার চতুঃসীমার বিবরণ হচ্ছে—উত্তর দিকে মধ্যপ্রদেশ ও বিশাখপত্তন, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের জলকল্লোল ও কৃষ্ণা জেলা ; পূর্ব্বে বিশাখপত্তনের খানিকটা ও বাকীটুকু সমুদ্র এবং পশ্চিমের সীমারেখায় নিজাম রাজ্যের আরম্ভ। সুতরাং, দেখা যায়, দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকটি ছাড়া আর সবদিকে ভূমি রেখা—ঐ দিকটি কেবল সমুদ্র। গোদাবরী জেলার বিস্তৃতি ৭৩৪৫ বর্গ মাইল।

জেলার লোক সংখ্যা আন্দাজ দু-লক্ষ। সহরের লোক সংখ্যা জেলার লোক সংখ্যার এক চতুর্থাংশ, অর্থাৎ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে। এর ভেতর বেশীর ভাগই হিন্দু। রাজমাহেন্দ্রীর ভূমির পরিমাপ ৪৮১ বর্গ মাইল।

রাও উপস্থিত ছিলেন স্টেশনে। বললেন, "ছোটখাট একটি বাড়ী ঠিক কোরে রেখেছি, স্টেশনের খুব কাছে।"

বাসাবাড়ীতে গিয়ে ওঠবার জন্য আমরা সবাই স্টেশনের বাইরে এলাম। সত্যি, বাড়ীটি স্টেশনের খুব কাছে। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। সিঁড়িটি চওড়ায় মাত্র দেড় হাত।

আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছিলেন রাও, থমকে দাঁড়াতে দেখে, পেছন ফিরে বললেন, "আসুন!"

জবাব না দিয়ে রাওকে কর্ণধার কোরে পেছনে পেছনে ওপরে উঠে এলাম। দেখলাম, বাড়ীটা ছোটখাটো—মন্দ নয়। ভেবেছিলাম, সিঁড়ির মত সবটাই বুঝি এর সংকীর্ণ হবে, কিন্তু সে অনুপাতে আর সবই ভাল।

বললাম, "বাড়ীটার আর সবই তো ভাল, কিন্তু সিঁড়িটা অমন কেন?"

কথাটা বাংলায় বললাম, কাজেই রাও জবাব দিলেন না, দিলে আমার ছোট ভাই প্রভাত, বললে, "বাড়ীটা তৈরীর পর, খরচের হিসেব দেখে মালিক বোধ হয় দমে গিয়েছিলেন। এদিকে সিঁড়ি বোধ হয় তখনো বাকী, কাজেই কার্পণ্যটা গিয়ে পড়ল সিঁড়ির

ওপর। ফলে ব্যয়সংকোচ করতে গিয়ে এর দশাটা দাঁড়াল দুর্দ্দশায়।”

প্রভাতের যুক্তিটায় হেসে ফেললাম, বললাম, “আশ্চর্য্য নয়। মানুষ অনেক সময় এমনি অতি-হিসেবীই হয়ে ওঠে।”

‘তা বই কি,’ প্রভাত নিজের যুক্তিকে সমর্থন কোরে বললে, “অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, পনেরো আনা লোকসান হয়ে গেছে, তবু এক আনা বাঁচাবার জন্য কি প্রাণপন, কি টানাটানি!”

রাত্রি অনেক হয়েছিল। কাজেই ঘুমোবার আয়োজন করতে লাগলাম।

রাজমাহেন্দ্রী ও গোদাবরী দুটি পাশাপাশি জায়গা। রাজমাহেন্দ্রীর নাম আগে ছিল রাজমহেন্দ্রপুর। এই গোদাবরী-রাজমাহেন্দ্রী পুরাতন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র বলে পরিচিত। ইংরাজ, মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি সবাই এখানে নিজ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় জন্য যুদ্ধ করেছে। ইতিহাসে দেখি, ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে এ স্থানটি মুসলমানেরা অধিকার করেন, কিছুদিন পরে কৃষ্ণ রায় এটিকে উদ্ধার করেন। প্রায় ষাঠ বছর এটি হিন্দু রাজার অধিকারে ছিল। এই গোদাবরী-রাজমাহেন্দ্রী অঞ্চলে ফরাসী নায়ক বুসির সদর কাছারী ছিল। ইতিহাস বলে, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজেরা এই স্থানটির জন্য নবাবকে কর দিতেন। সুতরাং, একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, ইংরাজের হাতে আসবার আগে পর্য্যন্ত এ জায়গাটি মুসলমানদের অধীনে ছিল। আবার গোবিন্দদাসের কড়চা থেকে জানতে পারি যে, মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য পর্য্যটন কালে

ভক্ত রামানন্দ রায় উৎকলরাজের কর্ম্মচারী হিসাবে গোদাবরীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন ও উৎকলের রাজা ছিলেন প্রতাপরুদ্র। কবে এটি হিন্দুরাজাদের হাত থেকে মুসলমানদের হাতে যায়, সে সম্বন্ধে তেমন কোন সঠিক বিবরণ ইতিহাসকার দিতে পারেন না। তবে, আরঙ্গজেব এটিকে অধিকার কোরে নবাব আসফজাকে দেন, সে কথার উল্লেখ আছে। আবার প্রাচীন কালে দ্রাবিড়রা এখানকার রাজা ছিলেন, তারও উল্লেখ আছে। কিন্তু সহরের প্রথম পত্তন কে করেন, সে নিয়ে অনেক মতভেদ দেখা যায়। কেউ বলেন, চালুক্যরাজ এর প্রতিষ্ঠাতা, কেউ বা বলেন, উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র।

গোদাবরী-রাজমাহেন্দ্রী অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় ১৮৩২ ও ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ের ঝড়ে এখানকার সম্পদ, শ্রী, বসবাস সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বহুলোক এখানকার বাস উঠিয়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যায়। এই ভয়ঙ্কর ঝড়ের কাহিনী এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মুখে বংশপরম্পরায় 'প্রচলিত হয়ে আসছে।

পরদিন বেলা নটা নাগাদ দুখানি মোটরে চেপে আমরা সবাই গোদাবরী যাত্রা করলাম। রাও বললেন, "এখান থেকে গোদাবরী তিন মাইলের মধ্যে।"

যে রাস্তা দিয়ে আমাদের মোটর চলেছে, তার দু-পাশে একটু দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। কোথাও পাহাড়ের ঢালু জমি......কোথাও বা বড় বড় প্রস্তরখণ্ডে সমাকুল পাহাড়ের ভাঙ্গন। এরই আশে-পাশে, কোলে নানান গাছ-পালা।

সেইদিকে চেয়ে রাও বললেন, "এখানকার পাহাড়তলিতে খুব ভাল কমলালেবু হয়।"

বললাম, "আমাদেব ওদিকে এসব লেবু বোধ হয় চালান যায় না; আমরা যে সব লেবু খাই, সে সব সাধারণতঃ নাগপুব, সীলেট বা দার্জ্জিলিং অঞ্চল থেকে আসে।

রাও বললেন, 'সে লেবুব সঙ্গে এ লেবুব তুলনা হয় না।'

পরে এখানকার লেবু খেয়ে দেখেছিলাম, সত্যিই খুব মিষ্ট, আকাবেও বেশ বড।

জিজ্ঞাসা কবলাম, "এ অঞ্চলে আব কি বেশী জন্মায?"

রাও বললেন, "এ অঞ্চলে কলা আব নাবকেল সব জাযগাতেই প্রচুব হয়। দাক্ষিণাত্যেব সর্ব্বত্রই এ দুটি পাবেন। তবে বাজ-মাহেন্দ্রীব ও ত্রিবাঙ্কুরেব কলাব খুব নাম আছে।"

গোদাববী নদীটি প্রাচীন, এবং পৌবাণিক। এব মাহাত্ম্য হিন্দু মাত্রেবই জানা আছে। গোদাববীব পবিত্রতা যে কতদূব, তা আমবা উপলব্ধি কবতে পাবি সহজেই, যখন সমস্ত পূজাকর্ম্মেব জলশুদ্ধি-মন্ত্রে গোদাববীব নামোল্লেখ শুনি।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে, এক ব্রাহ্মণী একাকিনী তীর্থযাত্রা কবেন। পথেব মাঝে এক দুষ্ট কামাচাবী তাঁব রূপে মুগ্ধ হয়ে বলপূর্ব্বক পাশবিক প্রবৃত্তি চবিতার্থ কবে। ফলে ব্রাহ্মণীব গর্ভোৎপাদন হয। লোক-লজ্জাব ভয়ে ব্রাহ্মণী গর্ভ পবিত্যাগ করলেন। কিন্তু, সেই তপ্তকাঞ্চননিভ পুত্রেব শ্রীমুখ দেখে মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠল। নবজাত পুত্রকে পবিত্যাগ না কোরে তিনি

গৃহে নিয়ে এলেন। স্বামী-গৃহে ব্রাহ্মণীর স্থান হল না। ক্রোধোন্মত্ত ব্রাহ্মণ উভয়কেই পরিত্যাগ করলেন। দুঃখে, বেদনায় ব্রাহ্মণী তপস্যা আরম্ভ করলেন। কিছুকাল পরে যোগবলে ইনিই নদী হন এবং এই নদীরই নাম গোদাবরী।

গোদাবরীর অপর নাম গৌতমী বা গৌতমী গঙ্গা। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এই গৌতমী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। পুরাকালে একদিন পার্ব্বতী মহাদেবের কাছে অভিযোগ করলেন— "প্রভু, গঙ্গাকে তুমি মাথায় রেখেছ আর আমায় রেখেছ কোলে। এতে আমাকে অপমান করছ, তোমার উচিত গঙ্গাকে জটামুক্ত কোরে মাথা থেকে নামিয়ে দেওয়া।" মহাদেব চিরকালই আপন-ভোলা। পার্ব্বতীর অভিযোগ তাঁর কানে গেল বটে, কিন্তু কথাটা তিনি তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। পার্ব্বতীর অভিমান হল। গণেশকে ডেকে তিনি এই অপমানের কাহিনী শোনালেন। মায়ের দুঃখ ঘোচাবার জন্যে গণেশ বদ্ধপরিকর হলেন।

ইত্যবসরে এদিকে আর এক ঘটনা ঘটে গেছে। ক্রমান্বয়ে বারো বছর অনাবৃষ্টি হওয়ায় দেশ মরুভূমি হয়ে গেছে। চারিদিকে খাদ্যবস্তুর অভাব। শস্য নেই, খাদ্য নেই, মানুষ হাহাকার করছে। অনাহারক্লিষ্ট উপবাসী ঋষির দল একদিন ঋষি গৌতমের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। গৌতমের আশ্রমে খাদ্যের কোনই অভাব নেই। কারণ, যোগবলে তিনি শস্য উৎপাদন করতেন। দয়ার্দ্র-হৃদয় গৌতম তখুনিই ঋষিদের আশ্রয় দিলেন। ঋষিরা গৌতমের আশ্রমে বেশ সুখেই দিন কাটাতে লাগলেন।

পার্ব্বতীর কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে গণেশ ব্রাহ্মণের ছদ্ম-বেশে এলেন গৌতমের আশ্রমে—ঋষিদের ডেকে বললেন, "হে পরান্নভোজী ঋষিগণ, তোমরা এখনো এখানে পরান্নে প্রতিপালিত হচ্ছ ? পৃথিবী সুন্দর শস্যে পরিপূর্ণ—কোথাও খাদ্যদ্রব্যের অভাব নেই, সে খবরও কি রাখো না ?" ঋষিদের চমক ভাঙল, তারা ব্যস্ত হয়ে বিদায় নেবার জন্যে গৌতমের কাছে হাজির হলেন। গৌতম কিন্তু কিছুতেই তাঁদের ছাড়তে চাইলেন না।

গণেশের কৌশল বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায় ! তখন তিনি কার্ত্তিককে ডাকলেন। দু'ভায়ে পরামর্শ হল যে, কার্ত্তিক গাভীরূপ ধারণ কোরে গৌতমের ক্ষেত্রে গিয়ে শস্য নষ্ট করবে। শস্য বাঁচাবার জন্য গৌতম গাভীকে তাড়া দিলেই সে মৃতের ভান করে ক্ষেত্রের ওপর ধরাশায়ী হবে।

ঘটনাও তাই হল। গৌতম তাড়া করতেই গাভীরূপী কার্ত্তিক মৃতের মত শস্যক্ষেত্রের ভেতর পড়ে রইলেন। সমস্ত ঋষিরা তাই দেখে আশ্রমে পাপস্পর্শ করেছে বলে গৌতমকে ত্যাগ করবার উদ্যোগ করলেন। গৌতম নিরূপায় হয়ে ঋষিদিগকে নিরোধ করবার জন্যে এলে ঋষিরা বললেন, "এক সর্ত্তে আমরা তোমার আশ্রমে থাকতে পারি,—যদি তুমি গঙ্গাকে এনে মৃতা গাভীকে পুনর্জীবিতা করতে পারো।"

গৌতম তপস্যা আরম্ভ করলেন।

তপস্যায় গঙ্গা ও হর-পার্ব্বতী তিনজনেই তুষ্ট হয়ে বললেন, "কি বর তুমি চাও ?" গৌতম তখন সবিনয়ে নিজের অভিপ্রায়

ব্যক্ত করলেন, "প্রভু, আপনার জটাস্থিত গঙ্গাকে আমায় দিন। আমি আমার আশ্রম ক্ষেত্রস্থ মৃতা গাভীকে পুনর্জীবিতা করব ; এবং এই আদেশ দিন যেন, মৃতা গাভীর প্রাণদান কোরে গঙ্গা সাগরাভিমুখে প্রবাহিতা হন ও আমার নাম যুক্ত হয়ে গৌতমী-গঙ্গা নামে প্রকীর্ত্তিতা হন।

সেই থেকে গোদাবরী গৌতমী-গঙ্গা নামে খ্যাত।

গোদাবরীর গতি দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখী। নাসিক জেলার ত্র্যম্বক গ্রামের পেছনের পাহাড় থেকে এই নদীর উৎপত্তি। ১১২২০০ বর্গ মাইল জমি ঘিরে এই নদীটি বয়ে চলেছে। এর দূরত্ব হবে প্রায় নশো মাইল—মধ্য-ভারতের পূর্ব্বঘাট পাহাড় থেকে পশ্চিমঘাট পাহাড় পর্য্যন্ত এর বিস্তৃতি।

দশটার আগে আমাদের মোটর গোদাবরী এসে পেঁছিল। গোদাবরীর তীরে পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের বিধি আছে। আমি জ্যেষ্ঠ, সুতরাং নিয়মানুযায়ী আমিই শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করলাম। আমার ভাই, সহধর্ম্মিণী আমার হাতে পিণ্ড তুলে দিতে লাগলেন এবং আমি পিতা, মাতা, মৃত আত্মীয়স্বজন, পরিচিত, অপরিচিত, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির উদ্দেশে যথারীতি পিণ্ড নিবেদন করতে লাগলাম। অধিকার না থাকায় বিলুর মা ও খুকুমণি মৃত আত্মীয়স্বজনদের উদ্দেশে কেবল ভোজ্যদান ও উৎসর্গ করলেন।

দাক্ষিণাত্যে চাল-কলার পরিবর্ত্তে ছাতু বা ময়দা দিয়ে পিণ্ড তৈরী হয়। ( এ অঞ্চলে ময়দাকে "গোধূম পিণ্ডম্" বলে। ) আমরা

আমরা কিন্তু আমাদের সনাতন নিয়ম অনুযায়ী চাল-কলা, তিল, ফল, চিনি, দই প্রভৃতি দিয়ে পিণ্ড দিয়েছিলাম।

যথাবিহিত পিণ্ডদানাদি সেরে নিয়ে রাওকে গোদাবরীর সম্বন্ধে দু-একটি প্রশ্ন করলাম। রাও যতদূর জানেন, বললেন। গোদাবরীর দক্ষিণ-উপকূলে যে ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন নজরে পড়ল, জিজ্ঞাসা কোরে জানলাম, সেগুলি তেলঙ্গ-রাজের প্রাসাদের নিদর্শন।

লোকে বলে, গোদাববীর পশ্চিম পারে একটি গ্রাম আছে, তার নাম কবুর। এই কবুর গ্রামই পূর্ব্বে গৌতমের আশ্রম ছিল। এখনো নাকি সেখানে ভাঁটা পড়লে গোদাবরীর কূলে গোক্ষুরের চিহ্ন দেখা যায়। এই কবুর গ্রামের মাইল ছয়েক দূরে ব্রহ্মগিরি নামে একটি পাহাড় আছে। এই পাহাড়টি গৌতমের তপস্যাক্ষেত্র বলে শোনা যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম রাওকে, "এখানকার, অর্থাৎ রাজমাহেন্দ্রীর কাছে গোদাবরীর নাম ত শুনলাম অখণ্ড গোদাবরী, কিন্তু গোদাবরী খণ্ড হয়েছেন কোনখানে?"

রাও বললেন, "ধবলেশ্বরের কাছে;—এখান থেকে মাইল তিনেক হবে। এইখানে গোদাবরী দুভাগে বিভক্ত হয়েছেন—এক ভাগের নাম বশিষ্ঠা, আর এক ভাগের নাম গৌতমী। আবার গৌতমী তিন শাখায় ও বশিষ্ঠা দুই শাখায় বিভক্ত হয়েছেন। ধবলেশ্বরের কাছে যেখানে প্রথম গোদাবরী শাখাযুক্তা হয়েছেন, সেখানে একটি 'ব' দ্বীপ আছে।"

মনে পড়ল, আয়ুর্ব্বেদে এক জায়গায় এই 'ব' দ্বীপের নিকটবর্ত্তী স্থানের জলের গুণাগুণ উল্লেখ আছে। বৈদ্যশাস্ত্রকারের মতে এখানকার জলে রক্তার্ত্তি, পিত্তার্ত্তি, কুষ্ঠ, ধবল ও অন্যান্য দুষ্ট রোগ নিরাময় হয়।

গোদাবরীর সাত শাখার নাম তুল্যা, আত্রেয়ী, ভরদ্বাজী, কৌশিকী, গৌতমী, বৃদ্ধা গৌতমী, ও বশিষ্ঠা। এই সাতটি শাখা যেখানে গিয়ে সমুদ্র-সঙ্গমে মিশে গেছে, সেখানকার নাম "সপ্ত-গোদাবরী সাগর-সঙ্গম।"

এই গোদাবরী তীরেই মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দ রায়ের প্রথম পরিচয় হয়। এই গোদাবরীর তীরে দাঁড়িয়ে মহাপ্রভুর যমুনার কথা মনে পড়েছিল। তীরসন্নিহিত বন দেখে তাঁর মনে বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব স্মৃতি জেগেছিল......সেই কদম্ব তরুমূল আলো-করা ভুবনমোহন রূপ......সেই শ্রীরাধিকা সমভিব্যাহারে রাসরস-লীলা। গোদাবরীর জলস্রোতের পাশে বসে প্রভু কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে বিভোর হয়েছিলেন। দরদর ধারায় কপোল বেয়ে মুক্তাবিন্দুর মত প্রেমাশ্রু ঝরে পড়েছিল—এই পুণ্যতোয়া গোদাবরীর বুকে। সে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গোদাবরীর প্রবাহ-তরঙ্গ সে দিন মহানন্দে মহাপ্রভুর পূত চরণ বিধৌত করেছিল। আজ তারই তীরে দাঁড়িয়ে গভীর আনন্দে মনটা ভরে উঠল। হয়ত, খুবই কাছে......যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এরই অতি নিকটে এসে রামানন্দ রায় দেখেছিলেন—

"সূর্য্যশতসমকান্তি—অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ—কমল লোচন॥
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥
উঠি প্রভু, কহে—উঠ, কহ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ।'
তারে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥"

তারপর, এই গোদাবরী তীরেই রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা হয়। চৈতন্যচরিতামৃত পাঠক মাত্রেই এ সংবাদ জানেন।

বাসায় ফিরতে বেলা একটা বেজে গেল। আহারের পর সামান্য বিশ্রাম করে মালপত্র স্টেশনে পাঠালাম। ঠিক হল, সন্ধ্যে ছটার গাড়ীতে রাজমাহেন্দ্রী থেকে বেজোয়াদা যাব। যথাসময়ে স্টেশনে উপস্থিত হয়ে শুনলাম ট্রেণ লেট হয়েছে। ক্রমশঃ বিলম্বের পরিমাণ চল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা হয়ে গেল। শেষে ছটা আট মিনিটের জায়গায়, সাতটা দশ মিনিটে ট্রেণ এসে উপস্থিত হল।

---

## বেজোয়াদা

ওয়ালটেয়র থেকে বেজোয়াদা দুশো সতেরো মাইল—রাজমাহেন্দ্রী থেকে একানব্বুই মাইল। বেজোয়াদার ঐতিহাসিক নাম বেজবাড়া। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে এ স্থানটি কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত। প্রত্নতাত্ত্বিকরা একসময়ে এই সহর খুঁড়ে বৌদ্ধদের অনেক শিলালিপি পেয়েছিলেন, তাই থেকে জানতে পারা যায় যে, এ জায়গাটি আগে রেড্ডিসর্দ্দারদের অধীনে ছিল। সে সময় এর নাম ছিল শ্রীবিজয়বাড়পুর। বেজোয়াদা নামটি বোধ হয় এরই অপভ্রংশ। কালে 'শ্রী' লোপ পেয়েছে এবং বিজয় থেকে 'বেজ্' এবং 'বাড়' থেকে 'ওয়াড' বা 'ওয়াড্' হয়েছে। বেজোয়াদা তালুকটির পরিমাণ অন্যূন সাড়ে পাঁচশো মাইল। এই তালুকটির মধ্যে চারটি নগর আর একশো সাতটি গ্রাম আছে। এই গ্রামগুলির মধ্যে কোন কোনটি খুবই প্রাচীন—যেমন আটকুরু, যেনিকেপাড়, জুকুমপুড়ী, গনবরম্, ছিগ্গি প্রভৃতি। এখনো এসব জায়গা থেকে পাওয়া শিলালিপি প্রত্নতাত্ত্বিকদের চিন্তার খোরাক যোগায়।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমরা সহরের মাঝ দিয়ে মঙ্গলগিরিতে পানা নরসিংহদেবের মন্দির দেখতে যাব স্থির করলাম। মাইল আটেক হবে এখান থেকে। ট্রেণেও যাওয়া যায়।

বেজোয়াদা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সুন্দর। ঠিক কৃষ্ণানদীর তীরেই বেজোয়াদা সহর। সহরের একদিক ছেয়ে আছে পাহাড়ের সারি, আর এক দিকে ঘিরে আছে কৃষ্ণা নদীর শ্রোতধারা।

কৃষ্ণা পঞ্চগঙ্গার মধ্যে একটি। ভাগীরথী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ও তুঙ্গভদ্রা—ভারতের পাঁচটি পবিত্র নদীর নাম সকলেই প্রায় জানেন। ভাগীরথী, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতিতে স্নানের যে পুণ্য, স্থানীয় লোকেরা বলে, কৃষ্ণায় স্নানে তার চেয়ে বেশী।

স্টেশন থেকে মাইল খানেক হবে কৃষ্ণার স্নানঘাট। এই ঘাটে নেমে আমরা সবাই জলস্পর্শ কোরে উঠে এলাম। এখানকার দৃশ্যটি বড় মনোরম। নদীর দু'তীরেই পাহাড়ের সারি। যতদূর দেখা যায়, কেবল ধূসর-শ্যামল পাহাড়। মনে হয়, পাহাড়ের বুক চিরে মূর্ত্তিমতী করুণার ধারা কৃষ্ণা বয়ে চলেছেন।

শুনলাম, দুপাশের পাহাড়ে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী, দেবালয় প্রভৃতি আছে। প্রসিদ্ধির দিক থেকে এরা ন্যূন হলেও পুণ্যার্জ্জনে অন্যূন।

রাও বললেন, "কনকদুর্গা মন্দিরের প্রসিদ্ধি আছে। পাহাড়ের ওপর উঠতে প্রায় দুশো সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়।"

আমাদের ভাগ্যে মায়ের চরণ দর্শন ঘটল না। কারণ, তা হলে মঙ্গলগিরি যেতে দেরী হয়ে যাবে। সুতরাং, কৃষ্ণার তীর থেকেই মায়ের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে মোটরে এসে উঠলাম।

বেলা দশটা নাগাদ আমাদের মোটর মঙ্গলগিরির পাদদেশে গিয়ে পৌঁছল। প্রায় ছ'শো সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে পাহাড়ের ওপরে আমরা নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি দেখলাম। বিগ্রহমূর্ত্তি এখানে পাহাড়ের গায়ের পাথরে উৎকীর্ণ।

পুরোহিত বললেন, "এর নাম পানা নৃসিংহদেব।"

শুনলাম, গুড়ের সরবৎ দিয়ে দেবতার ভোগ হয়। এই প্রকার সরবৎ (পানা) ভোগের জন্যই এঁর নাম বোধ হয় পানা নৃসিংহদেব।

রাও বললেন, "এখানকার স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে, বিগ্রহকে যিনি ভক্তিভরে সরবৎ ভোগ দেন, তাঁর সরবৎ প্রভু পুরোপূরি পান করেন, কিন্তু যাঁর মনে কোনপ্রকার অবিশ্বাস বা সন্দেহ থাকে, তার সরবৎ ঠাকুর অল্পমাত্র পান করেন। এ ঘটনা কেউ কেউ প্রত্যক্ষও করেছেন, শোনা যায়।"

তাঞ্জোরের মহারাজা বিগ্রহের জন্য একটি রত্নখচিত বেদী উৎসর্গ করেছেন। সেই বহুমূল্য বেদীখানি মন্দিরের তত্ত্বাবধারকদের কাছে আছে দেখলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আর এক স্থানে আছে—

"নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতিস্তুতি।
সিদ্ধবট গেলা—যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি।"

আমার মনে হয়, উল্লিখিত নৃসিংহই পানা নরসিংহদেব। কারণ, মহাপ্রভুর এই নৃসিংহ দর্শন রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা হবার পর। আর পরের তীর্থ সিদ্ধবট বোধ হয় 'ভদ্রাচল।'

কারণ, পানা নরসিংহ দেবের মন্দির থেকে এই ভদ্রাচল মাইল সত্তর দূরে ; তা ছাড়া, সিদ্ধবটের বর্ণনায় মূর্ত্তির উল্লেখ দেখেছি— সীতাপতি। ভদ্রাচলে রামচন্দ্রের সুন্দর মন্দির আছে।

গোবিন্দদাসের কড়চায় জীয়ড় নৃসিংহ (সীমাচলম্) দেব দর্শনের উল্লেখ নেই। চৈতন্য-ভাগবতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যের তীর্থভ্রমণের কোন কথাই নেই। এ সম্বন্ধে যা কিছু পাওয়া যায়, তা গোবিন্দদাসের কড়চায় ও কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে। গোবিন্দদাস বা গোবিন্দ কর্ম্মকার মহাপ্রভুর ভৃত্য হয়ে তীর্থপর্য্যটন কালে প্রায় সব সময়েই সঙ্গে থাকতেন। লেখাপড়া বেশী না জানায় গোবিন্দদাসের কড়চায় কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা সম্ভব। তবে এটুকু অনুমান করা যায়, তিনি স্বচক্ষে সব দেখেছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী পরম পণ্ডিত ছিলেন। পরের মুখে শুনে তিনি চৈতন্য-চরিতামৃতের দাক্ষিণাত্যের তীর্থ ভ্রমণাংশ রচনা করেন।

সেইজন্যে পরের পর তীর্থ দর্শন ও পর্য্যটনের বর্ণনায় ভুল-ভ্রান্তি ঘটতে পারে বলে, এক জায়গায় লিখেছেন—

"তীর্থযাত্রা তীর্থক্রম কহিতে না পারি.
দক্ষিণ-বামে তীর্থ-গমন হয় ফেরাফেরি
অতএব নাম মাত্র করিয়ে গণন
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম।"

সুতরাং, সঠিক কিম্বা পরের পর (অনুক্রমানুযায়ী) তীর্থস্থানের বর্ণনা যে তিনি দিতে পেরেছেন, তা মনে হয় না।

চৈতন্য-চরিতামৃতে সিদ্ধবট সীতাপতির বর্ণনার দু-এক লাইন আগে প্রভুর মল্লিকার্জ্জুন দর্শনের কথাও উল্লেখ আছে। এই মল্লিকার্জ্জুনও ভদ্রাচলের খুব কাছে। সুতরাং, অনুমান আমার ন্যায়সঙ্গত ও ভিত্তিমূলক বলেই বিবেচনা করি। মল্লিকার্জ্জুন যেতে হলে বেজোয়াদা থেকে রেলযোগে সত্তর মাইল যেতে হয়। তার পরের রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম এবং পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। গোযান ছাড়া আর অন্য কোন যান নেই। শুনলাম, এখানে মহাদেবের এক জ্যোতির্লিঙ্গ বর্ত্তমান।

পানা নরসিংহদেবের পূজার্চ্চনা সেরে আমরা বেজোয়াদা স্টেশন অভিমুখে মোটর ফেরালাম।

ভদ্রাচল ও মল্লিকার্জ্জুন দেখা হল না।

ভদ্রাচল সম্বন্ধে একটি গল্প বললেন রাও। এ অঞ্চলের কোন এক ধর্ম্মগ্রন্থে ভদ্রাচলের মন্দির নির্ম্মাণের সম্বন্ধে ঐ রাও-কথিত গল্পটি আছে।

রামদাস নামে এক কর্ম্মচারী কোন সময়ে নিজামের তহবিল থেকে ছ'লক্ষ টাকা তছরুপ কোরে ভদ্রাচলের এই শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির তৈরী করেন। টাকা তছরুপ যখন ধরা পড়ল, তখন নিজাম তাকে জেলে বন্দী করলেন। কিন্তু কে একজন এসে রামদাসের ভৃত্য বলে পরিচয় দিয়ে সমস্ত অর্থ পরিশোধ কোরে রামদাসকে মুক্তি দিয়েছিল। লোকে বলে, স্বয়ং রামচন্দ্রই এই ভৃত্যবেশে এসেছিলেন, ভক্তের উদ্ধারের জন্য। ভগবান-ভক্তের এ প্রসিদ্ধি আজ নতুন নয়—সনাতন।

সহরের পশ্চিমদিকের পাহাড়ের উল্লেখ কোরে রাও বললেন, "এখানকার স্থানীয় লোকেরা এই সব পাহাড়কে অর্জ্জুনকোণ্ড বলে। তাদের ধারণা, এই পাহাড়ের ওপরেই ইন্দ্র আর অর্জ্জুনে যুদ্ধ হয়েছিল। আর পূর্ব্বদিকে পাহাড়ের গায়ে এখনো "পূর্ব্বশিলা" লেখা দেখা যায়।

মনে পড়ল, চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং তার ভ্রমণ-কাহিনীতে এই "পূর্ব্বশিলা"য় অবস্থিতিব কথা লিখেছেন। মোট কথা, চীন পরিব্রাজকের সময় রাজমাহেন্দ্রী, বেজোয়াদা, গোদাবরী প্রভৃতি সব জায়গাতেই অল্পবিস্তর বৌদ্ধবিহার ছিল।

এর প্রমাণ গোবিন্দদাসের কড়চায় পাওয়া যায়। সন্নিকটে ত্রিমঙ্গনগরে মহাপ্রভু এসে "পাষণ্ডদের" ধর্ম্মবিচারে পরাস্ত কোরে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেছিলেন, তার উল্লেখ কড়চায় আছে। 'পাষণ্ড' অর্থে এখানে নাস্তিক—বেদ-বিরোধী বৌদ্ধ।

বেজোয়াদায় ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা একটি দুর্গ তৈরী করেছিলেন, পরে কোন প্রয়োজনে লাগাতে না পেরে এটিকে ভেঙ্গে ফেলেন।

খৃষ্ট জন্মের সমসাময়িক কালে বেজোয়াদা এবং এর কাছাকাছি স্থানগুলি বেশ সমৃদ্ধ ছিল। দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্যস্থানের তালিকায় বেজোয়াদার নাম দেখতে পাওয়া যায়। কলিকাতা, বোম্বাই, কোকোনাডা প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে বেজোয়াদার বাণিজ্য বিনিময় চলে।

যাতায়াত, মন্দির দর্শন প্রভৃতি সারতে প্রায় সমস্ত দিনটাই কেটে গেল। স্থির করলাম, ঐ দিন রাত্রি বারোটার ট্রেণে মান্দ্রাজ যাব।

# মান্দ্রাজ

রাত্রি বারোটা নাগাদ মান্দ্রাজগামী ট্রেণ এলো। আমরা বেজোয়াদা থেকে ট্রেণে চাপলাম।

পরের দিন চলন্ত গাড়ীতে যখন ঘুম ভাঙল, ঘড়ি খুলে হিসাব কোরে দেখলাম, আমাদের ট্রেণটি তখনো এক ঘণ্টা দশ মিনিট বিলম্ব কোরে চলেছে। বেচারার মেধাহীন ছাত্রের দুর্দ্দশা। হাজার চেষ্টা কোরেও পেছিয়ে পড়ছে।

প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ প্রভৃতি সমাধা কোরে জানালার ধারে এসে বসেছি, এমন সময় ট্রেণ এসে ঢুকলো মান্দ্রাজ মধ্য স্টেশনে। ঘড়ি খুলে দেখলাম, নটা পয়তাল্লিশ।

ট্রেণ থামতেই একজন এসে নমস্কার কোরে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস কারে জানলাম, তিনিই নটেশ্বরম্ মুদালিয়র।

নটেশ্বরম্ মুদালিয়র 'সা ওয়ালেস' কোম্পানীর মান্দ্রাজ শাখা আপিসের 'ডুবাস'। 'ডুবাস' মানে এক প্রকারের মুচ্ছুদি।

তাঁহার মোটরে চেপে মান্দ্রাজের উড্‌ল্যাণ্ড হোটেলে গিয়ে উঠলাম।

এখানে মান্দ্রাজের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি তথ্য যতদূর জানা আছে, তার মোটামুটি একটা বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

'সেণ্ট জর্জ্জ' ফোর্টের শাসনভুক্ত ভারতের সমস্ত দক্ষিণ

প্রদেশ, বনবিভাগ ও কতকগুলি সামন্তরাজ্য, যথা—ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতিকে একত্রভাবে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী বলে। সমগ্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর আয়তন—লম্বায় সাড়ে নশো ও চওড়ায় সাড়ে চারশো মাইল। খাস গভর্ণমেন্টের অধীনে এখানে বাইশটি জেলা আছে। মান্দ্রাজ সরকারের অধীনে যে সামন্তরাজ্যগুলি আছে, তাদের নাম ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, সন্দুর, বঙ্গনপল্লী ও পুদুকোটা।

বিশাখপত্তন ও গোদাবরী এজেন্সী বিভাগভুক্ত ও গঞ্জাম জেলাটি স্বতন্ত্র বন্দোবস্তে। শোনা যায়, ইংরাজ শাসনের গোড়ার দিকে কুঠি ছিল এইখানে। একজন গভর্ণর এখানে বাস করতেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ, এই তিন দিকে কেবল জল, আর উত্তর দিক থেকে পশ্চিম প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত স্থলভাগ। এই স্থলভাগের মধ্যে মধ্য-ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশ, নিজামরাজ্য, ধারবাড়, উত্তর-কানাড়া জেলা ও উড়িষ্যা।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী বিচিত্র ও মনোরম। সাগরের নীল জলরাশি ও পাহাড়ের সমুন্নত শিখর এখানকার সমস্ত স্থানটুকুকে প্রকৃতির লীলাভূমি করে রেখেছে। মান্দ্রাজের পাহাড়ের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাট পাহাড়ের সারি, নীলগিরি, পালঘাট, সেরবার, আন্নামলয়, পলসি ইত্যাদিরই নাম করা যায়। আন্নামলয় পাহাড়টি উঁচু প্রায় আট হাজার ফিট। নীলগিরির দাদবেট্টা শৃঙ্গটিও প্রায় ঐরকম উঁচু বা ওর চেয়ে শ'খানেক ফিট কম হতে পারে। উচ্চতার দিক দিয়ে এরাই দক্ষিণ-ভারতের প্রসিদ্ধ গিরিশৃঙ্গ।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ভেতর হ্রদও অনেক আছে। তবে অধিকাংশ বড় হ্রদই মালাবার, উত্তর-কানাড়া ও ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে। তার ভেতর কোচিনের হ্রদ সবচেয়ে বড় এবং প্রসিদ্ধ। এই কোচিনের হ্রদ থেকে কাটা খাল ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের শেষ কুমারিকা অবধি গেছে।

বিস্তৃতি আর প্রসিদ্ধির দিক দিয়ে 'পলিকাট' হ্রদেরও খুব নাম। উত্তর-দক্ষিণে চল্লিশ মাইল জুড়ে এই হ্রদটি অবস্থিত। শুধু বিস্তৃতির গৌরবই এর সবটুকু নয়, প্রয়োজনীয়তাও প্রচুর। পলিকাট হ্রদটি দিয়ে সর্ব্বদা বাণিজ্য-দ্রব্য আমদানী হচ্ছে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ভেতর।

ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, দ্রাবিড় জাতির যে খণ্ড ইতিহাস পাওয়া যায়, সেইগুলিই মান্দ্রাজের পূর্ব্ব-ইতিহাস। আর রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে যারা নররূপী নারায়ণ রামচন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন সেতুবন্ধন প্রভৃতি মহৎ কাজে, তাঁরাই মান্দ্রাজ অধিবাসীদের পূর্ব্ব পুরুষ—এখানকার আদিম জাতি।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী ভারতবর্ষের মধ্যে একটি মূল্যবান জায়গা। অনেক ধাতব ও খনিজ পদার্থে এ স্থানটি ধনবান। ভদ্রাচল ও দণ্ডগুডেমে কয়লার খনি আছে। সালেমে আছে লোহার খনি। এ লোহা সাধারণ লোহার পর্য্যায় থেকে একটু উঁচু স্তরের। বেনার ও কোলার অঞ্চলের খনিতে সোনা পাওয়া যায়। বেল্লরী ও নীলগিরির পাহাড়ে ম্যাঙ্গেনিজ মেলে। পূর্ব্বঘাট পাহাড়ে তামা পাওয়া যায়। মাদুরায় জন্মায় রূপো ও রসাঞ্জন।

রসাঞ্জন বস্তুটি কজ্জলবিশেষ—সুর্ম্মাও বলা চলে। এই তো গেল খনিজ পদার্থ ও পাথর প্রভৃতির তালিকা। এ ছাড়া মণি-মুক্তা প্রভৃতিও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীকে সমৃদ্ধ কোরে রেখেছে। উত্তর সরকারের দু-একটি জায়গায় হীরে ও অকীকমণি পাওয়া গেছে। কাবেরী নদীর উপত্যকায় পান্না মেলে।

এ সব ছাড়া বন-বিভাগও কম লাভজনক নয়। গভর্ণমেণ্ট এ বন-বিভাগকে সযত্নে রক্ষা করেন—প্রচুর অর্থাগম হয় এ থেকে। চমৎকার সাল-সেগুনের সারি এ বনে নিরুদ্বেগে মাথা তুলে বেড়ে ওঠে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর এমন বন বা পাহাড়তলী নেই, যেখানে হরিতকী জন্মায় না। এ অঞ্চলের প্রাচুর্য্য হরিতকীতে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সব অঞ্চলেই অল্প-বিস্তর চাষ-আবাদ হয়। ধান, তামাক, চা, কফি, নারিকেল, তাল প্রভৃতি প্রচুর জন্মায়।

আর ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে জন্মায় 'টেপিওকা'। টেপিওকাকে বড় সাগুদানা বলা যায়। সাগুর গুণাগুণ প্রভৃতি সবই টেপিওকায় বর্ত্তমান। কেবল একটু আকারে বড়, এই যা।

মান্দ্রাজে একসময় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের খুবই প্রভাব ছিল। এ অঞ্চলের পুরুষদের কাছাহীন কাপড় পরার ধরণই তার কতকটা প্রমাণ দেয়। তা ছাড়া, এ অঞ্চলের স্থানে স্থানে বৌদ্ধবিহার মঠ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ এ কথা বেশ ভাল কোরেই বুঝিয়ে দেয়।

উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা মুকুন্দদেব ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্ম অনুরাগী। তিনিই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে অগ্রণী। গঞ্জাম প্রভৃতি অঞ্চলে এরই

অধীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম শাখা বিস্তার করে। এখন বৌদ্ধধর্ম্মের সে প্রভাব ম্লান ও স্তিমিতপ্রায়। একেবারে নেই, এমন কথা বলা চলে না, তবে যা আছে, তা খুবই অল্প।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে নানান জাতের, নানান ধর্ম্মের লোকের বাস। এর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা খুবই বেশী, তারপর খৃষ্টান, তারপর মুসলমান। মুসলমান যা আছে, তা সামান্যই। হিন্দুর ভেতর নম্বুরী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা বেশী। তা ছাড়া, ব্রাহ্মণেতর আরো অনেক প্রকারের হিন্দুও আছে। যেমন, বেলসা, চেঠী, করুচর, বৃপ্পার, বেলাল্লব ইত্যাদি। হিন্দুরা দুইপ্রকারের মতাবলম্বী—একদল শৈব, আর একদল বৈষ্ণব। শৈবদল শঙ্করাচার্য্যের মতের পরিপোষক ও বৈষ্ণবদল রামানুজের। ধর্ম্ম ও মত প্রচারের ইতিহাসে এ অঞ্চলে এরাই চন্দ্র-সূর্য্যের মত দেদীপ্যমান।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে যে সব ভাষা সাধারণ ও প্রচলিত, তার মধ্যে প্রধানভাবে নাম করা যায়, তামিল, তেলেগু, কণাড়ী, তুলু ও মরাঠী। এ ছাড়া, গরীব, ধনী, বিদ্বান, মূর্খ প্রভৃতি সবাই অল্প-বিস্তর ইংরাজী বলতে পারে। এদিককার খুব কম লোকেই হিন্দী জানে। বরং সংস্কৃতগন্ধী বাংলা প্রয়োগ করলে একটু একটু বুঝতে পারে। কারণ, এ অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্বন্ধটা ঘনিষ্ঠ।

এখানকার খৃষ্টানরা খুবই প্রাচীন। সিরিয়ার মিশনারী যাঁরা ধর্ম্মপ্রচারে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বংশপরম্পরায় এই

দাক্ষিণাত্যে বাস কোরে আছেন। এ ছাড়া, সেই সময়ে এখানকার অধিবাসী যাঁরা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁরাও এখানে পুরুষানুক্রমে বাস করছেন। সুতরাং, ধর্ম্মে তাঁরা খৃষ্টান হলেও এই ভারতেরই অধিবাসী এবং ভারতবর্ষই তাঁদের মাতৃভূমি।

এই গেল সমগ্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মোটামুটি খবর। এইবার মান্দ্রাজ সহরের কথা বলি।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাজধানী হল এই মান্দ্রাজ সহর।

মান্দ্রাজ নামকরণ কি কোরে হয়েছে, সে সম্বন্ধে অনেক গবেষক অনেক কথা বলেন, কিন্তু মদ্রদেশ থেকে মান্দ্রাজ হয়েছে, এই ধারণাই সম্ভবপর। মদ্র শব্দের অর্থ হর্ষ বা আনন্দ। কাঞ্চী, অবন্তী প্রভৃতি ভারতের নামজাদা পৌরাণিক স্থানগুলি এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে বলেই 'মদ্র' কথাটি বোধ হয় ব্যবহৃত হয়েছে। তবে, নাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, একসময় এর নাম ছিল 'চেনাপত্তন'। নায়ক সর্দ্দার চেনাপ্পার নামেই এই চেনাপত্তন নাম প্রচলিত হয়। ইংরাজ এই মান্দ্রাজ সহরটি পায় দান-সম্পত্তি হিসাবে। দাতা ছিলেন বিজয়নগরের মহারাজা, আর গ্রহীতা ছিলেন ফ্রান্সিস ডে।

সত্যি, পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুর মত এমন মহানুভব জাত আর নেই। চিরকাল দিয়েই এসেছে এরা ;—বিলিয়েই এদের আনন্দ, নিয়ে নয় ; ত্যাগেই এদের পরিচয়, ভোগে নয়।

আধুনিক মান্দ্রাজ সহরটিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—এক ভাগ ব্ল্যাক টাউন, আর এক ভাগ হোয়াইট টাউন। ব্ল্যাক

মাদ্রাজের একটি জনবহুল পথ—হুয়াইট টাউন—পৃঃ ৬০

টাউন হচ্ছে 'কুউম' নদীর ধারে। এখানে সাধারণতঃ কালো চামড়ার লোকেরা বাস করে, আর সহরের জমজমাটি জায়গা যেখানটি, তাকে বলে হোয়াইট টাউন। অর্থাৎ সমুদ্রের ধার, ব্যাঙ্ক, কাষ্টমস্, হাইকোর্ট, বড় বড় আফিস প্রভৃতি যেখানে আছে, সেই অংশের নাম হোয়াইট টাউন। এখানে 'সাহেব-সুবো'' বড়লোক, সিভিলিয়ান, জুডিসিয়াল অফিসারেরা থাকেন। হোয়াইট টাউনের অঞ্চলে ইংরাজ শাসনের প্রথম ভাগে 'ফ্রান্সিস ডে'র কুঠী ছিল।

মান্দ্রাজের বিখ্যাত 'সেণ্ট মেরী গির্জ্জা' একটি দেখবার বস্তু। ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশে ইংরাজরা প্রথম এই গির্জ্জা স্থাপনা করেন। সুতরাং, সর্ব্বপ্রথম উপাসনা-মন্দির হিসাবে 'সেণ্ট মেরী গির্জ্জা'র ঐতিহাসিক মূল্য বড কম নয়। এই গির্জ্জাটির নির্ম্মাণকাল ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। প্রায় একশ' বছব ধরে এর নির্ম্মাণকার্য্য চলেছিল।

মান্দ্রাজের তিন দিকেই জল, সুতরাং প্রাকৃতিক বিপদ, ঝড়ের প্রাদুর্ভাব থেকে মাঝে মাঝে এ জায়গাটি বড বিপদগ্রস্ত হয়। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাতবার ভীষণ ঝড হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দেব ঝড় যেমন ভীষণ, তেমনি ক্ষতিকর হয়েছিল। এই বছবে নতুন তৈরী বন্দরটি একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ভেতর কৃষ্ণা-নদীর তীর থেকে প্রায় কুমারিকা পর্য্যন্ত এমন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল যে, দলে দলে সব স্থান পরিত্যাগ কোরে বিদেশে পালিয়েছিল।

উড্ল্যাণ্ড হোটেলে আহারাদি সেরে বেলা এগারোটা নাগাদ 'সা ওয়ালেস' কোম্পানীর আপিসে গেলাম। আপিস থেকে ত্রিমল্ল-তিরুপতি পর্ব্বতের বালাজী দর্শন বন্দোবস্ত স্থির কোরে হোটেলে ফিরে এলাম।

দুপুরটা জিরিয়ে, শ্রান্তি ঘুচিয়ে বেরুলাম বৈকালে। প্রথমেই গেলাম বীচ্ রোডের ওপর মৎস্যাগার দেখতে। এই বীচ রোড রাস্তাটিই হল সহরের সবচেয়ে বড় রাস্তা। এর দৈর্ঘ্য হবে প্রায় পাঁচ-ছ' মাইল। সমুদ্রের ধার দিয়ে এ রাস্তাটি গেছে। শুধু বড় নয়, রাস্তাটির সৌন্দর্য্যও বেশ উপভোগ্য।

মৎস্যাগারটি একটি দেখবার জিনিষ। বড় বড় ঘরের মত কাঁচের চৌবাচ্চা—চারিদিক বন্ধ। ভেতরে বিচিত্র ও বিভিন্ন রকমের নানা আকারের মাছ জিয়ানো আছে। মৎস্যাগারগুলির তলায় সমুদ্রতলের মত বালি স্যাওলা, শামুক ও ছোট ছোট জলজ গাছ দিয়ে ঠিক মাছের বাসের উপযোগী কোরে সাজানো। নানা বর্ণের, নানা আকারের ছাড়াও এমন অনেক মাছ দেখলাম, যাকে মাছ বলে মনে করাও শক্ত। কোনোটা সাপের মত, কোনোটা বাদুড়ের মত কোনোটা বা পাখীর মত। মাছকে সযত্নে পালন করবার জন্যে বন্দোবস্তের কোনরকম অভাব বা ত্রুটি এখানে নেই। মৎস্যাগারে যন্ত্রের সাহায্যে ক্রমাগত জল বদল হচ্ছে। পাছে বাসি বা দীর্ঘকাল স্থায়ী জলে মাছেরা মরে যায়, তাই মাঝে মাঝে অক্সিজেন গ্যাস দিয়ে মাছেদের জীবনী-শক্তিকে বাড়ানো হয়। একপ্রকার মাছ দেখলাম, সবার চেয়ে

আশ্চর্য্যকর—তার আকার হবে, হাত তিনেক লম্বা আর চওড়াও পৌনে এক হাত। এই অদ্ভুত মাছটি চুপ কোরে বসে বসে ক্রমাগত গলা ফুলিয়ে ফুলিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। শ্বাস গ্রহণের সময় গলাটা ফুলে ওঠে আর শ্বাস পরিত্যাগের সময় ফুলো গলাটা আবার সাধারণ ভাব ধারণ করে। সে সময় তার মুখের পানে চাইলে সত্যিই ভয় হয়। মান্দ্রাজ ভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তি এই চমৎকার মৎস্যাগারটি দেখতে ভুলবেন না।

এখান থেকে আমরা পার্থসারথির মন্দির দেখতে গেলাম। মান্দ্রাজ সহরের দক্ষিণে 'ট্রিপ্লিকেন' নামক স্থানে পার্থসারথির

পার্থসারথি-স্বামীর মন্দির—মান্দ্রাজ

মন্দির। পার্থসারথি অর্থে যে শ্রীকৃষ্ণ, তা হিন্দু মাত্রেই জানেন। মন্দিরের ভেতর কৃষ্ণবলরামের মূর্ত্তি। লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তিও দেখলাম। এ দেশীয় লোকেরা এই দেবীকে চর্পটাম্বা নামে অভিহিত করে।

দেবালয়ের সামনে একটি বৃহৎ সরোবর আছে। সবোববটির নাম তিরুইল্লিকেনী। এই সরোবরটির নামেই এ জায়গাটির নামকরণ হয়েছে বলে মনে হল। তিরুইল্লিকেনীরই অপভ্রংশ বোধ হয় টি্প্লিকেন। কারণ, এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা তিরু কথাটিকে চলতি কথায়"ত্রি" বলে।

পার্থসারথি দেবালয়ের সামনে আর একটি মন্দিব আছে। এর নাম ঈশ্বর স্বামী। এ প্রদেশে "ঈশ্বর" শব্দে শিবকে বুঝায়। এর সামনেও একটি চমৎকার পুষ্করিণী আছে। প্রতি আষাঢ় মাসে ঈশ্বর স্বামীর মন্দিরে উৎসব হয়।

মন্দিরাদি দর্শন সেরে হোটেলে ফিরতে প্রায় বাত ন'টা হল। মান্দ্রাজে ১৯৪০ সাল থেকে ব্ল্যাক আউট বা নিষ্প্রদীপ কবা আরম্ভ হয়েছে। মান্দ্রাজ নগরীকে রাত্রের নিয়ন্ত্রিত আলোব মৃদু আবছায়াতে স্বপ্নপুরীর মত মনে হচ্ছিল।

রাত্রে আহারাদির পর রোজনামচা লিখতে বসলাম।

প্রভাত বললে, "বৌদিকে ( বিলুব মাকে ) বলেছি, তিনিও নোট রাখছেন। আর আমি তো ক্যামেরা ঠিক কোরেই রেখেছি। ইতিমধ্যে খানকতক তোলাও হয়েছে।"

উডল্যাণ্ড হোটেলের খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, মৃদু আলোকিত মান্দ্রাজের রাজপথ......সামনে খুলে বসেছি ডায়েরী......ভাবছি, ওয়ালটেয়র থেকে কী কী দেখেছি পরের পর। হঠাৎ অনুভব করলাম, এতোদিনে যেন সংসারের বাঁধন একটু আলগা হয়ে এসেছে। তীর্থযাত্রার গৈরিক ধূলায় মন এখন

ধূসর। আকর্ষণ যা, তা ঝরে গেছে······মায়ার প্রদীপ এসেছে স্তিমিতপ্রায় হয়ে। বিষ্টুর কান্না······আত্মীয়-স্বজনের মুখ······ কলকাতার বাড়ী······কর্ম্মক্ষেত্রের নিয়মানুবর্ত্তিতা······সংসারের লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ······যারা তীর্থাগ্রগামী মনকে ক্ষণে ক্ষণে পেছু ডাকছিল, বিচলিত, বিক্ষিপ্ত করছিল, আজ তারা ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে ফিরে গেছে, আর তেমন কোরে ডাক দেয় না। আমাকে হয় ত অকেজো, নিরর্থক ভেবে ফিরে গেছে। ভালই হয়েছে। সবার রঙে রঙ মেশাবার জন্য আজ আর কেউ আমায় ডাক দেবে না। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন মন নিয়ে আজ আমি যেমন খুসি খেলা করতে পারব······যথেচ্ছা রঙ ফলাতে পারব।

হোটেলের জানালা দিয়ে রাস্তাটা দেখি, আর নানান কল্পনায় মন ভরে ওঠে। মনে হয়, এখন আমার—

সম্মুখে প্রশান্ত পথ দিগন্তে বিলীন।<br>
অন্তরে অনন্ত আশা পথপ্রান্তে লীন ॥

কল্পনা করি দিগন্তলীন তীর্থ-পথের ছবি, আর মনে মনে ভাবি—

যুগে যুগে কত মহামানবেরা<br>
এই পথ রেখা বাহি'<br>
ছুটেছে নিয়ত ঊর্দ্ধশ্বাসে<br>
মুক্তির পানে চাহি' :<br>
তাঁদের পূত চরণ-চিহ্ন রেখা—<br>
ভগবান-বুকে ভৃগু-চিহ্ন মত,<br>
আজিও রয়েছে লেখা।<br>
তাই, আমিও বারংবার,<br>
হে পথ, তোমারে করি নমস্কার ॥

# তিরুপতি-বালাজী

আজ ঘুম থেকে উঠলাম খুব ভোরে।

প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে রাওকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলাম মোটরের বন্দোবস্ত করতে। রেলযোগেও তিরুপতি যাওয়া যায়। তিরুপতি যেন কেন্দ্রস্থান; একে কেন্দ্র কোরে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—চারিপাশ থেকেই রাস্তা আর রেল এসে তিরুপতি ওয়েষ্ট স্টেশনে মিশেছে।

ত্নখানি ট্যাক্সি ঠিক হল। প্রত্যেকটির যাতায়াত ভাড়া ৪৬৲ টাকা। পথের দূরত্ব আন্দাজ ৯৫ মাইল।

দ্বিপ্রাহবিক আহারাদি একটু শীঘ্র সেরে নিয়ে বেলা বারোটা নাগাদ মোটরে উঠলাম। একটি মোটরে রাও, আমি, পাচক ব্রাহ্মণ ও আর একটি চাকর, আর অন্যটিতে উঠলেন বিলুর মা, প্রভাত, সহধর্ম্মিণী ও খুকুমণি।

মোটর চললো সহরের পাকা রাস্তা ধরে। বেশ স্নন্দর রাস্তা। নেলোর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর দিয়ে রেনুগুণ্টা স্টেশনের পাশ দিয়ে এ রাস্তাটি সোজা তিরুপতি পাহাড়ের তলায় গিয়ে পৌঁচেছে।

রেনুগুণ্টা স্টেশন পার হয়ে মাইল পনেরোর মধ্যে 'কালহস্তী' পড়লো। 'কালহস্তী' এ অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির।

মোটর থামালাম আমরা। পেছনে মেয়েদের গাড়ীখানিও এসে উপস্থিত হল। বেলা তখন সাড়ে তিনটা হবে।

কালহস্তী দেখবার জন্যে মন্দিরের কাছে গিয়ে শুনলাম, ঠাকুর ভোগের পর বিশ্রাম করছেন। বেলা ৫টার সময় মন্দির-দুয়ার খুলবে।

কি করা যায়! এখানে পাঁচটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হবে কি না, সে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল।

"হিতোপদেশ" এর অনুজ্ঞা অবহেলা কোরে সহধর্ম্মিণীর সহিত মন্ত্রণা করা গেল। তিনি বললেন, "এতোক্ষণ আট্‌কে না থেকে যাওয়াই ভাল। তা ছাড়া, নতুন জায়গা—পাহাড়ে উঠতে দেরী হয়ে যাবে, কতো রাত্তির হবে, কে জানে! যখন এই পথ দিয়েই ফিরব, তখন সেই সময় বিগ্রহ দর্শন করলেই হবে।"

এতো বলেও পরিশিষ্টে এটুকু বলতে ভুললেন না, "তোমরা যা ভাল বোঝ, করো।"

প্রভাত আর আমি উভয়ে মুখ-চাওয়াচায়ি করলাম, তাকালাম পথপ্রদর্শক রাও-এর মুখপানে।

রাও বললেন, "আমি মাতাজীর কথাই সমর্থন করি।"

সকলেই সমর্থন করলে সহধর্ম্মিণীর কথায়; জিত হল তাঁরই।

মোটর ছুটলো তিরুপতি-বালাজীর উদ্দেশ্যে। এখান থেকে আমাদের মোটরের দিক পাবিবর্ত্তিত হল দক্ষিণ-পূর্ব্বে। কালহস্তী থেকে তিরুপতির দূরত্ব হবে বাইশ মাইল।

বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় আমাদের মোটর তিরুপতি ওয়েষ্ট স্টেশনে পৌঁছিল। স্টেশনটি পাহাড়ের নীচে। পাহাড়ের ঠিক তলায় তিরুপতি নগর, আর তিরুমলয় অর্থাৎ তিরুপতি পাহাড়ের ওপরে বালাজীর মন্দির।

তিরুপতিকে কেউ কেউ ত্রিপতিও বলেন। তিরুপতি অর্থে শ্রীপতি ও মলয় অর্থে পর্ব্বত। চৈতন্য-চরিতামৃতে ত্রিমল্ল নামেও অভিহিত হতে দেখি। পুরাণে এর নাম আছে বেঙ্কটাদ্রি এবং দেবতার নাম বেঙ্কটেশ্বর।

স্কন্দপুরাণে এর মাহাত্ম্যে লেখা আছেঃ—একদা বিষ্ণু ও লক্ষ্মী অন্তঃপুরে ছিলেন। দ্বাররক্ষী ছিল শেষনাগ—এমন সময় বায়ু এসে বিষ্ণুর দর্শনপ্রার্থী হল। শেষনাগ নিজের কর্ত্তব্য করলে, জানালে যে, এখন প্রভুর সঙ্গে দেখা হবে না, তিনি অন্তঃপুরে আছেন। বায়ু তাতে রুষ্ট হয়ে শেষনাগকে অতিক্রম কোরে যেতে চাইল। বিবাদ ও বচসা আরম্ভ হল। গোলমাল শুনে স্বয়ং বিষ্ণু ঘটনার অনুসন্ধানের জন্যে বাইরে এলেন। সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত শুনে তিনি মন্তব্য করলেন যে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে শেষনাগ বায়ুর কাছে নিশ্চয়ই পরাজিত হবে।

বিষ্ণুর এ প্রকার মন্তব্যে শেষনাগ ক্রুদ্ধ হল এবং বললে, "ভাল। তাই যদি হয় তো, আমি জাম্বুনদীর তীরে বেঙ্কটগিরি জড়িয়ে থাকব, বায়ু যদি আমাকে স্থানচ্যুত করতে পারে, তবে আমি পরাজয় স্বীকার করব।" পরীক্ষায় বায়ুরই জয় হল। বায়ুর প্রকোপে পর্ব্বতের চূড়া সমেত কয়েক যোজন দূরে গিয়ে শেষ নাগ পড়ল। সেই থেকে এই অঞ্চলে দুটি বেঙ্কটাদ্রি আছে—একটি মূলপর্ব্বত জাম্বু নদীর তীরে, আর একটি তার স্থানচ্যুত চূড়া, যার অপর নাম তিরুপতি মলয়।

পরাজিত শেষনাগ তখন এই গিরিশৃঙ্গে বসে দীর্ঘকাল ধরে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করতে লাগল। সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু

একদিন দেখা দিলেন। বর প্রার্থনা করবার আদেশ দিলে, শেষনাগ বললে, "প্রভু, বৈকুণ্ঠে তুমি যেমন আমার কুণ্ডলীতে অধিষ্ঠিত, তেমনি এখানেও আমার দেহে চিরদিনের জন্য বিরাজ কর।" সেই থেকে বিষ্ণু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে এই তিরুপতি মলয়ে বিরাজ করছেন।

তিরুপতি নগর অর্থাৎ নিম্ন তিরুপতিতে পৌঁছে রাও বললেন, "আপনারা বসুন, আমি ততক্ষণ কোয়ার্টার (বাসা) ও দুধের জন্য টেলিফোন করে দি।"

বললাম, "টেলিফোন? কোথায় কোরবেন?"

রাও বললেন, "পাহাড়ের ওপরে, দেবস্থানমের আপিসে।"

বললাম, "এখান থেকে পাহাডেব ওপরে টেলিফোন করা যাবে?"

'হাঁ।' বলে রাও টেলিফোন করতে গেলেন।

ব্যবস্থা দেখে আনন্দ ও বিস্ময় দুইই হল। এ বড় কম সুবিধে নয়! ইত্যবসরে খবর পেয়ে মন্দিরের কর্ম্মাধ্যক্ষ এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। যাতে কোনরূপ অসুবিধে না হয়, তার জন্যে নিজে উপস্থিত থেকে তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। পাহাড়ে ওঠবার জন্যে ঠিক হল, বেতের হেলান-দেওয়া চেয়ার ও ডবল-ডুলি। ডবল-ডুলিতে আমরা অর্থাৎ পুরুষরা, আর মেয়েদের জন্যে হেলান-দেওয়া চেয়ার। শুনলাম, সাধারণ ডুলির যাতায়াত ভাড়া চার টাকা।

অক্ষম না হলে, সাধারণতঃ যাত্রীরা হেঁটেই যায়।

এই সব বন্দোবস্ত করতে করতে আধ ঘণ্টা কেটে গেল। ছ'টার পরে আমরা বাহকদের কাঁধে চেপে তিরুপতি মলয়ে উঠতে আরম্ভ করলাম।

দেখলাম, এই পথ ধরে অনেক যাত্রী পায়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠছে। এদের মধ্যে কেউ বা সক্ষম, কেউ বা অক্ষম। শুধু শরীরে কেন, হয় ত অর্থেও। হয় ত সামর্থ্যে কুলোচ্ছে না, এদিকে ডুলি-ভাড়াও সংগ্রহ হয় নি। তবু ভগবান যাকে টেনেছেন, সে কি থাকতে পারে! শক্তি নেই, আগ্রহ আছে......সামর্থ্য নেই, কিন্তু চরণ-দর্শনের পিপাসা যে আকণ্ঠ! আস্তে আস্তে......ধীরে ধীরে জিরিয়ে জিরিয়ে পাহাড়ে উঠছে......আশা—একবার বালাজীর ভুবনমোহন রূপ দেখবে......শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবানের মনোহর মূর্ত্তি দেখে দু'চোখ জুড়োবে।

সবাইয়ের মুখে অনবরত শোনা যাচ্ছে "গোবিন্দ, গোবিন্দ।" এই নামের মহিমায় তাদের পথের ক্লান্তি বোধ হয় প্রশমিত হচ্ছে। কী প্রাণপণ চেষ্টা, কী ঐকান্তিক আগ্রহ!

দেখলে মনে হয়, ভগবান এইখানেই জাগ্রত। তা যদি না হবে, দিবারাত্রি দলে দলে এই যে নর-নারী চলেছে......কেন? কিসের জন্যে?

রাত্রির গভীর নির্জ্জনতার বুক চিরে পার্ব্বত্য-প্রদেশ জুড়ে কেবল কানে বাজ্ছে যাত্রীদের নাম-গান—গোবিন্দ, গোবিন্দ। মাথার ওপর অগণ্য তারকাখচিত আকাশ, দু'পাশে ছায়ান্ধকার পার্ব্বত্য-প্রদেশের বৃক্ষশ্রেণী......ঝিঁঝিঁপোকার ঐক্যতান......

তিরুপতি-বালাজীর পার্ব্বত্য পথে বিশ্রাম—পৃঃ ৭০

মাঝে মাঝে মৃদুমন্দ বায়ুপ্রভাবে ভেসে-আসা অপরিচিত ফুলের গন্ধ।

অস্ফুটে আমরাও আবৃত্তি করতে লাগলাম, "গোবিন্দ, গোবিন্দ।" 'গোবিন্দ' কথাটিকে ওদেশের লোক "গোঈন্দা" উচ্চারণ করে। বেশ একটি টান্ দেয় কথাটির শেষ আকারের ওপর। মনে হয়, ভক্তজনের প্রাণস্পর্শী ব্যাকুলতা যেন ওই টান্‌টিকে কেন্দ্র কোরে মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করছে।

তিরুপতি নগর থেকে তিরুপতি-বালাজীর মন্দির প্রায় সাত মাইল। পাহাড়ের রাস্তাটি বরাবর ইলেকট্রিকের আলোয় উদ্ভাসিত। যাত্রীদের যাতায়াতের জন্যে এ অঞ্চলেব প্রায় সব মন্দিব-পথেই ইলেকট্রিকের আলো আছে; এবং রাস্তাও যতদূর সম্ভব সুগম করা হয়েছে।

তিরুপতি মলয় বা তিরুপতি পাহাড়টির আকৃতি সপ্তফণা সাপের মত। সপ্তম ফণা অর্থাৎ শেষ ফণায় তিরুপতি-বালাজীর মন্দির। প্রথম ফণাটির উচ্চতা দু'হাজাব ফিট।

শেষনাগের শেষ ফণায় বালাজী-মন্দির সন্নিকটে যখন পৌঁছুলাম, তখন রাত্রি সাড়ে ন'টা হবে। আন্দাজ সাড়ে তিন ঘণ্টা আমাদের সময় লেগেছিল উঠতে। পূর্ব্বে বলেছি, রাও আগে থাকতে টেলিফোন কোরে দেবস্থানমের কামরা আমাদের জন্যে স্থির কোরে রেখেছিলেন, সুতরাং সে বিষয়ে মোটেই অসুবিধা হল না।

দেবস্থানমের কামরাগুলি বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।

রাও বললেন, "বেলা সাতটার মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করাই বিধি। সাধারণে বলেন, এতে অশেষ পুণ্য হয়।"

কাজেই, আর বিশেষ দেরী না কোরে, আহারাদিব পর "যে যার" শুয়ে পড়লাম। আগামী প্রভাতে বিশ্বরূপ দর্শনেব কল্পিত আনন্দে বিভোর হয়ে একসময় ঘুম এলো।

শেষ রাত্রে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। মাথার শিয়রের জানালাটা সামান্য খোলা ছিল, দেখলাম, তারই ফাঁক দিয়ে একঝলক ধবধবে চাঁদের আলো বিছানার একধারে এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে, কে যেন রাশীকৃত মল্লিকা বিছানার পাশে সযত্নে হালকাভাবে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। মনটা কেমন কোরে উঠল। উঠে বসলাম। অতি সন্তর্পণে, আস্তে আস্তে খুলে দিলাম জানালাটা। যেন চুরি করছি, কারো ঘুম না ভেঙ্গে যায়; এমনি সঙ্কুচিত সতর্কতা। আহা, কী চমৎকার রাত! আলোয় আলো হয়ে গেছে চারিধার। সমস্ত মনটা আনচান কোরে উঠলো। উঠে দোর খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। চাঁদের আলোয় পৃথিবী একাকার হয়ে গেছে। ওপবে......নীচে, আশে......পাশে, যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল জ্যোৎস্না...... ফুটফুটে......সাদা......ধবধবে জ্যোৎস্না। উঁচু উঁচু প্রস্তরখণ্ডে, মন্দিরের স্তম্ভগাত্রে, কার্নিশে, প্রাঙ্গনে......কে যেন গলানো রূপো ঢেলে দিয়েছে।......আকাশে তারা নেই। চাঁদের আলোর কাছে হার মেনে সব বোধ হয় ডুব দিয়েছে গগন-সমুদ্রে......কেবল জেগে আছে শুকতারা......বিশ্বপুরুষের সজাগ, বিনিদ্র আঁখি যেন পাহারা দিচ্ছে পৃথিবীকে—জ্বলজ্বল করছে এর দ্যুতি।

নিস্তব্ধ······নিঝ্‌ঝুম······আলোকিত রাত। সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়েছে। মনে হল, কেবল জেগে আছি আমি আর চাঁদ।······ সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের মত একটা শিহরণ সর্পিল গতিতে ঢেউ খেলে গেল। মনে হল, এই তো সেই রাত। এমনি জ্যোৎস্না-শীতল রাত্রিতে মহাপ্রভু বোধ হয় বালাজীর মন্দিরে এসেছিলেন। সমস্ত রাত্রি এই দুর্গম পাহাড়ের বুকের ওপর প্রভুর চরণাঘাতে হয় ত সোনার কমল ফুটে উঠেছিল। তাঁর মুখের গোবিন্দনাম শুনে বনচর পশু-পক্ষীরা হয় ত জেগে উঠেছিল······আকাশে চাঁদ উঠে পথ দেখিয়েছিল।

এই বালাজী দেখে গৌরাঙ্গদেব কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলেন। ওই সেই মন্দির······ওরই ভেতর ভগবানের সেই নয়নাভিরাম চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। মনে মনে বললাম, যে মূর্ত্তিতে, যে মহিমায় তুমি তাঁকে দেখা দিয়েছিলে, তেমনি কোরে আজ এই জ্যোৎস্না রাত্রে, নির্জ্জনতার মাঝে আর একবার জেগে উঠতে পারো না ভগবান ······একবার প্রাণভরে দেখে নি।······হায় রে, সে ভাগ্য কি করেছি! ভাবলাম, ভাগ্য করি নি তেমন সত্যি······ভক্তি, অনুরাগ কিছুই তেমন নেই······তবু, তুমি ত আছ প্রভু, তুমি তো বদলাও নি! এই সামান্য ব্যাকুলতায় যদি একবার দেখা দিতে!

'গোবিন্দ······গোবিন্দ'······চমকে উঠলাম! এই নির্জ্জনতা ভেদ কোরে কে ও বলে উঠল গোবিন্দ! কে ও?

দেখলাম, এক যাত্রী! ঘুমের ঘোরে 'গোবিন্দ, গোবিন্দ'

বলে উঠে বসেছে। ঘরে এলাম। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

পরের দিন, সকালে উঠে মন্দির-সংলগ্ন পুষ্করিণীর জল-স্পর্শ কোরে শুদ্ধচিত্তে বিশ্বরূপ ও আরতি দর্শন করলাম।

শুনলাম, সাধারণের জন্য বারোটার পর প্রায় আধ ঘণ্টা বালাজীর মন্দির খোলা থাকে। অন্য সময় দেখতে হলে সাধারণ ধার্য্য দর্শনীর চেয়ে বেশী দিতে হয়। দেবতার দুগ্ধ-স্নান দেখবার জন্য দর্শনী তেরো টাকা। তুলসী দিয়ে সহস্র নাম অর্চ্চনার জন্যে সাত টাকা এবং কর্পূরালোকে ভগবানের রূপ দর্শনের জন্য মাত্র এক টাকা। আমরা বেলা দশটার সময় আবার দেব-দর্শন পূজার্চ্চনা ও আরতি করলাম। প্রতি চারজন পিছু সাত টাকা কোরে দর্শনী দিতে হল।

বাইরে বেরিয়ে যখন মন্দির আশ্রমে ফিরছি, তখন দেখলাম মোহান্তর হাতী সুসজ্জিত হয়ে ঠাকুরের অভিষেকের জন্যে মন্দিরের দিকে যাচ্ছে।

আগে মোহান্তই মন্দিরের হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু এখন তার বিশেষ কিছু হাত নেই। কারণ, মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট মন্দির পরিচালনার ভার নিজে গ্রহণ করেছেন। মন্দিরের কর্ম্মাধ্যক্ষ ( Executive Officer ) আছেন······যথারীতি সদস্য ও কমিটি আছে। এখন এ অঞ্চলের প্রায় সমস্ত দেবালয়ই এই বন্দোবস্তের ওপর চলছে। সুতরাং, মোহান্ত এখন নির্ব্বিষ সাপের মত।

কমিটি যা করবেন, তাই হবে। অবশ্য মোহান্তকে এই কমিটির সদস্যভুক্ত করা হয়েছে।

তিরুপতি-বালাজী মন্দিরের কাছাকাছি ছোট-বড় কতকগুলি সরোবর আছে। সেগুলিও পুণ্যতীর্থ। এই পুণ্যতীর্থগুলির মধ্যে স্বামীতীর্থ, পাপবিনাশিনী, গোগর্ভ, পাণ্ডবতীর্থ, তুম্বীরকোণ, কুমার-বারিকা ও বিরজাগঙ্গা প্রধান।

রাও আমাদের সঙ্গে কোরে এইগুলি দেখিয়ে আনলেন। সবগুলির জলস্পর্শ কোরে পুণ্যার্জ্জন করলাম।

প্রবাদ আছে, পাপবিনাশিনীতে স্নান করলে গো-হত্যার পাপও ক্ষয় হয়। এ প্রসঙ্গে লোকে বলে যে, পাপীর স্নানের সময় তার চারপাশের জল মলিনবর্ণ ধারণ করে। পাপ যে ক্ষয় হয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই।

স্বামীতীর্থের ধারে বিষ্ণুর বরাহরূপ দর্শন করলাম।

গোবিন্দ দাসের কড়চায় আছে, শ্রীচৈতন্যদেব ভগবানের এই বরাহরূপ দেখে ভাবে বিভোর হয়েছিলেন ও আত্মহারা হয়ে মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন কোরে অশ্রুসিক্ত নয়নে ভগবানের মহিমার গুণগান করেছিলেন।

বালাজীর মন্দিরের কাছে একটি প্রস্তরস্তম্ভ দেখলাম। এই স্তম্ভটির নাম ক্ষেত্র বলিগুণ্ডি।

প্রবাদ আছে যে, এই স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে কেউ মিথ্যা বলতে সাহস করে না। তাই সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে প্রমাণের দরকার হলে এই স্তম্ভকে সাক্ষ্য করা হয়; এবং স্তম্ভের সামনে যা

উচ্চারিত হয়, তাই বিনা প্রমাণে সবাই সত্য বলে মেনে নেয়। তবে, উভয় পক্ষকে এই প্রমাণের জন্যে সাত টাকা জমা দিতে হয়। পরে ঐ টাকায় মন্দির-কমিটি ভোগ রাঁধিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন কোরে দরিদ্র নারায়ণের এবং বৈরাগীদের সেবার্থে বিতরণ করেন।

তিরুপতি-বালাজীর উৎসবের সময় আশ্বিন মাস। এই সময় দশ দিন ধরে মেলা হয় এবং দেশ-বিদেশ থেকে অনেক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়।

বিষ্ণুর অভিষেক সম্পন্ন হবার পর আমরা পঁচিশ টাকার ভোগ দেবার ব্যবস্থা কোরে মন্দিরটি ঘুরে ঘুরে এর কারুকার্য্য প্রভৃতি দেখতে লাগলাম।

সিংহাচলমের মন্দিরের সঙ্গে এখানকার মন্দিরের গঠনকার্য্য পৃথক। স্থাপত্যশিল্পে ও কারুকার্য্যে তিরুপতি-বালাজীর মন্দির দ্রাবিড়ী শিল্পের পর্য্যায়ভুক্ত। এই দ্রাবিড়ী ভঙ্গির একটা পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। এ ধরণের কারুকার্য্য বা নির্ম্মাণকুশলতা অন্যের ভেতর দেখা যায় না। বৃহত্তর কি মহত্তর, সে বিচারের কথা এখানে নয়, তবে এইটুকু নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তিরুমলয়ের বালাজীর মন্দির রেখাপাত করেছে স্বতন্ত্রভাবে।

স্থানীয় লোকদের মুখে প্রবাদ যে, কুলোত্তুঙ্গ চোলের ছেলে তোণ্ডমন চক্রবর্ত্তী এই প্রসিদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের কাহিনী পড়লে মনে হয়, এই প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত রয়েছে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে—একদা নারদ ঋষি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যটন কোরে এসে এই বেঙ্কটাদ্রির কথা বিষ্ণুকে জানান এবং বলেন যে, এমন মনোরম স্থান ভারতে খুব অল্পই আছে। নারদের মুখে বেঙ্কটাদ্রির সুখ্যাতি শুনে বিষ্ণু বলেন, "কলিযুগে আমি এখানে বাস করব এবং চোল রাজচক্রবর্ত্তী আমায় প্রতিষ্ঠা করবে।" সুতরাং, চোল রাজচক্রবর্ত্তীই যে তোণ্ডমন, সে কথা অনুমান করা কিছুই অসম্ভব নয়।

রামানুজাচার্য্য এই বেঙ্কটশৈলে এসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বিষ্ণুমন্ত্রের পঞ্চ অক্ষর জপ করার পর তুষ্ট হয়ে শ্রীবিষ্ণু তাঁকে এইখানে দর্শন দেন।

চৈতন্য-চরিতামৃতে দেখি যে, চৈতন্যদেব এই বেঙ্কটাদ্রি বা তিরুপতিমলয়ে এসেছিলেন।

"মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী-ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখি বেঙ্কট অচলে॥

ত্রিপদী-ত্রিমল্ল যে এখানকার তিরুপতি মলয়, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নেই। উপরোক্ত পদটি কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে আছে। কিন্তু ভৃত্য, ভক্ত ও সহচর হিসাবে যে গোবিন্দ কর্ম্মকার মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন, তাঁর কড়চায় দেখি, মহাপ্রভু তিনবার ত্রিমল্ল পর্ব্বতে এসেছিলেন। এমন কি দু'শ মাইল দক্ষিণে অন্য তীর্থ দর্শন কোরে আবার উত্তর-পূর্ব্বে ফিরে এখানে এসেছিলেন।

মন্দির-প্রাঙ্গণ ঘুরে আমরা এখানকার দোকান-পসারগুলি

দেখলাম ও দু-একটি জিনিষ কিনলাম। তিরুমলয় সহরটি ছোট হলেও বেশ ভাল ভাল দোকান এখানে আছে। মন্দির-কমিটির লোকের মুখে শুনলাম, এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় দেড় হাজার—সবই হিন্দু। কারণ, পাহাড়ের নীচে তিরুপতি নগরে যে গোপুর দ্বার আছে, তার এদিকে হিন্দু ব্যতিরেকে অন্য কোন জাতির প্রবেশের অধিকার নেই।

বেলা একটা নাগাদ আমরা দেবস্থানমের কামরায় ফিরে এসে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

অল্পক্ষণ পরেই খিচুড়ী জাতীয় একপ্রকারের ভোগ আমাদের জন্য এসে পোঁছল। মন্দিরের পরিচারকেরা অল্প অল্প ভোগ পরিবেষণ করলেন। আমাদের বন্দোবস্ত মত বাকী সমস্ত ভোগ প্রসাদ-প্রার্থী দরিদ্র নারায়ণের জন্য বিতরিত হল। ভিক্ষুক, প্রার্থী প্রভৃতি জমায়েৎ হয়েছিল প্রায় দু'শো। প্রসাদের সঙ্গে দক্ষিণা হিসাবে প্রত্যেককে কিছু নগদ পয়সাও দেওয়া হল। কেউ বা সেইখানে বসে ভোগ আহার করলে, কেউ বা বস্ত্রাঞ্চলে বেঁধে নিয়ে গেল।

ভোগ-প্রসাদ আহারান্তে সামান্য বিশ্রাম কোরে আমরা যখন পাহাড়ের নীচে নামতে লাগলাম, তখন বেলা তিনটে।

ফেরবার পথে সমস্ত পাহাড়ের রাস্তার দুধারে অসংখ্য ভিক্ষুক দেখলাম। এই ভিক্ষুকের কথা সিংহাচলে উল্লেখ করেছি।

এই সব ভিক্ষুকের মধ্যে অধিকাংশ গলিত কুষ্ঠরোগী দেখলাম। এই প্রকারের ভিক্ষুক সীমাচলমে দেখেছিলাম, মনে পড়ল।

ভাবলাম, বাস্তবিকই এ সব ভগবানের বাহাদুরী। কারণ, যতগুলি কুষ্ঠী-ভিক্ষুক দেখলাম, সকলেরই ব্যাধি এক প্রকারের এবং ব্যাধিদুষ্ট অঙ্গও এক। বাঁ-হাতের আঙ্গুল ও কব্জীর খানিকটা গলিত ও বিকৃত, কিন্তু, আর একটি হাত অক্ষত, সেখানে রোগের চিহ্নমাত্র নেই, এমন কি দেহের অপর কোন অংশেও নেই। সত্যি, ভগবানের সেরাসৃষ্টি মানুষ—অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু রোগের এমন মিল কি কোরে হয়!

পরে, এ মিলের কারণ কি, তা জানতে পেরেছিলাম। এরা হল পেশাদার ভিক্ষুক। বিংশ শতাব্দীতে ভিক্ষা একটা পেশায় দাঁড়িয়েছে।

ভিক্ষার জন্য মাটি আর মেটে সিঁদুর দিয়ে হাতের ওপর এরা রোগের এমনি কৃত্রিম অনুকরণ করে। ধন্য ভিক্ষার পণ্য! হিন্দুজাত দাক্ষিণ্যপ্রবণ—পরের জন্যে এমন সর্ব্বস্বত্যাগী জাত পৃথিবীতে বিরল। ইতিহাসে, পুরাণে এর অসংখ্য পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং, তাদের এই দয়া ও দাক্ষিণ্যের সুযোগ নিয়ে ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে কতো ঠগ, বদমাইস এমনি কোরে দিনের পর দিন লোক ঠকাচ্ছে।

দেবদর্শনের পর দান পুণ্যকাজ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এসব প্রবঞ্চকদের দান করলে পুণ্য হয় কি না, সুধীজন তার বিচার করবেন।

নিম্নতিরুপতি বা তিরুপতি নগরে পৌঁছিতে প্রায় ছটা

বাজল। ওঠবার সময় যতটা সময় লেগেছিল, তা থেকে কিছু কম সময় লাগল নামবার বেলায়।

নিম্ন তিরুপতি অতি প্রাচীন সহর। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় পনেরো হাজার। ডেপুটী কালেক্টরের আফিস, ডিষ্ট্রিক্ট মুন্সেফী আফিস, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস প্রভৃতি সবই আছে।

নিম্ন তিরুপতিতে ছোট-বড় নিয়ে প্রায় একত্রিশটি দেবালয় আছে। তার ভেতর প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দুটি—রামস্বামী ও গোবিন্দস্বামী। প্রবাদ যে, গোবিন্দস্বামী, বেঙ্কটস্বামী বা বালাজীর জ্যেষ্ঠ সহোদর। কিন্তু কনিষ্ঠের মত নীচে আছেন কেন, তা বুঝলাম না। বোধ হয় জ্যেষ্ঠের ত্যাগের প্রমাণ—তাই, কনিষ্ঠকে ওপরে রেখে তিনি নীচে আছেন।

গোবিন্দস্বামীর মন্দিরে শেষ শয্যায় অর্দ্ধ-শায়িত বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখলাম।

এ ছাড়া; নিম্ন তিরুপতিতে মহালক্ষ্মীর মন্দির দর্শন কোরে একটি কথা মনে হল। বাবা অর্থাৎ বেঙ্কটস্বামী বা বালাজী আছেন ওপরে, পাহাড়ের মাথায়, আর মা অর্থাৎ মহালক্ষ্মী আছেন নীচে। দেবী নীচে, দেব ওপরে। ভগবানের লীলা সাধারণের পক্ষে বোঝা দুস্কর। সাধারণ মানুষ আমরা, সাধারণ পরিধিতে ঘুরি। সেই সাধারণ বুদ্ধি ও কল্পনা নিয়ে বিচার করতে গিয়ে মনে হল, এ বোধ হয় দাম্পত্য কলহের ফল। অভিমানে মা বোধ হয় এমনি কোরে নীচে আসন পেতেছেন। কে জানে, কবে এই দাম্পত্য কলহের অবসান হবে!

প্রাচীন একটি উদ্ভটে আছে—'দাম্পত্যকলহেচৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'। কিন্তু এ ক্ষেত্রে, দেবতার বেলায়, এ কি মিথ্যে হয়ে গেল! কতো যুগ কেটে গেছে, তবু এ কলহের ক্রিয়া লঘু হয় নি। আজো কলহের গুরুভার বহন কোরে মা আমার পাহাড়ের নীচে থেকে ভক্তদের ভক্তির অঞ্জলি গ্রহণ কোরে নিজের পণ বজায় রেখে চলেছেন।

রাও অনেকগুলি ভাষা জানেন—ইংরাজী, হিন্দী, সংস্কৃত, তামিল প্রভৃতি। তাঁকে শ্লোকটি পূরো বলে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, দাম্পত্যকলহের ক্রিয়া ত লঘু হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে এমন· বিপরীত কেন ?"

হেসে উঠে রাও জবাব দিলেন, "মানুষের বেলা এ উক্তি খাটে কিন্তু দেবতার কলহ অতো সহজে লঘু হয় না।"

মহালক্ষ্মীর মন্দিরে সোনার পাত-মোড়া একটি গরুড়স্তম্ভ দেখলাম।

এখান থেকে আমরা কপিলতীর্থের ধারে গেলাম। কপিলতীর্থ পর্ব্বতগাত্রবাহী একটি জলপ্রপাত। লোকে বলে, এইখানে একসময় কপিলমুনি তপস্যা করতেন।

শুনলাম, যাত্রিগণ পাহাড়ে ওঠবার আগে কপিলতীর্থে গলায় "বেঙ্কট-কাঁটা" অর্থাৎ এক প্রকার রূপোর অথবা সোনার কাঁটা ধারণ কোরে গোবিন্দ নাম উচ্চারণ করতে করতে ওপরে ওঠে। পাহাড়ের ওপর স্বামীতীর্থে স্নান করার সঙ্গে সঙ্গে এই কাঁটা নাকি খসে পড়ে আপনি এবং ভক্তের মানৎ পূর্ণ হয়।

প্রায় দশ বছর আগে, আমার জেঠাইমা এমনি কোন একটি মানৎ কোরে কাঁটা ধারণের পর এই পাহাড়ে উঠেছিলেন। সে কাঁটা খসে পড়েনি বলে শুনেছিলাম। বিলুর মা বললে, সে কাঁটাটি এখনো তার কাছে এলাহাবাদে আছে। কপিলতীর্থের জলস্পর্শ করলাম আমরা।

এ তীর্থের সামনে একটি গোপুর আছে। এই গোপুর কথাটি আগেও একবার উল্লেখ করেছি। গোপুর অর্থে সাধারণ ভাবে সিংদরজা বা প্রবেশদ্বার বলা যেতে পাবে। এ অঞ্চলের প্রত্যেক মন্দিরেই এ রকমের গোপুর আছে। গোপুর অতিক্রম না করলে মন্দির সীমানার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। তিরুপতি মলয়তলে এই যে গোপুর আছে, এরই সামনে মন্দির-কমিটি কড়া পাহারা রেখে দিয়েছেন, যাতে হিন্দু ভিন্ন অপব কোন জাত মন্দির সীমানার মধ্যে প্রবেশ না করতে পারে।

কপিলতীর্থের একমাইল দূরে এলরু তালুকে এ তিরুপতি ছাড়া পাহাড়ের ওপর আরো একটি তিরুপতি মন্দির আছে। এর নাম দ্বারকা তিরুমল। এটিও একটি মহাপুণ্য স্থান।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাজেই সেখানে যাওয়া আর সম্ভব হল না।

কাছাকাছি দোকানগুলি ঘুরে তিরুপতি সহরের স্মৃতিহিসাবে কয়েকটি জিনিষ সঙ্গে নিলাম। এখানে চন্দনকাঠের ওপর ও তামার ওপর খোদাই করা ভগবানের প্রতিকৃতিগুলি খুবই সুন্দর।

এইবার প্রত্যাবর্ত্তনেব পালা। ফেরার মুখে কালহস্তী দেখা যাবে, একথা আগে থেকেই স্থির কোরে রেখেছিলাম। সুতরাং, মোটর চললো কালহস্তীর উদ্দেশে।

## শ্রীকালহস্তী

কালহস্তী নেলোর জেলার অন্তর্গত। এখানকার লোক সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। এখানে সবরকম জাতের লোকের বাস আছে। সহরের মাঝখানে জমিদারের বাড়ী ও বাজার। একজন ম্যাজিষ্ট্রেটও এখানে থাকেন।

এখানকার লোকে কালহস্তীকে শ্রীকালহস্তী, ত্রিকালহস্তী, কালাহস্তী, কোলস্ত্রী বা কালেহস্ত্রী প্রভৃতি নামে অভিহিত করে। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ একে ভক্তিভরে দ্বিতীয় কৈলাস বলে থাকেন।

পৌরাণিক তথ্য থেকে জানা যায়, ব্রহ্মা তপস্যা করবার জন্যে কৈলাস পর্ব্বতের শিখরাংশ এখানে বয়ে নিয়ে আসেন—সেইজন্যে এর পৌরাণিক নাম দক্ষিণ-কৈলাস।

শ্রীকালহস্তী মন্দিরে দেবতার বায়ুমূর্ত্তি—অর্থাৎ কোনো মূর্ত্তি নেই। শ্রীকালহস্তীর সম্বন্ধে পুরাণে বর্ণিত আছে যে, মহাদেবের

মন্দিরে এক সময়ে একটি হাতী ও একটি সাপ প্রত্যহ পূজা করত এবং আর একটি মাকড়সা মাথার ওপর ঊর্ণ অর্থাৎ জালের আচ্ছাদন দিত। সাপ ভক্তিভরে নিজের মাথার মণিটি মহাদেবের মাথায় স্থাপনা করত, আর হাতী শুঁড় দিয়ে জলাভিষেক করত। এমনি নিয়মিত চলে। একদিন দুর্ঘটনাক্রমে হাতীর শুঁড়টি সজোরে সাপের গায়ে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আহত ভুজঙ্গ গর্জ্জন করে উঠে, হাতীকে দংশন করলে আর হাতী শুঁড় দিয়ে দিলে আঘাত। ফলে, সাপের দংশনে হাতীও মরল, শুঁড়ের ঘায়ে সাপও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হল। মহাদেব দুটি ভক্তেরই মৃত্যু হল দেখে কৃপাপরবশ হয়ে তাদের পুনর্জীবিত করলেন। সেই থেকে এ মন্দির শ্রীকালহস্তী নামে প্রসিদ্ধ। শ্রী অর্থে ঊর্ণনাভ, কাল অর্থে সাপ আর হস্তী।

রাও বললেন, সেই থেকে মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে মন্দিরের নামের সঙ্গে তিনটি ভক্তের নাম যুক্ত কোরে মন্দিরের নামকরণ করেছেন। সেইজন্যে মহাদেবের আর এক নাম বোধ হয় পশুপতিনাথ—নগণ্য মাকড়সা থেকে গণ্য হাতী পর্য্যন্ত।

এই মন্দিরের সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী রাও শোনালেন। যদিও এ কাহিনী পুরাণে নেই, তবু বহুদিন ধরে লোকের মুখে মুখে এই গল্পটি প্রচলিত। কাহিনীটি এই ঃ—

কন্নাপণ নামে এক ব্যাধ এই পর্ব্বতে বাস করত। তার কাজ ছিল, প্রত্যহ মহাদেবের পূজো দিয়ে তাঁকে আহার্য্য-দ্রব্য নিবেদন কোরে তবে আহার করা। কিছুদিন পরে, হঠাৎ একদিন কন্নাপণের মনে হল যে, মহাদেবের একটি চোখ বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে।

ভক্ত কন্নাপণ তাই ভেবে মহাদেবের নষ্ট চক্ষুর জায়গায় নিজের একটি চোখ উপড়ে বসিয়ে দিলে। কিছুদিন যাবার পর, আবার তার সন্দেহ হল যে, মহাদেবের আর একটি চোখও বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং, এবারেও সে নিজের আর একটি চোখ উপড়ে মহাদেবের দ্বিতীয় নষ্ট-চক্ষুর স্থানে স্থাপিত করলে। দ্বিতীয় চোখটি বসাবার সময় অন্ধ হওয়ার ফলে সে নাকি মহাদেবের ওপর পা রেখেছিল। সেইজন্য পাশেই আর একটি যে প্রস্তর-লিঙ্গ আছে, তাতে কন্নাপণের পায়ের ছাপ বর্ত্তমান। কন্নাপণ এই ত্যাগের মহিমায় আজো অমর হয়ে আছেন। প্রতিদিন মহাদেবের পূজার সঙ্গে কন্নাপণের পূজা হয়।

আগেই বলেছি, শ্রীকালহস্তী এখানে বায়ুলিঙ্গ। অনেকগুলি প্রদীপ এই মন্দিরের ভেতর জ্বালান থাকে ; এবং এই অরূপ লিঙ্গের স্থান নির্দ্দেশ কররার জন্য একটি প্রদীপ আলাদা ভাবে মাঝে বসান আছে। দেখা গেল, মন্দিরের ঐ দ্বীপশ্রেণীর নিকট বায়ু প্রবেশের কোন পথ নাই, তবু ঐ মাঝে বসান প্রদীপের শিখাটি থরথর কোরে কাঁপে। এই দীপ-শিখার আন্দোলনই যে বায়ুলিঙ্গের প্রমাণ, সে কথা পূজারীরা বর্ণনা করে।

মহাদেবের সঙ্গে এখানে পার্ব্বতীও আছেন। দেবীর নাম জ্ঞানপ্রসন্না। শোনা যায়, একদা মহাদেব নাকি রুষ্ট হয়ে পার্ব্বতীকে শাপ দেন। শাপের প্রভাবে পার্ব্বতীকে মানব-দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং বহুদিন তপস্যার পর আবার মহাদেবের বরে মানব-দেহ ত্যাগ কোরে মহাদেবের সঙ্গে মিলিত হন। উক্ত তপস্যার

সময় পার্ব্বতীর সঙ্গে দুর্গা নাম্নী একটি মহিলা বরাবর তাঁর সেবা করেছিলেন। পার্ব্বতীর সঙ্গে এঁরও মুক্তি হয়। এই দুর্গার নামে এখানে একটি মন্দির আছে, তার ভেতরে দেবী আছেন—দুর্গাম্মা। ( দুর্গা + আম্মা = দুর্গাম্মা )। আম্মা শব্দের অর্থ তেলেগু ভাষায় 'মা'। পার্ব্বতীর মত দুর্গাম্মারও নিত্য পূজা, আরতি হয়।

রাও বললেন, "স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে, কোন স্ত্রীলোক ভূতগ্রস্ত হলে অথবা মৃতবৎসা বা অপুত্রক হলে এইখানে এসে ভিজা কাপড়ে "হত্যা" দিতে হয়। এই "হত্যা" দেওয়াকে ওদেশে "প্রাণাচার" বলে।

শিব-মন্দিরের দক্ষিণ পাহাড়ের গায়ে মণিকুণ্ডেশ্বরের মন্দির আছে, শুনলাম। এর সম্বন্ধে শোনা যায়, কোন এক স্ত্রীলোক এক সময় মহাদেবের তপস্যা করেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তার বাঁ কানে 'তারক-ব্রহ্ম' মন্ত্র দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। এই কাহিনীর ওপর ভিত্তি কোরে স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস যে, এইখানে বাম দিকে ফিরে বাঁ কান চেপে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলে ডান কান দিয়ে আত্মা বেরিয়ে যায় এবং সেই মৃতব্যক্তি মুক্তি পায়। এই বিশ্বাসে আমাদের দেশের গঙ্গাযাত্রা করার মত অনেক মুমূর্ষু ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্ব্বে তারক-ব্রহ্ম নাম শোনাতে শোনাতে এখানে এনে উপস্থিত করা হয়।

এই সব গল্প রাও-এর মুখে শুনতে শুনতে শ্রীকালহস্তীতে আমাদের মোটর এসে পৌঁছল। ঘড়ি খুলে দেখলাম ন'টা বেজে গেছে। নিয়মানুসারে ন'টা পর্য্যন্ত মন্দির খোলা থাকে এবং

দর্শনাকাঙ্ক্ষীদের বিগ্রহ দর্শন করতে দেওয়া হয়। মনটা দমে গেল শুনে। তবু একবার চেষ্টা কোরে দেখবার জন্য মোটর থেকে নামলাম। দেখি, আমার স্ত্রী অপেক্ষা কোরে দাঁড়িয়ে আছেন, পাশে প্রভাত, বিলুর মা ও খুকুমণি।

আমার স্ত্রী বললেন, "আমাদের মোটরখানা ঠিক ন'টার সময়ই এখানে পৌঁছেচে, তখন মন্দিরের দুয়ার বন্ধ হচ্ছে।"

প্রভাত বললে, "মন্দিরের কর্ম্মাধ্যক্ষের কাছে তোমার গাড়ী আসছে, এই কথা জানিয়ে কোনরকমে মন্দির খুলিয়ে রেখেছি।"

মন্দির দর্শনের জন্য কেনা টিকিটগুলি আমার হাতে দিতে দিতে প্রভাত বললে, "চলো, আর দেরী কোরে কাজ নেই।"

মন্দির-প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে করতে ভাবলাম, এ সংযোগকে কী বলে অভিহিত করি—ভাগ্য না, প্রভাত ও সহধর্ম্মিণীর তৎপরতা! অদৃষ্ট না পুরুষকার!

যথাবিহিত মন্দিরাদি দর্শন কোরে মোটরে এসে উঠলাম। গোবিন্দদাসের কড়চার কথা মনে পড়ল, তৃতীয়বার ত্রিমল্ল দর্শনের পর মহাপ্রভু শ্রীকালহস্তীতে এসে মহাদেবের বায়ুলিঙ্গ দর্শন কোরেছিলেন।

মোটর চলবার আগে প্রভাত একবার জিজ্ঞেস করলে পেট্রোলের অভাব হবে কি না রাস্তায়!

যে পেট্রোলের হিসেব ড্রাইভারটি দিল, তাতে আমরা সন্দিগ্ধ হয়ে বললাম, "কাজ নেই, আরো কিছু পেট্রোল বেশী কোরে নিয়ে নাও।"

কিন্তু স্বভাবটা তাঁর একগুঁয়ে, সে কিছুতেই রাজী হল না, বললে, "পেট্রোল যা আছে, এই তে ঠিক পেঁীছে যাব।"

অপরিণামদর্শিতার জন্য দুর্ঘটনা ঘটল অর্দ্ধেক রাস্তায়। আমাদের সন্দেহকে সত্যে পরিণত কোরে মোটর দাঁড়িয়ে গেল। তখনো চল্লিশ মাইল যেতে বাকী।

আবার নিকটবর্ত্তী স্থানে লোক পাঠিয়ে পেট্রোল আনালাম। এই রকম কোরে দুর্ঘটনা এড়িয়ে যখন ফিরে এলাম মাদ্রাজ উডল্যাণ্ড হোটেলে, তখন রাত সাড়ে তিনটে।

পরের দিন ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হয়ে গেল। সকালের দিকে একবার 'সা ওয়ালেস' কোম্পানীর আফিসে গেলাম। তারপর কয়েকটি আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনতে সমস্ত বেলাটা কেটে গেল।

বৈকালের দিকে একাম্রনাথ দেখতে গেলাম। এই একাম্রনাথের কথা শিবকাঞ্চীতে বিস্তৃতভাবে বলব।

হোটেলে ফিরে জিনিষপত্র সব গোছ-গাছ কোরে টুরিষ্ট কারে পাঠিয়ে দিলাম। গোড়াতে যে টুরিষ্ট কারের কথা বলেছি, সেই টুরিষ্ট কারে ভ্রমণ এইবার সুরু হল। এই টুরিষ্ট কারকে এবার থেকে আমরা 'সেলুন' বলে উল্লেখ করব। ঠিক করলাম, আজই রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে সেলুন-গাড়ীতে গিয়ে ঘুমোব। আহারান্তে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বীচ (Beach) স্টেশনে পৌঁছে সেলুন-গাড়ীতে উঠতে রাত্রি প্রায় এগারোটা বেজে গেল।

পরের দিন ঘুম ভাঙল চলন্ত গাড়ীতে। দেখলাম, ট্রেণ

চলেছে কাঞ্চীপুরের দিকে। শেষরাত্রে বৈদ্যুতিক ট্রেণ যে কখন সেলুন টেনে নিয়ে গেছে টের পাই নি। এই বীচ স্টেশন থেকে একখানি বৈদ্যুতিক ট্রেণ ( Electric train ) প্রায় ত্রিশ মাইল প্রত্যহ যাতায়াত করে—এটি এখানকার একটি লোকাল ট্রেণ।

## কাঞ্চীপুর ( বা কাঞ্জীভরম্ )

মান্দ্রাজ থেকে কাঞ্চীপুর রেলযোগে প্রায় ৪৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে। কাঞ্চীপুর মান্দ্রাজ প্রদেশের চেঙ্গলপুত জেলার কাঞ্জীভরম তালুকের একটি প্রধান সহর। সহরটি দুভাগে বিভক্ত—এক ভাগের নাম শিবকাঞ্চী, অন্য ভাগের নাম বিষ্ণুকাঞ্চী। ফারগুসন সাহেবের মতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে অদণ্ড চক্রবর্ত্তী নামে একজন প্রথম এই সহর পত্তন করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কাঞ্চীপুর আরো প্রাচীন সহর। তার প্রমাণ তন্ত্রে দেখি—

"নাভিমূলে মহেশাণি অযোধ্যাপুরী সংস্থিতা।
কাঞ্চীপীঠং কটিদেশে শ্রীহট্টং পৃষ্ঠদেশকে॥"

'কটিদেশে কাঞ্চীপীঠ' কথাটি থেকেই এর প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয়ে যায়। তা ছাড়া, শাস্ত্রে সিদ্ধিদায়িকা পুণ্যস্থানগু'লর নামের তালিকায় দেখি—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা সিদ্ধিদায়িকা॥"

অর্থাৎ অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, কাঞ্চী, দ্বারকাপুরী, অবন্তী ও হরিদ্বার—এই সাতটি ভারতবর্ষের মোক্ষদায়ক স্থান। সাধারণে কাঞ্চীকে দক্ষিণ-কাশী বলে অভিহিত করে। শোনা যায়, কাশীর বিশ্বনাথ দর্শনে যে পুণ্যলাভ হয়, কাঞ্চীপুরের একাম্রনাথ দর্শনে অনুরূপ পুণ্য। তা ছাড়া, এর প্রাচীনতা ও প্রখ্যাতির আর একটি প্রমাণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের যে বর্ণনা আছে, যথা—'পুষ্পেষু জাতি, নগরেষু কাঞ্চী, স্ত্রীষু রম্ভা, নরপেষু রাম' প্রভৃতি, তার মধ্যে কাঞ্চী নগর শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছে।

বেলা নটা চোদ্দ মিনিটে আমাদের গাড়ী কাঞ্চীপুর (Conjeeverum) স্টেশনে পৌঁছল।

দক্ষিণ-ভারতের অন্যান্য জায়গায় যেমন ট্যাক্সি পাওয়া যায়, এখানে তেমন নয়। এখানে যান হিসাবে ব্যবহার হয় গরু কিম্বা ঘোড়ায়-টানা একরকম ছইওয়ালা গাড়ী। এদেশে এ গাড়ীগুলিকে বাণ্ডি বলে। আমরা ঘোড়ার বাণ্ডি ভাড়া কোরে একাম্রনাথ দেখবার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

এখানকার রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত এবং চমৎকার। মাইল খানেক পথ অতিক্রম কোরে আমরা শিবকাঞ্চীতে পৌঁছুলাম।

শুনলাম, একজন চেঠী প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ কোরে এই শিবকাঞ্চীর মন্দির তৈরী কোরে দিয়েছেন। শিবকাঞ্চীর মহাদেব "ক্ষিতিমূর্ত্তি।" বেলেমাটির লিঙ্গমূর্ত্তি, কাজেই অভিষেক হয় তেল আর মধু দিয়ে, পাছে মূর্ত্তিটি জল লাগলে গলে নষ্ট হয়ে যায়। কাছেই কামাক্ষী দেবীর মূর্ত্তি বিরাজমানা।
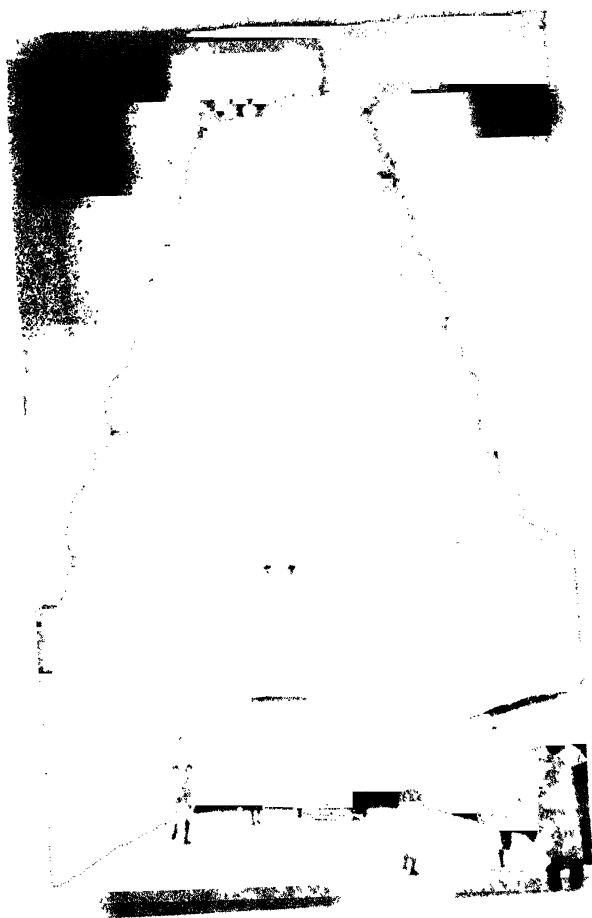
শিবকাঞ্চী—আর একটি গোপুর-দ্বার—পৃঃ ৯০

স্থলপুরাণে এই কামাক্ষী দেবীর সম্বন্ধে আছে যে, পার্ব্বতীর ওপর একদিন মহাদেব রুষ্ট হয়ে তাঁকে ত্যাগ করেন। দেবী অনেক অনুনয় বিনয় করার পর মহাদেবের ক্রোধের উপশম হয় এবং তিনি পার্ব্বতীকে কাঞ্চীপুরের কম্পানদী-তীরে ছ'মাস তপস্যা করতে বলেন। মহাদেবের আদেশ অনুসারে তপস্যা কোরে এইখানে মহাদেবকে লাভ করেন।

পুরোহিত বললেন, "ভোগমূর্ত্তি দেখতে হলে পাঁচ সিকা দর্শনী দিতে হবে।"

আমরা পাঁচ সিকা দর্শনী দিলাম। তালাচাবি বন্ধ একটি লোহার সিন্দুকের ছিদ্রপথে টাকাটি সিন্দুকে ফেলে দেওয়া হল। মন্দিরের কর্ম্মচারী খাতায় ঐ দর্শনীর টাকাটি জমা করলেন।

শুনলাম, দর্শনী প্রভৃতি সবই সিন্দুকের ভেতর দাতা নিজে ফেলে দেন এবং খাতায় জমা কোরে নেওয়া হয়। রাত্রে মন্দির বন্ধ হলে সিন্দুকের তালাচাবি খুলে সে টাকা খাতায় হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে ঠাকুরের তহবিলে জমা করা হয়।

দর্শনী জমা হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি লাল ভেলভেটের পর্দ্দা মন্দির-দরজার সামনে টেনে দেওয়া হল। তারপর মিনিট পাঁচেক পরে পরদাটি সরিয়ে নিতে দেখলাম। স্বর্ণ-মূর্ত্তি কামাক্ষী দেবী মহাদেবের স্বর্ণময় লিঙ্গমূর্ত্তিতে আঁকড়ে বসে আছেন। মনে হল, বালুকানির্ম্মিত যে ক্ষিতি-লিঙ্গটি আগে দেখেছিলাম, তারই ওপরে একটি সোনার টোপরের মত আচ্ছাদন দেওয়া হয়েছে।

প্রভাত দেবস্থানমের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে একটি ফটো

তুললে। শুনলাম এখানকার কোনো জায়গাতেই দেবদেবীর মূল-মূর্ত্তির ছবি নিতে দেওয়া হয় না। ভোগমূর্ত্তির ছবি ইচ্ছা করলে তোলা যেতে পারে।

দেবীর দেবতাকে আঁকড়ে বসে থাকার এই ভঙ্গি দেখে মনে হল, দেবী বোধ হয় সপত্নী ভয়ে সংশয়াকুল। কারণ, গঙ্গা হচ্ছেন সপত্নী। পাছে কেউ গঙ্গাজল দিয়ে মূর্ত্তির পূজো করে বলে বালির মূর্ত্তি ধারণ করে আছেন তবুও আশঙ্কায মা বোধ হয় বাবাকে আঁকড়ে ধরে আছেন।

একাম্রনাথের পূজার্চ্চনার প্রধান অঙ্গ অভিষেক।

মন্দির-প্রাঙ্গনে একটি আশ্চর্য্য রকমের আমগাছ দেখলাম। গাছটি বহু প্রাচীন। কতো এর বয়েস, তা কেউই বলতে পারলেন না। শুনলাম, এতে চার রকমের অর্থাৎ চার প্রকার স্বাদের চারটি ফল হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, এর অর্থ চতুর্ব্বেদ। কিন্তু আমার মনে হল, এর অর্থ অন্য রকম। ফল যখন প্রতীক, তখন এর উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, স্বরূপ চতুর্বর্গ ফল। অর্থাৎ একাম্রনাথ হচ্ছেন এই চতুর্বর্গ ফলদাতা।

শুনলাম, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দেহত্যাগের পূর্ব্বে এইখানে এসে একাম্রনাথ ও কামাক্ষী দেবীর পূজার্চ্চনা করেছিলেন। মন্দিরের অলিন্দে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সমাধি দেখলাম। যাত্রীরা এই সমাধিমূলে ভক্তিভরে শঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশে প্রণাম জানায়।

পূর্ব্বে মান্দ্রাজে যে একাম্রনাথের উল্লেখ করেছি, তিনি নকল

একাম্রনাথ। ইতিহাসে পাওয়া যায়, হায়দার আলির ভয়ে একাম্রনাথকে মান্দ্রাজে ও কামাক্ষী দেবীকে তাঞ্জোরে রেখে আসা হয়। পরে লর্ড ক্লাইব একাম্রনাথকে ফিরিয়ে এনে শিবকাঞ্চীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করান। আর এখানকার কামাক্ষী দেবীও নাকি নকল। আসল কামাক্ষী দেবী তাঞ্জোরে আছেন। একাম্রনাথকে শিবকাঞ্চীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার পর কামাক্ষা দেবীকে তাঞ্জোর আনতে গেলে, যাঁরা দেবীব রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন, তাঁরা ফেরৎ দিলেন না।

যথাবিহিত পূজার্চ্চনা সেরে সেলুনে যখন ফিরে এলাম, তখন একটা বেজে গেছে।

বেলা তিনটে নাগাদ আমরা আবার বিষ্ণুকাঞ্চী দেখতে বেরুলাম। বিষ্ণুকাঞ্চী স্টেশন থেকে মাইল চারেক হবে। এবারেও ঘোড়ার বাগ্ডিতে চেপে যাওয়া গেল। ঘণ্টাখানেক, কিম্বা তারো কিছু বেশী লাগল, এই মাইল চারেক পথ অতিক্রম করতে। শিবকাঞ্চীর চেয়ে বিষ্ণুকাঞ্চীর মন্দিব অনেক বড়। মূল মন্দিরটি একটি পর্ব্বতের উপর। মন্দিরের প্রথম মহলে নৃসিংহদেবের মন্দির।

এইখানে দাক্ষিণাত্যেব মন্দিরেব সম্বন্ধে একটু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক মনে করি। এ অঞ্চলে অধিকাংশ মন্দিরের চারিপার্শ্বে প্রাচীর দিয়ে একটি সীমানা করা থাকে। এই সীমানার বিস্তৃতি একশো দু'শো বিঘা, কিম্বা কখনো কখনো তারও বেশী জায়গা নিয়ে। এই সীমানার প্রাচীরের ওপর দ্বার থাকে। প্রায়ই এ দ্বার চারিটি হয়—যাতে চতুষ্পার্শ্বের যাত্রীরাই প্রবেশ করতে পারে। এই দ্বারকে

'গোপুরম্' বলে; ইতিপূর্ব্বে একেই আমি সিংদরজা বলে উল্লেখ করেছি। এই গোপুরম্ আমাদের দেশের নহবৎখানার মত বা মুসলমান স্থাপত্যে যাকে 'বুলন-দরওয়াজা' বলে, তার মত। এই গোপুরম্ 'থাক্-থাক্' কোরে সাত থেকে বারো-তেরো তোলা পর্য্যন্ত হয়। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরাদিতে গোপুরেরই বৈচিত্র্য এবং কারুকার্য্য দেখবার জিনিষ। নিচের কয়টি তোলা প্রায়ই গ্রেনাইট পাথরের তৈরী আর উপর তোলা গুলি চুণের কাজ করা। বইয়ের সঙ্গে গোপুরের ছবি কয়েকটি দিয়েছি, পাঠকরা সেগুলি দেখলে অনেকটা আভাষ পাবেন।

এই গোপুরম্ পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ কোরে মন্দির-প্রাঙ্গণে যেতে হয়। প্রাঙ্গণের আগে আরো কয়েকটি ছোট ছোট দ্বার পড়ে, এই দুই দ্বারের মাঝখানেব জায়গাটিকে প্রাকার বা মহল বলে উল্লেখ করেছি। এই সব মহল বা প্রাকারের মধ্যে সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত স্তম্ভ, মণ্ডপ, মূর্ত্তি-বিগ্রহ প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

এমনি প্রথম মহলে দেখলাম নৃসিংহদেবের মন্দির। প্রত্যেক প্রাকারে মূর্ত্তি, স্তম্ভ, বিগ্রহ প্রভৃতি দেখতে দেখতে আমরা মূল মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলাম।

বিষ্ণুকাঞ্চীর মূল মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুর যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বিরাজ করছে, তার নাম শ্রীশ্রীবরদরাজ স্বামী। ব্রহ্মা একসময় এখানে তপস্যা করেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে যজ্ঞের অগ্নি থেকে শ্রীবিষ্ণু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কোরে বর দানের জন্য আবির্ভূত হন; তাই এ বিগ্রহের নাম শ্রীশ্রীবরদরাজ স্বামী।

প্রতি শুক্রবার বরদরাজের অভিষেক হয়।

মন্দিরে বিগ্রহের কাছাকাছি দেওয়াল-গাত্রে একটি সোনার টিকটিকি দেখলাম। এই টিকটিকিটি প্রায় এক হাত লম্বা। যাত্রীরা কাঠের সিঁড়ির সাহায্যে ওপরে উঠে এই টিকটিকি স্পর্শ করেন।

পুরোহিতরা বললেন, "লোকে বিশ্বাস করে, এই টিকটিকি স্পর্শ করলে জেষ্ঠি-পতনের দোষ খণ্ডে যায়।

এই টিকটিকির সম্বন্ধে প্রবাদ শুনলাম, রাও-এর মুখে। তিনি বললেন, "শোনা যায়, একজন রাজা ব্রহ্মশাপে জেষ্ঠি-যোনি প্রাপ্ত হন। পরে ভাগ্যক্রমে ঘুরতে ঘুরতে এই মন্দিরে এসে বিগ্রহ দর্শনের পুণ্যে তার মুক্তিলাভ হয়।"

পূজার্চ্চনাদি সেরে আমরা মন্দিব-সমিতির কাছে বিগ্রহের অলঙ্কারাদি দেখতে গেলাম।

প্রথমেই তাঁরা দেখালেন একটি বহুমূল্য কণ্ঠহার, বললেন, "এটি স্যর সি, পি, রামস্বামী আয়ারেব মাতা দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করেছেন।"

তারপর দেখলাম বরদরাজের কিরীট একখানি। এটিও বললেন, জনৈক ব্রাহ্মণ দেবতাকে নিবেদন করেছেন। ব্রাহ্মণের নাম বলেছিলেন কিনা মনে নেই, বোধ হয় বলেন নি। লর্ড ক্লাইব যে কণ্ঠহারটি দিয়েছেন, তার দাম ছত্রিশ হাজার টাকা—সেটিও দেখলাম। এই সব অলঙ্কার প্রভুর উৎসব দিনে ব্যবহৃত হয়। এখানকার সব দেব-দেবীরই এক একটি ভোগমূর্ত্তি বা

উৎসব-মূর্ত্তি আছে, মূল বিগ্রহকে স্থানচ্যুত করার প্রথা বা নিয়ম নেই। শোভাযাত্রা, উৎসব, মন্দির-প্রদক্ষিণ প্রভৃতি যা কিছু কাজ, সবই এই উৎসব-মূর্ত্তি নিয়ে সম্পন্ন করা হয়।

এইবার আমরা স্বতন্ত্র মন্দিরে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি দেখতে গেলাম। এ মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু গঠনটি চমৎকার। স্তম্ভের গায়ে এমন বিচিত্র ও নিখুঁত কারুকার্য্য আছে যে, অনেকক্ষণ দেখেও আশ মেটে না।

শুনলাম, কিছুদিন আগে কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী মাগ্‌নীরাম ভাঙ্গড় একলক্ষ টাকা খরচ কোরে এই মন্দিরটি সংস্কার করিয়ে দিয়েছেন।

এ সব দেখা শেষ কোরে আমরা তীর্থের জল স্পর্শ করতে গেলাম। এখানে অর্থাৎ বিষ্ণুকাঞ্চীর সন্নিকটে সাতটি তীর্থ আছে—রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি সাতটি বারের নামে সাতটি তীর্থ।

এক সময় রামানুজাচার্য্য এইখানে দীক্ষার জন্য এসেছিলেন।

এ সম্বন্ধে কাহিনী আছে:—এক শূদ্র এক সময় বরদরাজের সেবা করত। এই শূদ্রের নাম কাঞ্চীপূর্ণ। একদিন রামানুজাচার্য্য এই শূদ্র কাঞ্চীপূর্ণকে গুরু করবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। কাঞ্চীপূর্ণ মনে মনে আনন্দিত হলেও প্রত্যবায় ভয়ে রামানুজের ইচ্ছার অনুমোদন করতে পারেন নাই। কারণ, রামানুজাচার্য্য ব্রাহ্মণ, আর কাঞ্চীপূর্ণ শূদ্র। কিন্তু রামানুজাচার্য্যও ছাড়বার পাত্র নন—প্রত্যহই তিনি এই প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। যখন অনুরোধ আর এড়ানো যায় না এমন অবস্থা, তখন কাঞ্চীপূর্ণ একদিন

পূজার্চ্চনা সমাপন কোরে বরদরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু! এ বিপদের উপায় কি করি ?"

ভগবান শ্রীবিষ্ণু তখন হেসে বললেন,—

"অহমেব পরং ব্রহ্ম জগৎকারণকারণম্।
দেহাবসানে ভক্তানাং দদামি পরমং পদম্।"

তারপর আদেশ দিলেন, "তুমি এই কথা ক'টি রামানুজাচার্য্যকে বলবে।"

পরদিন রামানুজাচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে কাঞ্চীপূর্ণ প্রভুর আদেশ মত উপরোক্ত শ্লোকটি বললেন।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন রামানুজাচার্য্য। কারণ, তার মনের তদানীন্তন সমস্যার সমাধান হয়ে গেল ওই ক'টি কথায়।

শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে চৈতন্যদেব এসেছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তাঁর দাক্ষিণাত্য প্রব্রজ্যার মধ্যে দেখি—

"শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন।
ও বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মী-নারায়ণ॥"

কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে উপরোক্ত শ্লোকটি দেখতে পাই, কিন্তু গোবিন্দদাসের কড়চায় একটু বিভিন্ন রকমের আছে। মহাপ্রভু এখানে ভবভূতি শ্রেষ্ঠী নামে একজন বণিকের বাড়ী প্রথমে অতিথি হন, তারপর বিষ্ণুকাঞ্চীর লক্ষ্মী-নারায়ণ দর্শন

করেন। শিবকাঞ্চীর নামোল্লেখ কড়চায় নেই, তবে এ কথা আছে, ছ' ক্রোশ দূরে ত্রিকালেশ্বর শিব ও গৌরী দেবী দর্শন করেছিলেন মহাপ্রভু। মনে হয়, শিব ও গৌরী বোধ হয় শিবকাঞ্চীর একাম্রনাথ ও কামাক্ষী-দেবী। কিন্তু বিষ্ণুকাঞ্চী থেকে একাম্রনাথের মন্দির মাত্র ক্রোশ দেড়েক, এইজন্যে অনুমানে একটু বিঘ্ন ঘটে।

রামানুজাচার্য্যের শিষ্য কুরেশ স্বামী সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী শোনা যায়।

শৈবরাজা কৃমিকণ্ঠ নাকি ভীষণ বৈষ্ণব-বিরোধী ছিলেন। কুরেশ স্বামীকে তিনি বারবার আদেশ দিতে লাগলেন, "তুমি শৈব হ'ও।"

কুরেশ স্বামী সে আদেশ পালন করলেন না দেখে কৃমিকণ্ঠ নির্য্যাতন সুরু করলেন। কুরেশ স্বামী কিন্তু অচল অটল, কিছুতেই নোয়ান গেল না। বৈষ্ণবের ধর্ম্মই যে সহিষ্ণুতা।

অবশেষে আবার নির্য্যাতন আরম্ভ হল এবং সে নির্য্যাতন চরমে উঠলো। একদিন কৃমিকণ্ঠ আদেশ দিলেন, "কুরেশ স্বামীর চোখ উপড়ে নাও।"

তৎক্ষণাৎ রাজাদেশ পালিত হলো।

এতেও কুরেশ স্বামী স্থির, বরং তিনি বললেন, "রাজা, তুমি আমার বন্ধুর কাজ করেছ। এমন জিনিষ উপড়ে নিয়েছ, যা দিয়ে কেবল বাইরেটাই দেখা যেত, ভেতরের এক কণাও দেখতে পেতাম না। তুমি আমার পরম শত্রুকে বিনাশ করেছ......তুমি আমার বন্ধু, এর জন্য আমি তোমার কাছে চিরঋণী।"

শিষ্যের এই অন্ধ অবস্থা দেখে রামানুজাচার্য্য বিচলিত হয়ে

উঠলেন। কৌশল কোরে একদিন কুরেশ স্বামীকে প্রশ্ন করলেন, "বৎস, গুরু যাতে আনন্দ পান, গুরুভক্ত শিষ্যের তাই করা উচিত নয় কি?"

উত্তরে কুরেশ স্বামী জবাব দিলেন, "অবশ্যই করা উচিত।"

"তবে, তুমি প্রভু বরদরাজের কাছে তোমার চোখ দুটি ফিরে পাবার জন্য প্রার্থনা কোরে আমায় আনন্দিত কর।"

গুরুর আদেশ কুরেশ স্বামী পালন করেছিলেন; এবং বরদরাজের বরে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

বিষ্ণুকাঞ্চীর দেখা শেষ কোরে ফিরতে রাত্রি হয়ে গেল। সেলুনে ফেরবার মুখে সহরের যতটুকু দেখা গেল তাতে দেখলাম, জেল, হাসপাতাল, বাজার, আদালত, দোকান-পসার প্রভৃতিতে কাঞ্চীপুর বেশ সমৃদ্ধ।

শুনলাম, এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। শতকরা তেরো জন তাঁতী আর পনেরো জন ব্রাহ্মণ।

জিজ্ঞাসা করলাম রাওকে, "এখানে কি কাপড় বোনা হয়?"

রাও জবাব দিলেন, "এখানকার এটাই সবচেয়ে পুরোণো ব্যবসা। কাঞ্চীপুরের সূক্ষ্ম বস্ত্র—জরীর কাজ-করা রেশমী রুমালের নাম ও আদর দুইই আছে।"

আজ থেকে এই সেলুনই একসঙ্গে আমাদের বাসা, সত্র ও ধর্ম্মশালা, এইখানেই স্নান, আহার, এইখানেই নিদ্রা। এরই বৈঠকখানাতে আগন্তুক ভদ্রলোকেদের আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা।

সেলুনে ফিরে একটু বিশ্রামের পর রোজনামচা লিখতে বসলাম, হঠাৎ সেলুনটি নড়ে উঠে চলতে আরম্ভ করল। বুঝলাম, পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত গাড়ীখানি ট্রেণের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, ট্রেণ চলেছে চিংলিপুট জংসনের দিকে।

গাড়ী চলেছে। দু'ধারের অন্ধকারকে ভেদ কোরে বেশীদূর দৃষ্টি চলে না। তবু বুঝতে পারি, ওই আঁধারের পৃষ্ঠপটে আছে পাহাড়ের সারি—দুর্দ্দাম দৈত্যের মত আকাশে মাথা তুলে আছে। চারিদিকে পাহাড় দেখে দেখে চোখ এখন পোষ মেনে গেছে। সামনে তাকালেই চোখে ভেসে ওঠে পাহাড়ের মালা।

চিংলিপুট জংসন এলো রাত্রি দশটা নাগাদ। আমাদের সেলুনখানিকে ছেড়ে দিয়ে ট্রেণ চলে গেল গন্তব্যস্থানে।

সুব্বাবাও এলেন।

"মিঃ চৌধুরী······একটা কথা ছিল।"

রোজনামচা লিখছিলাম ; কলম থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "বলুন ?"

"কাল সকালেই পক্ষী-তীর্থ ও মহাবলিপুরম্ দেখতে যাবেন তো ?" বললাম, 'হাঁ।'

"তা হলে, আজ রাত্রেই একখানা বাস বন্দোবস্ত কোরে রাখা দরকার।"

বললাম, "চলুন। একবার স্টেশনের বাইরেটাও ঐ সঙ্গে দেখে আসা যাবে।"

দু'জনে স্টেশনের বাইরে এলাম।

# পক্ষী-তীর্থ ও মহাবলিপুরম্

সকালে ঘুম ভেঙেই দেখি, পক্ষী-তীর্থে নিয়ে যাবার জন্যে বাসের মালিক এসে হাজির। এরই সঙ্গে কাল রাত্রে রাও আর আমি কথাবার্ত্তা স্থির কোরে এসেছিলাম।

শুনলাম, মহাবলিপুরমে যেতে হলে বাসের যে স্থানীয় লাইসেন্সের দরকার, তা এর নেই। ওখানকার 'এস, ডি, ও,কে (S. D. O.) চিঠি লিখে অনুমতি চেয়ে পাঠিয়ে স্টেশনের বিশ্রামাগারে স্নানাদি শেষ কোরে নিলাম।

খানিক পরে 'এস, ডি, ও'র অনুমতি-পত্র এসে পৌঁছল এবং আমরা বাসে উঠে পক্ষী-তীর্থ ( বা পক্ষতীর্থ ) রওনা হলাম।

পক্ষী-তীর্থটি পাহাড়ের ওপর। তার নিচে অর্থাৎ পাহাড়তলিতে আমাদের বাস পৌঁছুতে সময় লাগল প্রায় মিনিট কুড়ি।

পাহাড়ের নিচে একটি মাঝারি রকমের সহর আছে—নাম ত্রিকুলকুণ্ড্রম। সহর হিসাবে ইহার খ্যাতি না থাকলেও তীর্থযাত্রী-দের কাছে ইহার সম্মান আছে; কারণ, এখানেও কতকগুলি মন্দির কুণ্ড ( তীর্থ ), সত্র ইত্যাদি আছে। পাহাড়ের উপরের শিবমন্দিরের কর্ম্মচারীরা এই সহরে বাস করেন ও তাঁদের আফিস এই খানেই। পর্ব্বতের উপর থেকে সহরটি দেখা গিয়েছিল; মনে করেছিলাম মহাবলিপুরম্ হতে ফেরবার পথে ত্রিকুলকুণ্ড্রমের দেবস্থানগুলি দেখে যাব, কিন্তু সময়াভাবে হয়ে ওঠেনি।

পাহাড়ে ওঠবার জন্যে পাঁচটি বেশ বড় বড় ডুলি বন্দোবস্ত

করা হল। এখানকার পাহাড়ের সিঁড়িগুলি খুব উঁচু……সাধারণের পক্ষে ওঠা একটু আয়াসসাধ্য। তবে সাশ্রয়ের মধ্যে এই, সিঁড়ি মাত্র ৫৩৭টি।

মন্দিরের সন্নিকটে পেঁছুতে সময় লাগল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

এখানে মন্দিরের বিগ্রহ শিবলিঙ্গ। এ দেশে এঁর নাম বেদ-গিরীশ্বর। পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলাম।

মন্দির স্থানটি অন্যান্য জায়গার চেয়ে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। দূরে দেখা যায়, ঘন-নীল সাগরের ঢেউগুলি ফেনার মুকুট পরে অনবরত সমুদ্রের কূলে আছড়ে পড়ছে। পাহাড়ের ওপর থেকে হরিদ্রাভ বর্ণের বেলাভূমি মনোরম……অপূর্ব্ব। আর একদিকে চাইলে নজরে পড়ে বড় বড় গাছ……তাল-নারিকেল প্রভৃতি। সুদীর্ঘ তাল-ন্যারিকেলের সারিগুলিকে বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়। মনে হয়, সমতলভূমি থেকে আমরা এরই সমুন্নত শীষের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যাই। কিন্তু পাহাড়ের ওপর থেকে ওগুলি দেখায় চারা গাছের মত……যেন পটে আঁকা ছবি

চারিদিকে প্রকৃতির অপার করুণা। মাথার ওপর দাক্ষিণাত্যের মেঘ-নির্ম্মুক্ত………নির্ম্মল আকাশ—সামনে দেবাদিদেবের মন্দির। আত্মানুভূতির এই চমৎকার আবহাওয়ার মাঝে দাঁড়িয়ে মন অননুভূত আনন্দে ভরে ওঠে……ব্যাকুল হয়। মনে হয়, এই সান্নিধ্য, এই ব্যাকুলতা, এই অনুভূতি……এর মাঝেই তো মানুষের জীবনের সার্থকতা! এইই সব……পুণ্য সঞ্চয়……
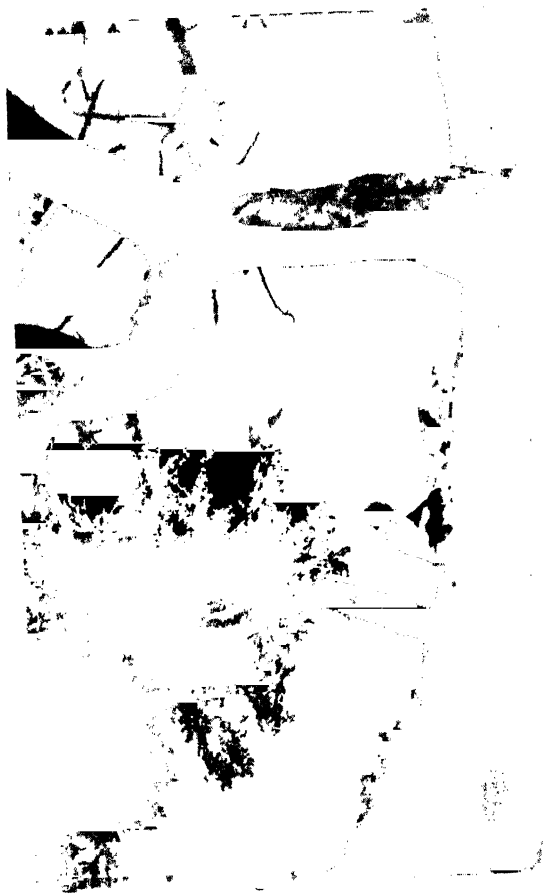
পক্ষতীর্থ বা পক্ষাতীর্থ—পৃঃ ১০৩

আত্মতৃপ্তি......আপনাকে খুঁজে পাওয়া, সবই এর মাঝে। এরই ভূমিকা দিয়ে মুক্তির মন্ত্র উচ্চারিত হয়।

রাও এসে বললেন, "চলুন, মন্দিরে যাই।"

মন্দিরের দিকে কয়েক পা মাত্র অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় সংবাদ এলো, পক্ষী-তীর্থে পক্ষী আসবাব সময় উপস্থিত।

বেদ-গিরীশ্বর দর্শন স্থগিত রেখে মন্দির হতে চললাম তাড়াতাড়ি পক্ষী-তীর্থ দেখতে। শুনেছিলাম, দুটি ঋষি নাকি দেবতার অভিশাপে পক্ষী-যোনি প্রাপ্ত হয়েছেন।

গিয়ে দেখলাম, কিছুদূরে অপর একটি পাহাড়ের ওপর কতকগুলি বড় বড় পাখী এদিক-ওদিক উড়ছে। পরে তাহার মধ্যে তিনটি পাখী পক্ষী-তীর্থ পাহাড়েব উপব উড়ে এসে বসলো। কিছুক্ষণ পবে পাখীর যিনি সেবক বা পুরোহিত, তিনি আহার্য্য দ্রব্য নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর গলায় যজ্ঞোপবীত দেখলাম না। কাজেই মনে হয়, তিনি ব্রাহ্মণেতর কোন জাত।

সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করার পর পক্ষী-সেবক চিনি-গোলা জল দিলেন। তখন দেখলাম, পূর্ব্বোক্ত তিনটি পাখীব মধ্যে দুটি সেবকটির সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। তারপর পাখীদের খিচুড়ী-ভোগ দেওয়া হল। দুটি পাখী এগিয়ে এসে খিচুড়ী-ভোগ খেলে এবং একটি পাখী দূবে বসে রইল......কোন কিছু আহারও করলে না। শুনলাম, এই শাপভ্রষ্ট পক্ষী দুটির বাস রামেশ্বরে, আহার এইখানে এবং আহারের পর বিশ্রামের স্থান নাকি কাশীধামে।

নিকটের পাণ্ডাদের কাছে এই পাখী দুটির সম্বন্ধে নানান

কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম। অনেক জেরায় তাদের কাছ থেকে জানা গেল যে, শাপভ্রষ্ট ঋষির গল্পটি হয় ত সত্যি, এক সময়ে পাখীও হয় ত আসত; কিন্তু এখন যে পাখী দুটি আসে, ও দুটি কাছের পাহাড়েই থাকে এবং আশ-পাশের পাহাড়ে বিস্তর ঐ রকমের পাখী দেখা যায়। একই সময়ে ঠিক আসার কারণ, আহারের লোভ ও আফিমের নেশা।

মনে মনে ভাবলাম, দেবস্থানে অর্থোপার্জ্জনের জন্য কতো ছল-চাতুরাই না মানুষ করে! এখন মনে হতে লাগল যে, চিনি-গোলা জলে আফিম মেশান। আফিমখোরেরা যখন মিষ্টি ভালবাসে, তখন পাখী আফিমখোর যে মিষ্টিতে প্রলুব্ধ হবে, এ আর আশ্চর্য্য কি! পরে পাহাড় থেকে নামবার সময়ও ঐ রকমের শকুন ধরণের দু-একটি পাখী নজরেও পড়েছে।

তা ছাড়া, আরো একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম যে, স্থানীয় লোকেরা কেউই শাপভ্রষ্ট ঋষির কাহিনীকে তেমন বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস না করার কারণ, তারা চোখের সামনে এই সব ছল-চাতুরী দেখছে বলে।

গাইডরা যাত্রীদের ওই সব কাহিনী মুখস্তর মত বলে যায়। তাদের নিজেদেরও এতে মোটেই বিশ্বাস নেই। Endowment Committee-র একজন সভ্য শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি শাস্ত্রীও বললেন, "কাছের জঙ্গলে ও পাহাড়ে ওই ধরণের অনেক পাখী দেখা যায়। ওই দুটি পাখীকে নানাপ্রকারে পোষ-মানানো হয়েছে বলে একই সময়ে আসে, আহার ও পানীয়ের লোভে।"

এই পক্ষীর বিষয় অনেকে অনেক রকম কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, তবে যাঁরা সচক্ষে দেখেছেন, তাঁরা পাখীদের সাদা-শকুনের মত বলে বর্ণনা করেছেন। আমাদের মনে হয়, এগুলি প্রকৃতই সাদা শকুন।

এ বিষয় স্বর্গীয় রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয় তাঁর "দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ"এ লিখেছেন, "পাখী দুটি শ্বেতকায় শকুনি ; বাচ্চা নয়, বয়স বেশী হয়েছে—সাধারণ শকুনি হতে আকারে বড।"

কিন্তু অধ্যাপক শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাস মহাশয় পাখী দুটিকে "রাজহংসের ন্যায়" বলেছেন। বোধ হয়, শ্রদ্ধেয় সারদাবাবু নিজে দেখেন নি, লোকমুখে শুনে ও কল্পনা সাহায্যে লিখেছেন।

স্বর্গত জলধর বাবু লিখেছেন, "১১টার পর একজন পুরোহিত মন্দিরের পূজা শেষ কোরে পক্ষীর জন্য খাদ্য নিয়ে আসেন।...... পুরোহিত দাঁড়িয়ে......চারিদিকে মুখ কোরে যোড়হস্তে পক্ষীকে আহ্বান কোরে পিঁড়ির উপর উপবেশন করলেন এবং জপ করলেন।" এই সব প্রক্রিয়া আমরাও দেখেছি, কিন্তু পক্ষীর পুরোহিত যে মন্দিরের পুরোহিত নন, তা নিশ্চয় কোরে বলতে পারি। কারণ, পক্ষী আগমন সংবাদ যখন পাওয়া গেল, তখন আমরা বেদ-গিরীশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণেই ছিলাম। পক্ষীর পুরোহিত বা সেবকের গলায় যে যজ্ঞোপবীত নেই, সে কথা আগেই বলেছি। ঐখানকার একজন বাসিন্দাকে জিজ্ঞেস কোরে জানলাম যে, পুরোহিত জাতিতে "পাশী" ; অর্থাৎ আমাদের দেশে যারা তাড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করে ও শূকর, মুরগী পালন করে। মন্দিরের পুরোহিত আলাদা লোক, তার

সঙ্গে এঁর কোনই সম্বন্ধ নেই ; এবং যখন পক্ষীদেব অর্চ্চনা হচ্ছিল তখন বেদ-গিরীশ্বরের পুরোহিত মন্দিরের মধ্যেই ছিলেন।

যাই হোক, পাণ্ডাদিগকে জেরা কোরে এবং শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি শাস্ত্রীর কাছ হতে শুনে আমি যতদূর সংগ্রহ করেছি, তাই সাধারণে প্রকাশ করলাম।

ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এটি পাণ্ডাদের নিছক কৌশল। আমার এই অকিঞ্চিৎকর তীর্থ-পর্য্যটন কাহিনী পড়ে অনেকে হয় ত মনে করবেন, আমি বিশ্বাসহীন। আমি তাতে কুণ্ঠিত হব না ; কারণ, যা মিথ্যা, তার ওপর কোনকালেই আমার আস্থা নেই। আমি শুধু বলতে চাই যে, ছল ও কৌশলটুকু বাদ দিলে ভক্তির মাত্রা মোটেই কমবে না। আমার বক্তব্য—লোকে স্বচক্ষে দেখে ভুলের ওপর ভিত্তি স্থাপনা না কোরে হুজুগের সৃষ্টি না করুক দেবস্থান বা দেবতার কাহিনীর ওপর বিশ্বাস কোরে মানুষের যে ভক্তি, যে বিশ্বাস যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, সে ভক্তি আগেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকবে।

পক্ষীর ভোগের জন্য দক্ষিণা দিয়েছিলাম আড়াই টাকা। এই সব কাণ্ড শুনে এবং দেখে মনে হল, অর্থের অপব্যয় করেছি।

পক্ষী-তীর্থের এই ছল-চাতুরীতে মনে একটা গ্লানি জমেছিল, সেটুকু দূর হল বেদ-গিরীশ্বরের মূর্ত্তি দর্শন কোরে।

বেদগিরীশ্বরের মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে দূরে পঞ্চতীর্থ দেখলাম। এখানে মহাদেব ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তি দর্শন কোরে আবার ডুলি কোরে নীচে ফিরে এলাম।
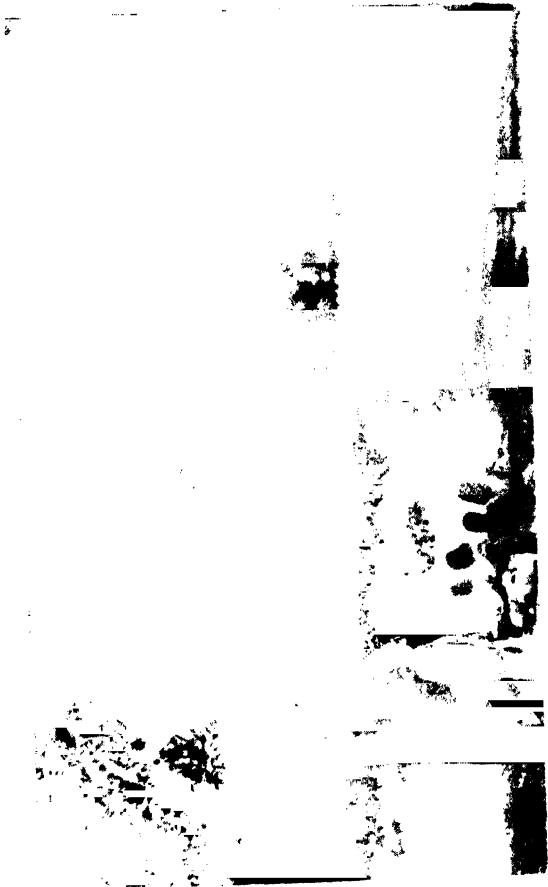
মহাবলীপুরমের পথে—পৃঃ ১০৭

ঘড়ি খুলে দেখি বেলা সাড়ে বারটা বেজেছে। সকলে বাসে উঠলাম ও কিছু দূর গিয়ে কাছেই একটি পুষ্করিণীর ধারে বাস থামিয়ে পাড়ে বসে আহারাদি সেরে আবার বাসের আশ্রয় নিলাম। বাস চল্‌ল—মহাবলিপুরমের দিকে। বেলা আড়াইটে নাগাদ বাকিংহাম খালের ধারে আমাদের নামতে হল।

এই খালটি পার হলেই মহাবলিপুরম্‌। শুনলাম, এই খাল মান্দ্রাজ থেকে এখান অবধি এসেছে। নৌকায় কোরে অনেক জিনিষ মান্দ্রাজ থেকে মহাবলিপুরম্‌ অঞ্চলে চালান আসে এবং এখান থেকেও ও-অঞ্চলে যায়।

মহাবলিপুরম্‌ মান্দ্রাজ প্রদেশের চেঙ্গলপুত জেলার একটি সুপ্রাচীন গ্রাম। চেঙ্গলপুৎ অর্থাৎ চিংলিপুট সহর থেকে ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং মান্দ্রাজ থেকে ত্রিশ বত্রিশ মাইল দক্ষিণে।

পুরাণে আছে, এই খানে বলিরাজার পুরী ছিল। বলিরাজার সম্বন্ধে পুরাণের গল্পটি এই ঃ—বলিরাজা খুব দানশীল ছিলেন। দাতা যিনি, তিনি পুণ্যবান, এবিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে কোন পুণ্যকাজ বা মহৎকাজের মধ্যে যখন অহংকার প্রবেশ করে, তখন তার পতন অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যে আমাদের হিন্দুশাস্ত্র "সোঽহং"-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত—এর মধ্যে অহং-এর স্থান নেই। হিন্দুশাস্ত্র আগাগোড়া শেখায় যে, তিনিই সব, আমি কেউ নই— শুধু নিমিত্ত মাত্র।

বলি রাজার এই অহং জ্ঞান যখন প্রবল হয়ে উঠল, তখন ভগবান অন্তরালে বসে হাসলেন এবং মনে মনে ঠিক করলেন, বলির এই অহংকার চূর্ণ করতে হবে। এই বলিরাজার জন্যেই

ভগবান বামনাবতার হয়েছিলেন। একদিন ভগবান বামনের ছদ্মবেশে বলিকে ছলনা করবার জন্য উপস্থিত হলেন। বলির অহংকার তখন গগনস্পর্শী। তিনি বামনকে অভিলাষ জানাবার জন্যে আদেশ করলেন। মুখের হাসি মনে গোপন কোরে সবিনয়ে বামনরূপী ভগবান বললেন, "মহারাজ প্রবল পরাক্রান্ত দানশীল এবং সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, আমার ভিক্ষা ত্রিপাদ মাত্র ভূমি"।

এত সামান্য ভিক্ষা! বলিরাজা সদম্ভে তখনি দান করবেন বলে ঠিক করলেন। দান করার প্রতিশ্রুতিস্বরূপ স্বর্ণভৃঙ্গার হতে বামনদেবের প্রসারিত করদ্বয়ে জলার্পণ করলেন। এইবার বিপত্তি উপস্থিত হল—বিমূঢ় রাজা দেখলেন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য এই দুই ভুবন ভরে গেছে বামনের দুটি পায়ে, তৃতীয় পা রাখবার আর ঠাঁই নেই। কিন্তু সত্যাশ্রয়ী বলি কথা দিয়েছেন। কাজেই, নিজের মাথা পেতে আর একটি পা রাখবার স্থান দিলেন। ভগবান চেয়েছিলেন ভূমি, বলি তা দিতে পারলেন না, কাজেই তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল—অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে গেল এবং ভগবানের পায়ের ভারে পাতাল প্রবেশ হল তাঁর। তবু বলিরাজা ভাগ্যবান। কারণ, তাঁর অহংকারের এমন একটা মর্যাদা ছিল যে, স্বয়ং ভগবান সে অহংকার চূর্ণ করবার জন্যে বামনরূপ ধরেছিলেন। একি কম সুকৃতির কথা! কতো পুণ্য করেছিল বলিরাজা, তাই "শ্রীপদের" শ্রীপদ তাঁর মাথার ওপর পড়েছিল।

ভগবানের এই লীলাকাহিনীকে কেন্দ্র কোরে মহাবলিপুরমে বলিরাজা ও বামনরূপী ভগবানের মূর্ত্তি আছে। পর্ব্বতগাত্রে খোদাই

করা মূর্ত্তির ভঙ্গি হচ্ছে—বলিরাজার মাথায় পা দিয়ে বামন দাঁড়িয়ে আছেন। এই খোদাই করা মূর্ত্তিগুলি একটি দেখবার বস্তু। দেবস্থান, ভক্তি, সংস্কার এ সবের প্রশ্ন বাদ দিলেও শিল্প ও কারুকার্য্যের তুলনায় এগুলি অপূর্ব্ব। বিজ্ঞানে শিল্পে, কারুকার্য্যে ভাস্কর্য্যে ভারত যে একদিন অগ্রণী ছিল, ভারতের কৃষ্টি, ভারতের সাধনা, ভারতের সংস্কৃতি যে একদিন সমস্ত জগতকে অবাক কোরে দিয়েছিল, এগুলি তারই অমর নিদর্শন। স্থাপত্যশিল্প—যাতে পাশ্চাত্য জগত নিজেকে গরিমান্বিত মনে করে, এর প্রেরণা, এর শিক্ষা তারা এই ভারতের কাছ থেকেই একদিন পেয়েছে। ভারতের এই সব নির্ম্মাণকুশলতার মূলেই আধুনিক বিজ্ঞানের বীজ লুকিয়ে ছিল। দিল্লীর কুতবের নিকটস্থ ধাতবস্তম্ভের নির্ম্মাণ-কৌশল দেখে ফারগুসন সাহেব তার পুস্তকে এই রকম মন্তব্য করেছেন :—

"Taking 400 A. D. as a mean date—and certainly it is not far from the truth—it opens our eye to an unsuspected state of affairs to find the Hindus at that age capable of forging a bar of iron larger than any that have been forged even in Europe up to a very late date, not frequently even now."

খৃষ্টের মৃত্যুর এক হাজার বছর পর কিম্বা ওরই কাছাকাছি সময়ে শিল্পকৌশল, কারুকার্য্য ও স্থাপত্য প্রতিভা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে ফারগুসন সাহেব যদি উপরোক্ত মন্তব্য করে থাকেন তো তাহলে

ভাবুন, মহাবলিপুরমের ভাস্কর্য্য ও কারুকার্য্য কতো পুরাতন। এ থেকে এই প্রমাণ হয় না কি যে, ভারতের কাছে সবাই প্রায় এ বিষয়ে ঋণী ?

ষোড়শ শতাব্দী থেকে ভারতে এর উৎকম সাধন বন্ধ হয়ে ধীরে ধীরে স্তিমিত ও নির্ব্বাপিত হয়।

মহাবলিপুরম্—একটি প্রকাণ্ড পাথরে খোদাই করা মণ্ডপ।

মহাবলীপুরম্ পাহাড়ের গায়ে অর্জ্জুনের তপস্যা, গোদোহন, বরাহ অবতার, বামনভিক্ষা প্রভৃতির ছবি খোদাই করা। গো-দোহন চিত্রের পাশে একটি বিরাট পাথর শোয়ান আছে। রাও বললেন, "এটিকে পাণ্ডারা মাখমের তাল বলে অভিহিত করে।"

দুটি বড় বড় পাথর, অনেকটা ত্রিভুজের মত আকৃতি হয়ে পড়ে আছে। পাথরের মাথা দুটি একে অপরকে স্পর্শ কোরে আছে এবং নীচের দিকে খানিকটা ফাঁক। শুনলাম, এটিকে লোকে ভীমের উনুন বলে প্রচার করে।

ভাবলাম, বৃকোদরের আহারের যে নমুনা মহাভারতে আছে, তাতে এইরকম পাহাড়ে-উননই তার প্রয়োজন। রন্ধননিপুণা দ্রৌপদী বোধ হয় সে যুগে এই উনুনে অগ্নিসংযোগ কোরে পঞ্চ-পাণ্ডবের জন্য ভুরি ভোজনের আয়োজন করতেন। তখনকার যুগে পাণ্ডবরা ছিলেন একান্নবর্ত্তী পরিবার।

মহাবলিপুরমের এই সব অতীত-কীর্ত্তির নিদর্শনসমূহের মাঝে দাঁড়িয়ে কি আনন্দ যে হল, তা আর বলে শেষ করা যায় না। মনে হল, আবার যেন আমরা পৌরাণিক যুগে ফিরে গেছি। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব সেই পাঁচ ভাই, পাণ্ডুপুত্র যেন এইখানে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। সবার পুরোভাগে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তাঁর এক অক্ষৌহিনী নারায়ণী সেনা দিয়ে-ছিলেন কুরুপক্ষকে সাহায্য করতে, আর নিজে এসেছিলেন পাণ্ডবের দিকে; সেই শ্রীকৃষ্ণ—যিনি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনের জন্য কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জ্জুনকে ভর্ৎসনা কোরে বলেছিলেন—

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!

যিনি দয়ার্দ্রচিত্তে মূঢ়, ভীত, অর্জ্জুনকে পিতামহ বধের পাপ হতে মুক্তি দেবার জন্য নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেছিলেন--

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

মনে হল, আলুলায়িত কেশা যাজ্ঞসেনীর কথা, যিনি মহাবীর

ভীমসেনের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "যতদিন কৌরবের না হয় নিধন, ততদিন না করিব এ বেণী বন্ধন।"

মনে মনে বললাম—নারায়ণ তুমিই সব। পৃথিবীর আর সবই মিথ্যা, সবই ভ্রান্ত।

সমুদ্রের উপকূলে শ্রীকৃষ্ণরথ, অর্জ্জুনরথ, ভীমরথ, দ্রৌপদীরথ ও ধর্ম্মরাজ রথ—পাথরের তৈরী পাঁচটি রথ এখনও বর্ত্তমান। এই

সপ্তমন্দির ( The Seven Pagodas)—মহাবলিপুরম্

পাঁচটি রথ আর শিব ও বিষ্ণুর মন্দির……এই সর্ব্বসমেত সাতটি ছিল বলে ইউরোপীয় পরিব্রাজকেরা এর নাম দিয়েছিলেন, The Seven Pagodas। শিব ও বিষ্ণুর মন্দির দুটি এখন নেই, সমুদ্র এ দুটিকে উদরস্ত কোরেছেন।

উপরোক্ত রথগুলির চারটি রথ একত্রে, কেবল অর্জ্জুনের রথটি পৃথক্। এই চারটি রথ দেখলে মনে হয়, এক একখানি পাহাড়

কেটে-ছেঁটে এই রথগুলি তৈরী হয়েছে। চারখানি রথ চার প্রকারের এবং নির্ম্মাণ-কৌশল, ভঙ্গি, সবই পৃথক। এখানকার মণ্ডপের মধ্যে কৃষ্ণ মণ্ডপটি সবচেয়ে সুন্দর।

স্তম্ভগাত্রে, দেওয়ালে যে সমস্ত কাহিনী-সম্বলিত চিত্র খোদিত আছে, সেগুলি সত্যিই অপূর্ব্ব। এমন জীবন্ত ও প্রাণস্পর্শী যে, সমস্ত বুদ্ধি বিস্মিত ও রসনা নির্ব্বাক হয়ে যায়। মনে হয়, বহুযুগ আগেকার সত্য আজ যেন সমক্ষে দাঁড়িয়ে বলছে—আমি আজও জীবন্ত আজও বর্ত্তমান।

দেওয়ালে একটি বৃষমূর্ত্তি এতদূর আশ্চর্য্যকর যে, আমরা জীবন্ত বলে ভুল করেছিলাম প্রথমে।

নাটমন্দিরের একটু দূরে পথের ধারে একটি অর্দ্ধশায়িত পাথরের ধ্যানস্থ মূর্ত্তি আছে। লম্বায় এ মূর্ত্তিটি দেড়শত ফুটেরও বেশী হবে। ভারতবর্ষের আর কোথাও এতো বড় পাথরের মূর্ত্তি নেই, পৃথিবীর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

সাধারণে একে বলিরাজার মূর্ত্তি বলে অভিহিত করে।

এর পরে যুধিষ্ঠিরের রাজসভা, মণ্ডপ এবং পঞ্চ-পাণ্ডবের বাসস্থান দেখে আমরা বরাহস্বামী ও দুর্গা দেবীর মন্দির দেখতে গেলাম।

গোবিন্দদাসের কড়চায় আছে, শ্রীচৈতন্যদেব এখানকার শ্বেত-বরাহ মূর্ত্তিকে নমস্কার করেছিলেন। সব দেখা শেষ কোরে খাল পার হোয়ে সেলুনে ফিরতে রাত হয়ে গেল।

শুনেছিলাম, দাক্ষিণাত্যের মন্দিরাদির মধ্যে মহাবলিপুরমের

একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এ ধরণের দ্রাবিড়ী স্থাপত্য নাকি আর কোথাও দেখা যায় না। এর সুখ্যাতিতে সহস্রমুখ হয়ে বহু মনীষী প্রশংসা করেছেন।

আজ দেখলাম, সত্যি, এ অতুলনীয়। তুলনা দেবার কোন উপায় নেই। নিজের চোখে দেখে, নিজের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত এর কীর্ত্তির, প্রতিভার ও বৈশিষ্ট্যের ধারা কিছুতেই সম্যক উপলব্ধি হবে না।

দেখবার পর, আজ এই কথা লিখতে লিখতে স্যার সি, ভি, রমণের উক্তি পাঠকবর্গকে উপহার দিতে ইচ্ছে করছে ঃ—

"Sitting on its gate-stone and gazing out on the never-ending turmoil of waters, one may fitly ruminate on India's great past and her present state. Dotting the country around and defying the ravages of time stand the magnificent monolythic temples and inimitable rock carvings of Mahabalipuram. The dullest mind cannot fail to be stirred by the sight of such ancient architectural and artistic remains.'

সেলুনে ফেরবার ঘণ্টাখানেক পরেই ট্রেণ এসে আমাদের সেলুনখানিকে নিয়ে চলল। বুঝলাম, আমাদের উপদেশমত রেলকোম্পানী আমাদের সেলুনটিকে চিদম্বরমে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত কোরেছেন।

# চিদম্বরম্

সকালে ঘুম ভেঙে দেখলাম, আমাদের সেলুন চিদম্বরম্ স্টেশনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হিসেব মত দেখা যায়, রাত্রি আড়াইটে নাগাদ চিদম্বরমে ট্রেণখানি এসেছিল।

চিদম্বরম্ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ভেতর দক্ষিণ আর্কট জেলার মধ্যে। জায়গাটি নেহাৎ ছোট নয়। চিদম্বরম্ তালুকের পরিমাণ চারশো বর্গ মাইল। খুব চাষ-আবাদ হয় এই চিদম্বরমে। এখানকার প্রায় বারো আনা ভাগ জায়গাই আবাদের কাজে ব্যবহার হয়। সমুদ্রতীর থেকে মাত্র সাত মাইল দূরত্ব বলেই এখানকার জমি বোধ হয় এতো উর্ব্বরা। এখানকার চাষের মধ্যে কাপাস আর রেশমের চাষই বেশী। ঘুম থেকে উঠেই শুনলাম, আন্না-মালাইয়ের কুমার বাহাদুর দেব-দর্শনের জন্য দুখানি মোটর পাঠিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন কোরে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। যথাসময়ে রাজার মোটর এলো, বেলা নটা নাগাদ দেবালয়াদি দেখতে বেরুলাম।

স্টেশন থেকে মাইল দেড়েক দূরে চিদম্বরম্ দেবালয়। পৌঁছুতে বিশেষ সময় লাগল না।

শুনেছিলাম চিদম্বরমের প্রসিদ্ধি, এসে দেখলাম বিস্তৃতিতেও মন্দিরটি কম নয়। প্রায় একশ পঁচিশ ত্রিশ বিঘে জুড়ে প্রাচীর-ঘেরা দেবালয়।

আগেই বলেছি, এখানকার সমস্ত মন্দিরের চার পাশেই দ্বার বা গোপুর আছে। এখানেও তাই। গোপুরগুলি খুবই উঁচু এবং বহু কারুকার্য্য সমন্বিত। প্রায় স্টেশনের কাছ থেকেই এই গগনস্পর্শী গোপুর নজরে পড়ে। গোপুরের কারুকার্য্য এমন চমৎকার যে, মনে হয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এইগুলিই অনেকক্ষণ দেখি।

গোপুর পার হয়ে আমরা মন্দির-প্রাঙ্গণে ঢুকলাম। এখানে একই প্রাঙ্গণে শিব ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি। কাঞ্চীপুরমের শিব ও বিষ্ণুর বিগ্রহ দুটি প্রসিদ্ধ এবং কুম্ভকোনামেও শিব ও বিষ্ণুর মন্দির আছে, কিন্তু এই দুইস্থানে দুই দেবতার মন্দির স্বতন্ত্র ; একই মন্দির-প্রাঙ্গণে ঈশ্বরের দুই রূপ বোধ হয় আর কোনও স্থানে পূর্ব্বে দেখি নাই, পরেও কোনও জায়গায় দেখলাম না। তবে কুম্ভকোনামে চক্রপাণির বিষ্ণুমূর্ত্তি অষ্টভুজ ও ত্রিনেত্র—পরে সেখানে শুনেছিলাম যে, এই মূর্ত্তি শিব ও বিষ্ণুর মিলিত মূর্ত্তি।

এই শিব-বিষ্ণু সমন্বয় দেখে মনে হল, ভগবান বোধ হয় মানুষকে জানাতে চান যে, শিব ও বিষ্ণু একই। বোধ হয় বোঝাতে চান যে, তিনি অভেদ। মানুষ আপনার ইচ্ছায়, আপনার রুচিতে তাঁকে যেমন কোরে যে ভাবে সাজায়, তিনি তেমনি কোরেই সাজেন। ভক্ত তাঁকে যে ভাবে ডাকে, তিনি সেই রূপেই দেখা দেন। গীতায় ভগবান তাই বলেছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

বাঞ্ছাকল্পতরু তাঁর নাম। ভক্তিভাবে মানুষ তাঁকে যে ভাবে বাঞ্ছা করবে, বাঞ্ছিতের কাছে সেইভাবে তিনি উপস্থিত হবেন।

মূল কথা হল ভক্তি, আসল কথা হল আগ্রহ। ভগবানকে পাবার মুখবন্ধে আছে ইচ্ছা আর আগ্রহ, অনুষ্ঠানে আছে নিষ্ঠা ও ভক্তি, পরিশিষ্টে আছে জ্ঞান ও আনন্দ। এর পরে যা, ভাষায় তা ব্যক্ত করা যায় না—আদি আর অন্ত দুইই একাকার হয়ে যায়।

তাই, বিভিন্ন মতাবলম্বী পরস্পর হিংসাবৃত্তি সম্পন্ন শৈব ও বৈষ্ণবদের এই মহাসমন্বয় তীর্থ চিদম্বরম্ দেখতে বলি।

একটু আলোচনা ও বিচার কোরে দেখলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না, সাম্প্রদায়িক কলহের অবসান হয়। মহাবিষ্ণু ও শিবের একতা আমরা ভাগবত-পুরাণ আলোচনা করলে বুঝতে পারি। বিরাট কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা কোরে ব্যাসদেব বলেছেন—

স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ।
বাসশ্ছন্দোময়ং পীতং ব্রহ্মসূত্রং ত্রিবিৎস্বরম্॥ ভাঃ ১২।১১

তাঁর বনমালা নাম্নী একটি মালা আছে, সেটি হচ্ছে তাঁর নিজের ত্রিগুণা **মায়া**। তিনি সেই মালা গলদেশে ধারণ করেন, অর্থাৎ স্বকীয়া মায়ার স্বরূপ যে বনমালা, তাহার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে আছেন। ইহাই শিবের গলের অহি বা মায়া-সর্প। ঋগ্বেদ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে দেখতে পাই—

"সতো বন্ধুমসতি"

ইহাই অসতের দ্বারা সতের বন্ধন বা মায়ার দ্বারা নিত্যবস্তুর পরিবেষ্টন—যাহা কালে শিব-গলে সর্প ও বিষ্ণুর গলে বনমালারূপে দোলায়িত। শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র (১১।৫।২০)—

শুক্লচতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষাং বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলু॥

দেখতে পাই যে, আদি বিষ্ণু শ্বেতবর্ণ, চতুর্ব্বাহু জটিল (জটাধারী হয়ে), বল্কল বসন, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড, ও কমণ্ডলু ধারণ কোরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিশ্বের আদি-পুরুষ ও বিশ্বের বীজস্বরূপ তিনি। শৈবগণের উপাস্য শিবও শ্বেতবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, জটাজুটযুক্ত ও বিশ্বের আদিদেব বলে বর্ণিত হন। ভেদ কোথায়! তাই, একই ঈশ্বর সকল সম্প্রাদায়ের উপাস্য হলেও রজোগুণের মোহান্ধতা বশতঃ পৃথক বলে অভিহিত: এবং সেই রজোগুণের মাহাত্ম্যে ভেদভাব নিয়ে পরস্পর কলহ ও হিংসা কোরে থাকে। ধ্যানের একটি মন্ত্র উল্লেখ কোরে এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণ-পটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং নো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥

যাঁহাকে শৈবগণ শিব বোধে, বৈদান্তিকগণ ব্রহ্ম জ্ঞানে, বৌদ্ধগণ বুদ্ধ বলিয়া, প্রমাণপটু নৈয়ায়িকগণ কর্ত্তা ভাবিয়া, জৈনগণ অর্হৎ বলিয়া ও পূর্ব্বমীমাংসকগণ কর্ম্ম বলিয়া উপাসনা করেন, সেই ত্রৈলোক্যনাথ হরি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

চিদম্বরমে মহাদেবের ব্যোম মূর্ত্তি; অর্থাৎ তিনি নিরাকার। চিদম্বরম্ নামটি থেকেই কতকটা উপলব্ধি করা যাবে। চিৎ শব্দের অর্থ জ্ঞান, আর অম্বর শব্দের অর্থ আকাশ। চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান (চৈতন্য) যা, তা আকাশের মত অসীম। এই জ্ঞান, যাকে চৈতন্য বলে অভিহিত করা হয়, তার আদি নেই, অন্ত নেই, রূপ নেই, দেহ

নেই। সে শুধু অসীম নয়, নিরাকারও। মুঠোয় যে শুধু ধরা যায় না, তা নয়, স্পর্শবিরহিতও। তাই মানুষের এই চৈতন্যই সব জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। 'জ্ঞানাৎপরতরং নহি'—এই জ্ঞানই সব শেষ, এর পর আর নেই।

তবু এই নিরাকারকেও চিদম্বরমে বেঁধে রাখা হয়েছে। একটি সামান্য রত্নমালা দিয়ে স্থানটির সীমা নির্দ্দেশ করা আছে। এই নির্দ্দিষ্ট স্থানটিকে উদ্দেশ কোরে ভক্তমানব চিদম্বরমের পূজার্চ্চনা করেন।

চিদম্বরমকে এই রত্নমালার পরিধিতে বাঁধবার প্রচেষ্টা দেখে মনে হল, এ শুধু তাঁরই লীলা। যিনি অসীম তিনিই পারেন সসীমের মধ্যে ধরা দিতে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরতে পরতে যাঁর স্থিতি, যিনি সমগ্র বিশ্বভুবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, "অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি" যাঁর বিভূতি—তিনিই ইচ্ছে করলে অসীম বিস্তৃত নিজেকে সঙ্কুচিত, সংবদ্ধ কোরে সসীমের মাঝে, এতোটুকুর মাঝে, বিন্দুর পরিধিতে, অণু-পরমাণুর মাঝে ধরা দিতে পারেন। শুধু জানা চাই তাঁকে খুঁজে বার করবার কৌশল,......বাঁধবার অমোঘ মন্ত্র। শ্রুতিও সেই কথাই বলেছেন—

অণোরণীয়ান মহতোমহীয়ান্।
আত্মাস্যজন্তোর্নিহিতোগুহায়াম্॥......(কঠঃ উপঃ ৪৯।২০)

তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"অসীম তুমি সসীমের মাঝে বাজাও আপন সুর।"

এই আপন-সুর বাজাবার জন্যে, আপন মহিমা প্রচারের জন্যে, মানুষের মুক্তির জন্যে, চৈতন্যের স্বরূপ প্রকাশের জন্যে অসীম যিনি,

ভগবান যিনি, জগতের জ্ঞান ও গুণের আধার যিনি—তিনি সসীমের মাঝে বাঁধা, মূর্ত্তির মাঝে বিকশিত, দেবালয়ের মাঝে আবির্ভূত, বিগ্রহের মাঝে প্রকাশিত। এরই সুর ঝঙ্কারে, এরই লীলাকাহিনীতে, এরই গুণগরিমায়, এরই মাহাত্ম্যে আমরা বিমুগ্ধ, বিস্মিত, আত্মহারা। যুগে যুগে, কালে কালে, কোটি কোটি মানুষ, অগণিত জীব এরই টানে, এরই আকর্ষণে ছুটেছে এবং আজন্মকাল ধরে ছুটবেও।

এর আকর্ষণ দুর্ব্বার, উন্মাদনা দুর্নিবার।—এই ধারাস্রোতকে কেন্দ্র কোরে ধর্ম্মের, অস্তিত্বের, জীবনের রশ্মিরেখা যুগ হতে যুগান্তরে বিকীর্ণ, বিচ্ছুরিত, প্রতিফলিত হয়ে চলেছে।

এরই প্রেমে, এরই মহিমায় মহাপ্রভু গভীর রাত্রে সংসার ছেড়ে পাগলের মত বেরিয়ে এসেছিলেন, বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, শঙ্করাচার্য্য প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন।

* * * *

মনে পড়ল, গোবিন্দদাসের কড়চায় আছে, মহাপ্রভু বৃদ্ধ কোলে (মহাবলিপুরম্) শ্বেত বরাহ দর্শনান্তে পীতাম্বর শিব দর্শন করেন।

"পীতাম্বর শিব" বোধ হয় চিদম্বরমের আকাশ-লিঙ্গ। পুঁথির পাঠোদ্ধার কালে হয়ত চিদম্বরমের স্থানে সহজ কথা "পীতাম্বর" হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানে মন্দিরের সামনে একটি পর্দ্দা ঝোলান থাকে, এইটিকে সরিয়ে নিলে রত্নহার পরিশোভিত স্থানটি নজরে পড়ে এবং পুরোহিতরা এর ব্যাখ্যা করেন। চিদম্বরমে কনকসভা, নৃত্যসভা, দেবসভা প্রভৃতি অনেক বড় বড় সভামণ্ডপ দেখলাম। এ সব

সভামণ্ডপের এমন কোন স্থান নেই, যেখানে কারুকার্য্য, উৎকীর্ণ চিত্র প্রভৃতি না আছে।

রাও বললেন, "এখানকার স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস যে, এই কনকসভাটি রাজা শ্বেতবর্ণ তৈরী করিয়েছিলেন।"

এ বিশ্বাসের মূলে যে কাহিনীটি প্রচলিত, সেটিও শুনলাম। রাজা শ্বেতবর্ণ খুব শিবভক্ত ছিলেন। কোন এক সময় রাজার ধবলকুষ্ঠ রোগ হয়। অনন্তর শিব তাঁকে একদিন স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন "বৎস, হৈমপুষ্করিণীতে স্নান করলে তোমার এই ব্যাধি দূরীভূত হবে।"

শিবের আদেশমত রাজা শ্বেতবর্ণ চিদম্বরমের নিকটবর্ত্তী এই হৈম পুষ্করিণীতে স্নান করেন। স্নানের পর রাজার ধবলকুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হয় এবং তাঁর দেহ হেমবর্ণে রূপান্তরিত হয়। সেই থেকে শ্বেতবর্ণের নাম এই পুষ্করিণীর নামানুসারে হেমবর্ণ হয়।

চিদম্বরমের মন্দিরের পাশে, দ্বারের সামনে শিবের নটরাজমূর্ত্তি দেখা গেল।

মন্দিরের থামগুলি সব গ্রেনাইট পাথরের তৈরী। শোনা যায়, কোন রাজা নাকি সহস্রস্তম্ভের একটি মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাবেন বলে স্থির করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ কোরে যেতে পারেন নি। অসমাপ্ত অবস্থায় রাজার সেই মণ্ডপ আজো পড়ে আছে, এবং উত্তরকালে ভক্তদের ধর্ম্মসংস্থাপন ও মন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি মহৎ কাজের প্রেরণা যোগাচ্ছে।

শোনা যায়, চিদম্বরম্ মন্দিরের চূড়া প্রায় আড়াই হাজার

বেলপাতায় ঢাকা। দূর হতে সেই সব সোনার বিল্বপত্রে সূর্য্যকিরণ প্রতিভাত হয়ে দীপ্তি বিকীর্ণ হচ্ছে। নটরাজের বাঁ পাশের ঘরে দেবীমূর্ত্তি আছেন—নাম "শিবকাম-সুন্দরী"। আর একটি মন্দিরে শ্রীথিল্লাই গোবিন্দ রাজা অনন্ত-শয়নে—শায়িত, সস্মিত, প্রশান্ত মুখ। গোবিন্দরাজ স্বামীর মূর্ত্তির পাশেই লক্ষ্মীমূর্ত্তি। এ মূর্ত্তির নাম এ অঞ্চলে পুণ্ডরীকবল্লী। এখানে শিব-পার্ব্বতী ও বিষ্ণু-লক্ষ্মীর একসঙ্গে পূজা হয়। এই একসঙ্গে পূজারীতিরও মূলে আছে সেই অভেদত্ব।

চিদম্বরমের একটি ভোগমূর্ত্তি আছে, সেটি মণিময় বিগ্রহ। সমস্ত উৎসব, শোভাযাত্রা প্রভৃতিতে এই মূর্ত্তিটি ব্যবহৃত হয়।

ভগবানের এই ভোগমূর্ত্তি দর্শনের জন্য দর্শনী পাঁচ সিকা।

পূর্ব্বে যে আন্নামালাই রাজার উল্লেখ করেছি, তাঁর একটু পরিচয় এইখানে দিতে চাই। তিনি যে আমায় মোটরগাড়ী প্রভৃতি দিয়ে দেবদর্শনে সাহায্য করেছেন, সে জন্যে নয়। এঁর আরো পরিচয় আছে। রাজা হিসাবে জমিদারী তাঁর ত আছেই, এ ছাড়া ব্যবসাপ্রীতিও তাঁর কম নয়। শুনলাম, রেঙ্গুনে জঙ্গল পত্তনি নিয়েছেন। মালয় স্টেটে এঁরই উৎসাহে রবারের খুব বিস্তৃতভাবে চাষ হয়। কাছাকাছি স্থানে গোটাকতক কফির বাগানও আছে।

দেবদর্শনাদি সেরে আমরা কর্ম্মচারীদের সঙ্গে রাজার বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম। শুনলাম, এ বিশ্ববিদ্যালয়টি রাজার নিজের। তিনি নিজের খরচে এটি তৈরী করিয়ে দিয়েছেন এবং আজো প্রয়োজন মত এর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। এ থেকে

বোঝা যায়, রাজা শুধু অর্থে ধনবান নয়, ধনবান তিনি মনেও। তাঁর বিদ্যানুরাগ, শিক্ষাপ্রসারের ওপর কি যে প্রীতি, তা এই থেকে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মহাশয় আমাদের সম্বর্দ্ধনা করলেন। তারপর সমস্ত বিদ্যালযটি দেখাতে দেখাতে বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় গল্প করতে লাগলেন।
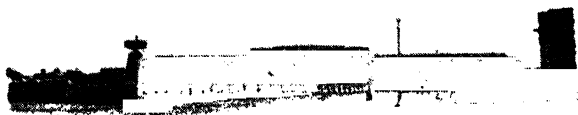
আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়—চিদম্বরম্

দেখলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনটি একটি থিয়েটার-স্টেজের মত। একটি সুসজ্জিত মঞ্চ আছে, এর দুপাশে দুটি অয়েলপেন্টিং ছবি—একটি রাজার ও একটি মন্দিরস্থিত নটরাজের মূর্ত্তি। মেঝের সঙ্গে গাঁথা সারি সারি চেয়ার, যেমন আধুনিক সিনেমায় দেখা যায়। বেশ নতুন ধরণের এর বন্দোবস্ত।

একতলায় রেজিষ্ট্রার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর দপ্তর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় পাঁচশ ফিট দূরে চমৎকার আধুনিক ধরণের ছাত্রাবাস। ছশো ছাত্র এই বাড়ীটিতে থাকতে পারে।

মনে মনে আন্নামালাই রাজাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ফিরে এলাম।

*  *  *  *

খাওয়া-দাওয়া সেরে একটুখানি চোখ বুজে নিয়ে উঠে বসেছি। সেলুনের জানালার ধারটিতে বসে ভাবছি নানান কথা। আশে-পাশে দু'ধারে লাইন চলে গেছে সরীসৃপের মত। সূর্য্যের পাণ্ডুর আলো পড়ে বিসর্পিত লাইনগুলি চক্‌চক্ করে উঠছে।

রাও এসে জিজ্ঞাসা করলেন "আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, বলতে ভুলে গেছি—চিংলিপুটের স্টেশনে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পাচকরা যে আপনাদের দেশের খাবাব তৈরী কবে দিয়েছিল, কেমন লেগেছিল সে সব?"

বললাম, "ভাল। ঠিক আমাদের দেশের খাবার না হলেও 'উত্তর-দক্ষিণ' মিশিয়ে খাবারগুলো একরকম মন্দ লাগে নি।"

প্রকৃতপক্ষে এখানকার দক্ষিণ-ভাবতের পাচক ব্রাহ্মণেরা যে খাবার তৈবী করেছিল, সেগুলি এ অঞ্চলের মতই। তরকারীতে মসলা যা দিয়েছিল, তা এ অঞ্চলের ন্যায়।

খাবারের মেনু ছিল, চাপাটি (আমাদের দেশের পরঠার মত), দাল ও দু-একটি তরকারী। আর দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ খাবার দুটিও আমাদের অনুমতি নিয়ে তারা দিয়েছিল। সে দুটি হচ্ছে, 'বড়ে' ও 'রসম্'। 'বড়ে', আমাদের দেশে যাকে বড়া বলে, তাই। কলাইয়ের দাল বেটে এটি তৈরী হয়, আর রসম্ হচ্ছে একপ্রকারের পানীয়। পাকা তেঁতুল গোলা, দালের ঝোল, গোলমরিচের গুঁড়ো,

জীরার গুঁড়ো, প্রভৃতি নানারকমের মসলা মেশানো। এই দুটি দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ আহার।

খাবারের কথা হতেই বিলুর মা রসমের কথাটা মনে করিয়ে দিলেন।

প্রভাত বললে, "তোমার রসমটা ভাল লেগেছিল—নয়?"

মনে পড়ল, রসমে আসক্তি দেখে সেদিন বিলুর মা রহস্য কোরে বলেছিলেন, "বুড়ো বয়সে রসমে এতো আসক্তি কেন?"

তাঁর রহস্যের জবাব সে সময় দিতে পারি নি। দিয়েছিলাম পরে—তীর্থযাত্রা শেষ কোরে তাঁর এলাহাবাদের বাড়ীতে যখন বিশ্রাম করছিলাম, সে সময় একদিন উপনিষদ্ আলোচনা করতে করতে মনে পড়েছিল চিংলিপুটের রহস্যের কথা। বলেছিলাম, "মনে আছে, চিংলিপুটের রসম্? মনে আছে, রসমে আসক্তির প্রশ্ন?' এই রসই যে সংসারের সার বস্তু। 'রসোবৈসঃ'—ব্রহ্মই রস। এই রসের সন্ধান যে পেয়েছে, তারই জীবন সার্থক হয়ে গেছে। এই রসে মগ্ন হতে পারলে মন কি আর কিছু চায়! সর্ব্ব ইন্দ্রিয় এই রসের আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। বয়সে দশ বছরের ছোট হলেও সম্মানে তুমি বড়, আশীর্ব্বাদের দাবীও তোমার আছে। আশীর্ব্বাদ কর, শেষের দিন ক'টা এই রসে ডুবে যেন মগ্ন হয়ে থাকতে পারি—আর কিছু চাই না।"

কথা কইতে কইতে ট্রেণ এসে পৌঁছল। আমাদের সেলুন চললো মায়াভরমের দিকে। ঘড়ি খুলে দেখলাম, বেলা তিনটে তিরিশ মিনিট।

# মায়াভরম্

বেলা পাঁচটা নাগাদ আমরা মায়াভরমে এসে পৌঁছুলাম। আমাদের ছেড়ে দিয়ে ট্রেণখানি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই Endowment Committee-র সুপারিনটেনডেন্ট এসে দেখা করলেন।

দেখি, দু-খানি ট্যাক্সি তিনি আগে থেকে আমাদের জন্যে বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। ট্যাক্সিতে উঠে আমরা মায়ানাথ শিব দর্শনে যাত্রা করলাম। সুপারিনটেনডেন্ট মশায়ও আমাদের সঙ্গে চললেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, বিনয়াবনত স্বভাব আজো পর্য্যন্ত আমাদের মনে আছে। মানুষকে কেমন কোরে যত্ন-আত্মি্য করতে হয়, তা তিনি পূবোদস্তুর জানেন।

মায়াভরম্ জায়গাটি তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত। জায়গাটির ভূপরিমাণ হবে সাড়ে তিনশো বর্গ মাইল।

সহরের যে অংশে মন্দিরটি স্থাপিত, তাবই পাশ দিয়ে কাবেবী নদীর ক্ষীণ জলধারা ভক্ত বাঞ্ছাপুরণের জন্য প্রবাহিতা। কাবেরীকে উপলক্ষ্য কোরে প্রতি বছরের কার্ত্তিক মাসে একটি বড মেলা হয়। মেলাটির নাম তুলাকাবেরী। সাধারণেব ধাবণা, সূর্য্য যখন তুলারাশিতে অবস্থান করেন, তখন গঙ্গার জলস্রোত কাবেরীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এই যোগে কাবেবীতে স্নান করবার জন্যে বহু পুণ্যার্থী দেশ-বিদেশ থেকে এখানে আসে, এবং পূবো কার্ত্তিক মাস

ধরে এই মেলা থাকে ও পুণ্যার্জ্জনাভিলাষীদের সমাগম হয়। কাবেরীর জলস্পর্শ কোরে মন্দির দর্শনে গেলাম। এখানে বিগ্রহ-মূর্ত্তি শিবলিঙ্গ—নাম মায়ানাথ। 'মায়া' অর্থে দুর্গা এবং নাথ অর্থে শিব।

পাশেই দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি আছে। এ অঞ্চলে দুর্গা 'অভয়াম্বরা' নামে পরিচিতা।

মায়াভরমের যে জায়গাটিতে মায়ানাথ শিবের মন্দির আছে, সেখানটিকে লোকে লক্ষ্মীপুরী বলে অভিহিত করে।

মায়ানাথ ও অভয়াম্বরা দর্শন কোরে আমরা মন্দির-সমিতির আপিসে দেবদেবীর বহুমূল্য অলঙ্কারাদি দেখতে গেলাম। অলঙ্কারগুলি খুবই মূল্যবান। সব তাতেই প্রায় হীরা, মণিমুক্তা প্রভৃতি বসান। মন্দিরের আয়ও প্রচুর।

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা কিছুদূরে বিষ্ণু-মন্দির দেখতে গেলাম। এই বিষ্ণু-মূর্ত্তির নাম 'পরিমল রঙ্গনায়ক'।

মায়াভরম্ থেকে পরিমল রঙ্গনায়কের মন্দির প্রায় তিন মাইল হবে। বেশ ভাল পাকা রাস্তা আছে।

পরিমল রঙ্গনায়কের মন্দিরটি পর পর চারটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রথম প্রাচীরের দ্বার পার হয়েই একটি সুন্দর সরোবর নজরে পড়ল।

পরের পর ক'টি প্রাচীর পার হয়ে মূল মন্দিরে উপস্থিত হলাম। এখানে বিষ্ণুর অনন্ত-শয়ন মূর্ত্তি।

পূজা-অর্চ্চনা, আরতি প্রভৃতি সেরে গেলাম দেবীর মন্দিরে।

লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরটি দেখতে ছোট হলেও, বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। দেবীর নাম দেবতার অনুকরণে 'পরিমল রঙ্গনায়কী'।

দেবীর মন্দিরের সামনে একটি নাটমন্দির দেখলাম। প্রস্তর স্তম্ভগাত্রে অনেক উৎকীর্ণ চিত্র আছে, সেগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম—কোথাও দেখলাম, দেবাসুরের যুদ্ধ, কোথাও শিবের বিবাহ, কোথাও বা পার্ব্বতী পুত্রসহ ক্রীড়ারতা, কোথাও মদন ভস্ম ইত্যাদি অনেকগুলি পৌরাণিক ও নানাপ্রকার গাছ, ফল-ফুল, পাহাড় প্রভৃতির ছবি খোদাই করা রয়েছে।

শুনলাম, মাঘ মাসে পরিমল রঙ্গনায়ক স্বামীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় ভগবান বিষ্ণুকে কাবেরী-তীর্থে প্রত্যহ স্নান করাবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। একমাস ধরে এই উৎসব চলতে থাকে।

এখান থেকে বেরিয়ে সুপারিনটেন্‌ডেন্ট মশায়কে অভিবাদন ও বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে আমরা বাজারের দিকে গেলাম। এখানকার ফলমূল, শাক-সব্জী প্রভৃতি কিনে রাত্রি সাড়ে ন'টা নাগাদ ফিরে এলাম সেলুনে।

মায়াভরম্ স্টেশনেই রাতটা কাটল।

সকালবেলা—তখন প্রায় আটটা হবে—একখানি ট্রেণ এসে দাঁড়ালো স্টেশনে, তারপর আমাদের সেলুনখানিকে সহযাত্রী কোরে চলল কুম্ভকোনামের উদ্দেশ্যে।

---

# কুম্ভকোনাম্

বেলা দশটার কাছাকাছি আমরা কুম্ভকোনামে পৌঁছুলাম। মায়াভরম্ থেকে কুম্ভকোনাম্ বেশীদূর নয়, বোধ হয় পাঁচ সাতটি স্টেশনের তফাৎ।

সেলুন পেঁছুতেই একটি ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। পরিচয়ে জানতে পারলাম, তিনিই কুম্ভকোনাম মন্দির-সমিতির ম্যানেজার—নাম শ্রীগোপালম।

তু'খানি ট্যাক্সি ভাড়া কোরে রেখে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, বললেন, "চলুন, আমি মোটর ঠিক কোরে রেখেছি।"

চলন্ত ট্রেণেই আমরা স্নান প্রভৃতি সেরে নিয়েছিলাম। কাজেই, তখনি যাত্রা করলাম মন্দির দর্শনে।

পথে যেতে যেতে শ্রীগোপালম্ কুম্ভকোনামের ঐতিহাসিক, কিম্বদন্তী প্রভৃতির গল্প বলতে লাগলেন।

শুনলাম, এখানে ছটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। এদের নাম—কুম্ভেশ্বর, সোমেশ্বর, শার্ঙ্গপাণি, চক্রপাণি, নাগেশ্বর ও রামস্বামী।

এখানকার লোকেরা ধারণা করেন যে, শার্ঙ্গপাণি ও চক্রপাণির মন্দির অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তৈরী হয়। এর নির্ম্মাতা ছিলেন তঞ্জাবুয়ের শিবাপ্পা নায়কের পৌত্র রঘুনাথ নায়ক। এ প্রকার ধারণার ভিত্তি এই যে, তঞ্জাবুয়ের নায়ক-রাজারা

বৈষ্ণববাদী ছিলেন ; এবং এই যুক্তির ওপর আস্থাবান হয়ে সাধারণে এও ধারণা করেন যে, বাকী তিনটি মন্দিরও চোল-রাজারা তৈরী করেছেন। কারণ, চোল-রাজারা ছিলেন শৈববাদী।

স্থলপুরাণে আছে যে, প্রলয়ের সময় এক কলসী অমৃত সুমেরু পর্ব্বতের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রলয়ের জল বাড়তে বাড়তে এক সময় সুমেরুর শিখরদেশে উপস্থিত হল এবং কলসীটি চলল ভাসতে ভাসতে। তারপর প্রলয়পয়োধিজলে যখন ভাটা পড়ল, তখন দেখা গেল যে, কানা ভেঙে অমৃতের কলসীটি পড়ে আছে। মহেশ্বর দেখলেন, অমৃত এখানকার ভূমি স্পর্শ কোরে এ স্থানকে পবিত্র করেছে, সুতরাং একে তীর্থস্থানে পরিণত করা উচিত। তাই তিনি এখানে আবির্ভূত হলেন এবং এর নাম প্রচারিত হল কুম্ভঘোনম্।

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বর্ণনায় গোবিন্দদাসের কড়চায় "কুম্ভকর্ণ-কর্পর-সরোবর" বলে উল্লেখ আছে।

"কুম্ভকর্ণ কর্পরেতে সরোবর হয়।
সরসী দেখিয়া প্রভু মানিলা বিস্ময়॥"

কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, "কুম্ভকর্ণ কপালের দেখি সরোবর"। আমার মনে হয়, উভয়ের এই কুম্ভকর্ণ ই কুম্ভকোনাম্ বা কুম্ভঘোনম্। শ্রীগোপালমকে "কুম্ভকর্ণ কপালের" কথাটি বেশ ভাল কোরে বুঝিয়ে বলে এ রকম কোন ব্যাপার কিছু আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, কুম্ভকর্ণের কপালের সঙ্গে কুম্ভঘোনমের কোন তথ্য আছে বলে তিনি শোনেন নি। পরে

এখানকার মঠের সত্ত্বাধিকারীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা কোরেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "আমি স্থিরনিশ্চিত যে, কুম্ভকর্ণের কপালের সঙ্গে এখানকার কোন সংস্পর্শ নেই।"

পরে কুম্ভঘোনম্ কথাটি লোকের মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত হয়ে কুম্ভকোনামে পরিণত হয়েছে।

প্রয়াগ, হরিদ্বার, নাসিক, উজ্জয়িনীতে যেমন কুম্ভ মেলা হয়, এখানেও তেমনি যাত্রীরা কুম্ভযোগে স্নান করেন এবং প্রতি বৎসর প্রয়াগে যেমন মাঘ মাসে মেলা অনুষ্ঠিত হয়, এখানেও ঠিক তাই।

কুম্ভযোগকে কেউ কেউ পুষ্করযোগও বলে থাকেন। তা ছাড়া অর্দ্ধকুম্ভ, পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতিও হয়।

পুরাণে আছে, বৃহস্পতিবারে যদি পূর্ণিমা তিথি হয় এবং উক্ত দিনে যদি সিংহ রাশিতে সূর্য্য ও বৃহস্পতি একসঙ্গে থাকেন, তা হলে গোদাবরী নদীতে কুম্ভযোগ হয়।

শ্রাবণ মাসে বৃহস্পতি ও রবি যদি এক রাশিতে অবস্থান করেন অর্থাৎ কর্কটে, এবং সোমবারে যদি পূর্ণ অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হয়, তা হলে কৃষ্ণানদীতে এই কুম্ভযোগ ঘটে।

কাবেরীর সম্বন্ধে আছে যে, বৈশাখ মাসে সূর্য্য যখন মেষ রাশিস্থ হন, সেই সময় বৃহস্পতি যদি মেষে প্রবেশ করেন এবং সোমবার যদি কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি হয় তো, তা হলে কুম্ভযোগ হয়।

গঙ্গায় কুম্ভযোগ হয়, যখন রবিবারে পূর্ণিমা তিথি হয় এবং মাঘ মাসে বৃহস্পতি সূর্য্যের সঙ্গে একই রাশিতে মিলিত হন।

গঙ্গা, গোদাবরী, কাবেরী, কৃষ্ণা প্রভৃতির জলধারা যে যে নদী বা স্থানকে স্পর্শ করেছে, উক্ত গ্রহ, নক্ষত্র ও তিথির সমন্বয়ে সেই সেই স্রোতস্বিনীতেই কুম্ভযোগ হয়।

কুম্ভকোনামে ক্ষীণা কাবেরী বর্তমান। এখানে কাবেরী ছাড়াও কুম্ভযোগ হয় মহামাঘম্ সরোবরে।

মহামাহম্ সরোবরে স্নানের দৃশ্য

কারণ, শোনা যায় যে, ভগ্ন অমৃত কলসের কানা নাকি এইখানে, অর্থাৎ মহামাহম্ কুণ্ডে পড়েছিল।

শ্রীগোপালম্ বললেন, এটির আসল নাম "মহামাহম্"। পরে মহামাঘম্ ওরই অপভ্রংশ হিসাবে প্রচলিত হয়েছে।

মাঘ মাসে এখানে কুম্ভযোগ হয় বলে এর নাম "মহামাহম্।"

বললাম, "মহামাহমই বলি আর মহামাঘমই বলি, দুইই এক—অর্থের কোনরকম বিকৃতি ওতে ঘটে না। কারণ, মাহ

কথাটির অর্থ মাস এবং মাঘ বলতেও ঐ মাসের কথাই বোঝা যায়। শ্রীগোপালম্ বললেন, বারো বছর অন্তর এখানে পূর্ণকুম্ভ স্নান উপলক্ষে মেলা বসে এবং পুণ্যার্থীদের ভীড় এতো হয় যে, কল্পনা করা যায় না।

শুনলাম, আগামী ১৯৪৫ সালে এখানে পূর্ণকুম্ভ যোগ উপলক্ষে মহামোক্ষ স্নান হবে। এই প্রকার পূর্ণকুম্ভ যোগ গত ১৯৩৩ সালে হয়েছিল। *

এখানকার মন্দিরের গোপুরম বা গোপুর দ্বারে পৌঁছে এই গোপুরের উচ্চতা ও কারুকার্যের দিকে আমরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। প্রায় ১২৮ ফিট উঁচু এটি। আর কারুকার্য…… সে বলে বোঝানো যাবে না, এতো নিঁখুত। কত দিনের সাধনায় তবে এমনটি সম্ভব হয়েছে। এই দ্বার থেকে একটি সোজা রাস্তা

---

* যখন এই বইখানি যন্ত্রস্থ তখন প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ, সেই সময় ভাগ্যবশতঃ কুম্ভমেলায় ত্রিবেণী-সঙ্গমে আমার কিছুদিন বাস করবার সুযোগ হয়েছিল। নানাসম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীদের আশ্রম ও আখড়া সমবেত হয়েছিল। একদিন হরিদ্বারস্থ শ্রীভোলাশ্রমের মোহান্ত ১০৮ শ্রীমৎস্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মণ্ডলেশ্বর মহারাজকে কুম্ভকোনামের কুম্ভমেলার বিষয় প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন যে, হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী ব্যতীত অন্য কোথাও কুম্ভ যোগ হয় না, তবে অনেক তীর্থস্থানে তৎপ্রদেশের লোকেরা পূর্ব্বোক্ত চারিটি জায়গায় কুম্ভমেলার অনুকরণ কোরে থাকেন। তিনি আরও বললেন যে, আজ ৪ বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবনে প্রথম এক কুম্ভমেলার প্রতিষ্ঠান করা হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বললেন যে, বহু দেবমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রার অনুকরণ করা হয়—এও সেই রকম।

মন্দিরের প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত গেছে। প্রায় আড়াইশ হাত লম্বা এ রাস্তাটি। রাস্তার দুধারে সারি সারি গ্রেনাইট পাথরের স্তম্ভ। মূর্ত্তি, গাছ, লতা-পাতা, ফুল, পাহাড় কী নেই······সব রকমের কারুকার্য্যে এ স্তম্ভগুলি দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় দিচ্ছে।

গোপুর দ্বারের সামনে পৌঁছবামাত্রই নানান প্রকারের বাজনাবাদ্যের সঙ্গে মন্দির-সমিতির কর্ম্মচারীরা আমাদের সম্বর্দ্ধনা করলেন। বুঝলাম, শ্রীগোপালম্ আগে থেকেই এ সবের আয়োজন কোরে রেখেছিলেন।

আমাদের জন্যে আগে থেকেই মন্দিরের দ্বার খোলা ছিল আমরা সবাই মন্দিরের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কুম্ভেশ্বর স্বামীর মন্দিরের বিগ্রহ শিবলিঙ্গ—দেবী পার্ব্বতী এ অঞ্চলের নাম 'মুঙ্গলাম্বিকা'।

পুরাকালে সতীর মৃতদেহ কাঁধে কোরে মহেশ্বর যখন কৈলাসে তাণ্ডব-নৃত্য করেছিলেন, তখন সতীর খণ্ডবিখণ্ড দেহাংশ যে বাহান্নটি জায়গায় পড়েছিল, সে ক'টি জায়গাই পবিত্র তীর্থক্ষেত্র পীঠস্থান বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। শুনলাম, উক্ত বাহান্নটি স্থানের মধ্যে এটি একটি এবং এখানে সতীর মেরুদণ্ড পড়েছিল।

প্রতি বছর কুম্ভকোনামে ছোট-খাট সাত আটটি উৎসব হয়। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সময়ে বসন্তোৎসব। মহেশ্বর এই সময়ে বসন্তবায়ু সেবনে বেরোন। শোভাযাত্রা কোরে মহাদেবকে ( অবশ্য মহাদেবের ভোগমূর্ত্তি ) মন্দির-প্রাঙ্গণের বাইরে আনা হয়।

এই রকম কার্ত্তিক মাসে ঝুলনোৎসব, মাঘে জলক্রীড়া-উৎসব ও পৌষে রথযাত্রা সম্পন্ন হয়।

মন্দিরের সামনে সাজানো রূপোর পালকী, হাতী, রথ প্রভৃতি দেখলাম। শ্রীশ্রীকুম্ভেশ্বর স্বামীর মন্দিরের কাছে লক্ষ্মীনারাণস্বামী নামে একটি প্রস্তরমূর্ত্তি দেখলাম। মহেশ্বরের পূজার সঙ্গে এঁরও নিয়মিত পূজা হয়।

শ্রীগোপালম্ এর কাহিনী বললেন, "প্রায় পাঁচশো বছর আগে লক্ষ্মীনারাণ নামক জনৈক ভক্ত প্রভুর অর্চ্চনা-পূজার জন্যে অনেক নিষ্কর ভূসম্পত্তি কিনে দেন। মন্দির-সংস্কার, পরিমার্জ্জন, পরিবর্দ্ধন প্রভৃতি কাজের জন্যেও তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন। তাই, সেই পুণ্যকাজের জন্য আজো ভগবানের সঙ্গে ভক্তের উদ্দেশ্যে পূজার্চ্চণাদি হয়।"

মন্দির-প্রাঙ্গণের পাশে একটি ছোটখাট বাজার বসে। এই বাজারে নানাপ্রকারের পিতল ও জার্ম্মান সিলভারের বাসনপত্র বিক্রি হচ্ছে দেখলাম।

শ্রীগোপালম্ বললেন, "কুম্ভকোনামে পেতল-কাঁসার নানা রকমের জিনিষ তৈরী হয়। এখানকার জিনিষগুলি দাক্ষিণাত্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।"

কাবেরীর তীরে চক্রপাণির মন্দির।

এরই সামনে সেই মহামাহম্ সরোবর, যার নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি।

চক্রপাণির মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর দণ্ডায়মান মূর্ত্তি দেখলাম।

ঠাকুরের আটটি হাত ও তিনটি চক্ষু। ত্রিনেত্র বিষ্ণুমূর্ত্তি পূর্ব্বে কোথাও দেখি নাই।

শ্রীগোপালম্ এই মূর্ত্তির ব্যাখ্যা কোরে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। শিব ও বিষ্ণুর মিলিত মূর্ত্তিই এখানকার চক্রপাণি স্বামী।

সমস্ত দাক্ষিণাত্য শৈব ও বৈষ্ণব, এই দুটি মতকে বরাবর পরিপোষণ কোরে গেছেন। এঁদের নেতা ছিলেন শৈবসম্প্রদায়ে শঙ্করাচার্য্য ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে রামানুজাচার্য্য। সাম্প্রদায়িক আঘাত-অভিঘাত, ছোট-বড নিয়ে তর্ক, বাগবিতণ্ডা বহু হয়ে গেছে। তবু কোথাও কোথাও এই দুই সম্প্রাদায় সাগরমুখী নদী যেমন কোরে কখনো কখনো মিশে এক হয়ে যায়, তেমনি কোরে একই মন্দিরের পরিধিতে মিশে একাকার হয়ে গেছেন।

সাম্প্রদায়িকতা যে ছিল, বৈষ্ণব মতাবলম্বীর সঙ্গে শৈব মতাবলম্বীদের যে বিরোধ হত, ইতিহাস ছাড়া এর প্রত্যক্ষ প্রমাণও এখানকার মন্দিরগুলি দর্শন করলে প্রতীয়মান হয়।

বরাবরই দেখেছি, যেখানে শিবের সুবৃহৎ মন্দির আছে, তারই কিছুদূরে বিষ্ণুরও আর একটি মন্দির আছে। এ থেকে বেশ অনুমান করা যায় যে, শৈববাদীদের মন্দির নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মতবাদী বৈষ্ণবেরাও একটি মন্দির তদানীন্তন স্থানে তৈরী করিয়েছেন।

চক্রপাণির মন্দিরে দেবীমূর্ত্তি আছেন—নাম "বিজয়বল্লী।"

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা শার্ঙ্গপাণির মন্দিরে গেলাম। মন্দিরে ছটি গোপুরদ্বার। এর পূর্ব্বে ছটি গোপুর নজরে

পড়েনি বা শুনিও নি। এ মন্দিরের গোপুরমের উচ্চতা কুম্ভেশ্বরের গোপুরমকেও ছাপিয়ে যায়। শ্রীগোপালম্ বললেন, এর উচ্চতা দেড়শ ফিট এবং এই গোপুরটি দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বোচ্চ গোপুর।

চক্রপাণিব মন্দিবে দেখলাম বিষ্ণুর দণ্ডায়মান মূর্ত্তি, আর শার্ঙ্গপাণিব মন্দিরে দেখা গেল শেষ নাগশয্যায় বিষ্ণুর অনন্তশয়ন মর্ত্তি। ভগবানের নাভি থেকে উদ্গত পদ্মের শোভা দেখে মন পুলকিত হয়ে উঠল। কাছেই মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তি দেখলাম—এখানে দেবীমূর্ত্তির নাম 'মাতা কমলবল্লী'। মনে হয়, 'স্বামী' অর্থে যেমন দেবতা, 'বল্লী' অর্থে তেমনি বোধ হয় দেবী।

মন্দিরের সামনে অশ্ব ও গজ বাহন সংযুক্ত পাথরের একটি রথ দেখলাম। কী বিচিত্র এর কারুকার্য্য! কতো সাধনায়, কতো প্রতিভায যে এখানি এমন নিখুঁত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে, তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। প্রতি খিলানে, এমন কি, রথচক্রের 'কুঁদো'গুলিতে পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারুকার্য্যকুশলতা।

এই সুবৃহৎ রথের ওপর ভগবানের ভোগ-মূর্ত্তিকে বসিয়ে রথযাত্রা-উৎসব সম্পন্ন করা হয়। পনেরো হাজার ভক্ত মিলে এখানিকে টেনে নিয়ে যান।

শার্ঙ্গপাণির পর গেলাম রামস্বামীর মন্দিরে। এর গোপুরগুলি ছোট ছোট। উচ্চতাব প্রতিযোগিতায় এরা পরাজয় স্বীকার করলেও ভাস্কর্য্যে, কারুকার্য্যে এবং শিল্পনৈপুণ্যে অপূর্ব্ব। এক একখানি পূরো পাথরকে কেটে-ছেঁটে শ্রীরামস্বামী, বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতির মূর্ত্তি দিয়ে এর গোপুবগুলি অলঙ্কৃত।

নাটমন্দির দেখলাম। সব থামগুলি গ্রেনাইট পাথরের। সেগুলির গায়ে বিষ্ণুর ভিন্ন ভিন্ন অবতারের ছবি কুঁদে কুঁদে আঁকা আছে। স্তম্ভগুলি সমস্ত পুরাকালের কাহিনীতে ভরে আছে। নাটমন্দিরের চন্দ্রাতপে নবগ্রহের মূর্ত্তি পরিকল্পনা কোরে খোদাই করা আছে।

মন্দিরের ভেতর ঢুকে দেখলাম, এক পঙক্তিতে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার মূর্ত্তি ও অপর পঙক্তিতে হনুমান, ভরত ও শত্রুঘ্ন। সমস্ত মূর্ত্তিগুলিই গ্রেনাইট পাথরের তৈরী।

এমন কোরে পঙক্তি বিভাগ করার কারণ সম্বন্ধে ভাবতে লাগলাম। রামের পঙক্তিতে সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তির উদ্দেশ্য কি একসঙ্গে বনবাসে যাওয়ার জন্যে? তা যদি হয় তো বনবাস কালে হনুমান ত সীতা উদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন। তিনিই বা ওই পঙক্তিতে স্থান পেলেন না কেন? নিশ্চয়ই এর কোন একটা উদ্দেশ্য আছে।

শেষে স্থির করলাম, এইরকম পঙক্তি বিভাগের কারণ বোধ হয় এই—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা ছিলেন রামলীলার প্রধান নায়ক-নায়িকা, আর এঁদের লীলা প্রচারের সহায় ও পরিপোষক ছিলেন ভরত, শত্রুঘ্ন ও হনুমান। ভরতাদি ছিলেন অনুচর, আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাত্র। অর্থাৎ করণ ছিলেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা, উপকরণ ছিলেন ভরত-শত্রুঘ্ন ও হনুমান। ওঁরা ছিলেন কর্ত্তা, এঁরা ছিলেন কর্ম্ম—ওঁরা ছিলেন পুরোভাগে, এঁরা ছিলেন তার পেছনে। এ ছাড়া পঙক্তি বিভাগের আর কি অর্থ হতে পারে!

এখানকার দেখা শেষ কোরে সেলুনে ফেরবার জন্য সকলে

মোটরে উঠলাম। গাড়ীতে যেতে যেতে শ্রীগোপালম্ বললেন, "শঙ্করাচার্য্যের যে বিখ্যাত শৃঙ্গেরী নামে মঠ আছে, তারই একটি শাখা এখনো কুম্ভকোনামে রয়েছে। এই মঠাধ্যক্ষের পদবী শঙ্করাচার্য্য।"

জিজ্ঞেস করলাম, "এখানকার বিদ্যা-শিক্ষা প্রভৃতির সুখ্যাতি শুনেছিলাম, তার সংবাদ কিছু জানেন কি?"

শ্রীগোপালম্ ঘাড় নেড়ে বললেন, "জানি। আপনি বোধ হয় শুনেছেন, কুম্ভকোনামকে Cambridge of India বলে।"

বললাম, "হাঁ। এ অঞ্চলের লোকের মুখেই শুনেছি এই নাম।"

শ্রীগোপালম্ বললেন, "এককালে এখানে বিদ্যাচর্চ্চার যা বন্দোবস্ত ছিল, তাতে সত্যিই একে কেমব্রিজ বলা চলে। মঠ থেকে একসময় সটিক সংস্কৃত মহাভারত ছাপা হয়েছিল—এখনো অনেক হাতে-লেখা সংস্কৃত ও তামিল পুঁথি আছে, যা ভারতের অন্য কোথাও নেই। এখন সে সংস্করণ আর পাওয়া যায় না। কিন্তু মিঃ চৌধুরী"......শ্রীগোপালম্ দুঃখিতকণ্ঠে নিশ্বাস ফেলে বললেন, "বিদ্যা এখন অর্থকরী হয়েছে। লোকে চায়, কি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির ছাপ নিয়ে চাকরী করব। সত্যিকারের যা বিদ্যা, বিদ্যায় অনুরাগ যা, তা এখন আছে কি?"

সত্যিই ত, এ কথায় সায় না দিয়ে থাকি কেমন করে!

"কাজেই, সে সব মহামূল্য বিদ্যা আজ পরিত্যক্ত। সে দিকে কেউ ফিরেও চায় না। যা দু-একটি বিদ্যাপীঠ, টোল এখানে আছে, তাদের আজ দুরবস্থার সীমা নেই। কোনরকমে নামটুকু রক্ষে কোরে না মরে বেঁচে আছে।"

শ্রীগোপালম্ থামলেন। বুঝলাম লোকটি বিদ্যানুরাগী। তাই এ সবের দুঃখ তাঁকে এমন কোরে বেজেছে।

সত্যিই, ভারতে ছিল না কি! এর অমূল্য গ্রন্থে কোন্ কথার কোন্ বিষয়ের পরিচয় না পাওয়া যায়!

দু'জনেই নীরবে ভাবছিলাম, কতো বড় সাধনা ও প্রতিভার ক্ষেত্র ছিল এই ভারত! হঠাৎ দেখলাম, একটি দোকানে পিতল-কাঁসার অনেক জিনিষ সাজান রয়েছে। ড্রাইভারকে থামাতে বলে নামলাম।

দোকান থেকে বেছে বেছে পছন্দসই কয়েকটি ছোট-খাট জিনিষ কিনলাম, আর দুটি দীপাধার ও দুটি গাছ-প্রদীপের ফরমাস দিলাম।

দীপাধার দুটি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীর জন্য ও গাছ-প্রদীপ দুটি দুর্গাপূজার জন্য। পরে তাঁরা এই জিনিষগুলি কলকাতার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দীপাধার দুটি নিত্য রাধাগোবিন্দের মন্দির আলো কোরে রাখে, আর গাছ-প্রদীপ দুটি গত বছর দুর্গাপূজার সময় ব্যবহার করেছিলাম।

শুনলাম, পাঁচশো দীপসমন্বিত গাছ-প্রদীপও এখানে বিক্রির জন্য প্রস্তুত থাকে, এর চেয়ে বেশী সংখ্যক দীপসমন্বিত প্রয়োজন হলে ফরমাস দিতে হয়।

সেলুনে ফিরতে বেলা দুটো বেজে গেল।

বৈকালের দিকে একখানি ট্রেণ এসে আমাদের সেলুনটিকে নিয়ে চলল তাঞ্জোরের দিকে।

চলন্ত গাড়ীতে বসে আমরা সকলে মিলে কুম্ভকোনামের মন্দিরের আলোচনায় বিভোর হয়ে রইলাম।

সত্যি, বিশালতায়, বৈশিষ্ট্যে, কারুকার্য্যে, চমৎকারিত্বে—সব দিক দিয়েই কুম্ভকোনামের মন্দিরগুলির একটি ছাপ মনের মধ্যে আজো জেগে আছে।

## তাঞ্জোর

সন্ধ্যার পর সাতটা বিশ মিনিটে তাঞ্জোরে এসে পৌঁছুলাম। কুম্ভকোনাম্ থেকে তাঞ্জোর মাত্র চব্বিশ মাইল দূরে।

তাঞ্জোর সহরটি পৌরাণিক সহর। ঐতিহাসিক যুগে তাঞ্জোর চোল-রাজাদের রাজধানী ছিল। তাঞ্জোরের শেষ রাজার নাম মহাবীর বেনকাজি। ইনি যুদ্ধবিগ্রহে অতিশয় পটু ও বীরাগ্রগণ্য ছিলেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে বেনকাজি তাঞ্জোরের কাছাকাছি স্থানকে ইংরাজের হাতে শাসন-চুক্তিতে প্রদান করেন। মহাবীর বেনকাজির কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, তাঁর মৃত্যুর পর তাঞ্জোর এবং আশ-পাশের আরো কয়েকটি তালুক ইংরাজ সরকারের হাতে আসে।

তাঞ্জোর সহরটিকে ভৌগোলিক আখ্যায় একটি দ্বীপও বলা যায়। কারণ, কাবেরী নদীর উপকূলে যে ত্রিভুজাকার দ্বীপস্থান আছে, সেইখানে তাঞ্জোর অবস্থিত। সেইজন্য তাঞ্জোর খুব উর্ব্বরা স্থান। কাবেরী নদী যেন তাঁর সমস্ত উর্ব্বরতা এই তাঞ্জোরেই গচ্ছিত রেখেছেন।

তাঞ্জোরের সম্বন্ধে একটি প্রাগৈতিহাসিক গল্প আছে।

পুরাকালে তাঞ্জোর জায়গাটি বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই বনে তৎকালে এক রাক্ষস বাস করত, তার নাম তানজন। জন্তু-জানোয়ার, বন্য-মানুষ প্রভৃতি কিছুই তার করুণায় জীবিত থাকত না। জঠরানল প্রজ্জ্বলিত হলে সে যা সামনে পেত, তাই দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করত।

এমনি কোরে কোরে বনের পশু-পক্ষী প্রভৃতি যখন সবই প্রায় শেষ হয়ে গেল তখন ক্ষুধার্ত্ত তান্‌জন্ একদিন খুঁজতে খুঁজতে এক ধ্যানমগ্ন ঋষিকে বনের মধ্যে আবিষ্কার করলে। ঋষিই হোন আর যেই হোন, তান্‌জন্ তৎক্ষণাৎ তাকে আক্রমণ করলে।

ঋষির ধ্যান ভঙ্গ হল এবং এই অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তিনি কাতর ভাবে ভগবান বিষ্ণুকে ডাকতে লাগলেন।

ভগবানের কানে সে ডাক পেঁাছল এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী মূর্ত্তিতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন ঋষির সম্মুখে।

অভূতপূর্ব্ব-ব্যাপার! বিস্মিত রাক্ষস ক্ষুধা ভুলে অবাক হয়ে সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইল। ভগবান বিষ্ণু তখন ভক্তের জন্য রাক্ষসকে নিধন করবার উদ্যোগ করলেন। বজ্রের বিদ্যুৎবিভায় দিশাহারা ভীত রাক্ষস প্রভুর পদতলে আত্মসমর্পণ কোরে স্তব-স্তুতি আরম্ভ করলে। ভগবান দয়ার আধার—সহস্র অপরাধের পরও যদি ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তাঁর চরণে আশ্রয় লওয়া যায় তো তাঁর কৃপালাভ করা যায়। তান্‌জনের বেলায়ও সে গুণের ব্যতিক্রম হল না। ভগবান তাঁকে ক্ষমা করলেন এবং বললেন, "তোর সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করলাম, এখন বর প্রার্থনা কর্।"

কৃতাঞ্জলি করপুটে তান্‌জন বললে, “প্রভু, আমি এ স্থানকে জনপ্রাণীহীন কোরে দিয়েছি—এ গ্রামটি যাতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, অনুগ্রহ কোরে তারই ব্যবস্থা করুন এবং আদেশ করুন, এই জনপদ যেন ভবিষ্যতে আমার নামে আখ্যাত হয়।

সেই থেকে তানজন শব্দের অপভ্রংশ দাঁড়িয়েছে তাঞ্জোর।

রাত্রিটা তাঞ্জোর স্টেশনেই কাটল।

পরের দিন সকালবেলা দু'খানি ট্যাক্সি ভাড়া কোরে দেব-দর্শন উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

তাঞ্জোরের রাস্তাগুলি বড় মনোরম। প্রশস্ত পথের দু'পাশে সারি সারি ছায়াতরু শাখা-প্রশাখা বিস্তার কোরে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বিচিত্র আকাশ। সেখানে বর্ণচ্ছটার বিরাম নেই। অন্তরালে বসে স্বষ্টিকর্ত্তা আপন মনে অনবরত তুলি বুলিয়ে নিত্য নতুন রঙ ফোটাচ্ছেন। কখনো মেঘজালের অন্তরে সূর্য্য ঢাকা পড়ছেন, কখনো উঁকি দিয়ে বেরিয়ে এসে ভেসে যাচ্ছেন গগন-সমুদ্রে।

প্রথমেই আমরা কামাক্ষাদেবীর মন্দির দেখতে গেলাম।

রাও বললেন, “মনে আছে বোধ হয় শিবকাঞ্চীর কথা। এই কামাক্ষী দেবীরই নকল মূর্ত্তি সেখানে দেখেছিলেন।”

মনে পড়ল, হায়দার আলির ভয়ে এঁকেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

এ কামাক্ষীদেবীর গঠনও দেখলাম প্রায় শিবকাঞ্চীর মত।

বহুদূর থেকে মন্দিরের চূড়ো দেখে আমরা বললাম, “ওই

বোধ হয় গোপুর......কুম্ভকোনামের চেয়ে অনেক বড় বলেই মনে হচ্ছে।"

রাও শুনে বললেন, "না, ওটি বৃহদীশ্বরের মন্দিরের চূড়া।"

বিস্মিত হয়ে প্রভাত বললে, "মন্দিরের চূড়া! এ অঞ্চলে মন্দিরের চূড়ার চেয়ে গোপুরই তো বড় হয়—!"

বৃহদীশ্বর মন্দির—তাঞ্জোর

"হ্যা। সব জায়গাতেই তাই। কিন্তু এখানে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। এ মন্দিরের মাহাত্ম্য এমনি যে, কখনো চূড়ার ছায়া ভূমি স্পর্শ করে নি।"

সত্যি, আশ্চর্য্যের কথা তো!

মোটর বৃহদীশ্বরের মন্দিরে এসে পৌঁছল। আমরা নামলাম।

মন্দিরটি একটি দুর্গের ভেতর। দুর্গটির নাম "শিবগঙ্গা"। যেমন সব দুর্গ হয়, এটিও তেমনি। চারিদিকে পরিখা কেটে

সুরক্ষিত। এই পরিখার ওপরের রাস্তা দিয়ে আমরা দুর্গের ভেতরে ঢুকলাম।

গোপুরগুলি এখানে মাত্র ষাট সত্তর ফিট উঁচু, আর মন্দিরের চূড়াটি ২১৬ ফিট উঁচু। গোপুর পার হয়ে আমরা প্রাঙ্গণে এলাম।

প্রথম প্রাঙ্গণে শিশুপালের একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে। প্রথম প্রাঙ্গণ পার হয়ে দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেই বৃহদীশ্বরের মূল মন্দিরে আসা যায়। এখানে মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি বৃহদাকার বৃষমূর্ত্তি দেখলাম। মহাদেবের বাহন বৃষকে "নন্দী" বলে। নন্দীপ্রভু পা দুটি মুড়ে কঠিন আভিজাত্য রক্ষা কোরে বসে আছে।

এই প্রস্তর-নন্দীর সম্বন্ধে প্রবাদ শুনলাম। একটি "জীবন্ত" পর্ব্বত থেকে কেটে-ছেঁটে এই বৃষটি নাকি তৈরী করা হয়েছিল। গাছ যেমন কেটে-ছেঁটে দিলে পূর্ণোদ্যমে বাড়তে থাকে, তেমনি কোরে পর্ব্বত-জাত এই নন্দী মহাপ্রভুও মাথা চাড়া দিয়ে বেড়ে উঠতে লাগলেন। সবাই দেখলেন, এ এক বিপদ। নন্দী বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত বেড়ে উঠে প্রভু নন্দীশ্বরকেও ছাপিয়ে যাবে! সুতরাং, এক ভক্ত পূজারী একদিন এর মাথায় সজোরে চপেটাঘাত করলেন, যাতে সৃষ্টবস্তু সৃষ্টিকর্ত্তাকেও না টেক্কা দিতে পারে। সেই থেকে নন্দী মহাপ্রভুর 'বাড়' স্থগিত রয়ে গেল।

মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ কোরে দেখলাম, শিবের লিঙ্গ-মূর্ত্তিটি প্রায় তেরো ফিট উঁচু। এতো বড় লিঙ্গ-মূর্ত্তি এর পূর্ব্বে দেখেছি বলে মনে হয় না।

বাহন নন্দী মাত্র এঁর চেয়ে এক ফুট নীচু, আর লম্বায় ষোল ফিট।

মন্দিরের চূড়ায় অখণ্ড একটি গোলাকার গ্রেনাইট পাথর বসান আছে। পাথরটির ওজন শুনলাম আড়াই হাজার মণ। এই আড়াই হাজার মণ পাথরের গোলাকার বস্তুটি দৈর্ঘ্যে চার মাইল একটি ঢালু পথ তৈরী কোরে তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে এনে তবে চূড়ার মাথায় তোলা হয়েছে।

ব্যাপারটা যেমন আশ্চর্য্যের তেমনি দুরূহ। শুনে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে যেতে হয়।

বৃষের মূর্ত্তির কাছে অন্য একটি প্রকোষ্ঠে পার্ব্বতী দেবী বিরাজমানা। এখানকার পার্ব্বতীর নাম "বৃহন্নায়িকা"। কাছাকাছি একটি বারান্দায় একশো আটটি শিবলিঙ্গ দেখলাম। এখানকার সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার সুব্রহ্মণ্য (কার্ত্তিকেয) স্বামীর মন্দির। মন্দিরটি ষাট ফুটের চেয়েও বোধ হয় উঁচু হবে।

দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলির মধ্যে এখানকার সুব্রহ্মণ্য মন্দিরটি শুনেছিলাম সুবিখ্যাত।

সত্যিই, অতুলনীয় এর কারুকার্য্য, অভাবনীয় এর শিল্পনৈপুণ্য।

দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মন্দির যেগুলি দেখেছি, সে সবের কারুকার্য্য অদ্ভুত হলেও, সুব্রহ্মণ্য মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এটি যেমন নিখুঁত, তেমনি জীবন্ত। সকলেই বললেন, মন্দিরট খুবই প্রাচীন। কিন্তু, এমন বাহাদুরী যে, কালের কোনো ছাপই একে ম্লান করতে পারে নি। হঠাৎ

দেখলে মনে হয়, যেন কাল তৈরী হয়েছে এ মন্দির—এমনি জীবন্ত !

পূর্ব্বে বলেছি, শিবগঙ্গা দুর্গের ভিতর এই সব মন্দির, এর পাশে "বড় দুর্গ" নামে আর একটি দুর্গ আছে। শুনলাম এর ভেতর মহারাষ্ট্রদের অতীত কীর্ত্তির অনেক নিদর্শন আছে।

আমরা ঠিক করলাম, এ সব কীর্ত্তিগুলি বিকেলে দেখব।

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা তিরুবাদী মন্দির দর্শন করবার জন্য যাত্রা করলাম।

*　　*　　*　　*　　*

মন্দির এখান থেকে সাত মাইল দূরে, সহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ; কাবেরার উত্তর তীরে সহরটির নামও তিরুবাদী।

এখানে খুব প্রাচীন মন্দির দেখলাম। শিব—লিঙ্গ-মূর্ত্তি। শিবের নাম "পঞ্চনদীশ্বর" বা "ত্রিনন্দীকেশ্বর"। দেবীর নাম "ধর্ম্ম-সম্বর্দ্ধিকা"। শুনলাম, এখানকার শিবের যে বাহন নন্দী আছে, তার নাকি কাছাকাছি গ্রামে বিয়ে হয়েছিল। এই বিবাহ উৎসবকে উপলক্ষ কোরে প্রতি বছর ত্রয়োদশ দিন ব্যাপী উৎসব হয়।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠার কিংবদন্তী পুরোহিতের মুখে শুনলাম। ন্যায়মিশ্র নামে এক ঋষি একসময় এই শিবলিঙ্গের সামনে বসে তপস্যা করেন।

তাঁর মনে বাসনা ছিল যে, তিনি একটি মহাদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করবেন। ভগবান অন্তর্যামী। ন্যায়মিশ্রের বাসনা জানতে পেরে তিনি ন্যায়মিশ্রকে প্রত্যাদেশ দেন যে, শিবলিঙ্গের উত্তরাংশ খুঁড়লে তাহার মনের বাসনা পূর্ণ হবার উপায় হবে।

আদেশমত ঋষি শিবলিঙ্গের উত্তরাংশ খুঁড়ে দেখলেন যে, একটি গর্ত্তে স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে।

তখন ন্যায়মিশ্র এই মন্দির তৈরী কোরে নিজ বাসনা পূরণ করলেন।

রাও বললেন, এখানকার শিব পাঁচটি নদার অধীশ্বর বলে পরিচিত, সেইজন্যে এঁকে কেউ কেউ "পঞ্চনদীশ্বর" বলে থাকেন। এই নদীগুলির নাম—ভাদাভাব, ভাট্টাব, ভান্নাব, কুদামরুটি, কাবেরী।

পুরোহিতরা বললেন, তিরুবাদার চেয়ে এমন পুণ্যস্থান এ অঞ্চলে আর নাই। আমাদের দেশের লোক যেমন পরিণত বয়সে কাশীবাস করতে যায়, এখানকার লোকও তেমনি মোক্ষলাভের আশায় শেষ বয়সে তিরুবাদীতে বাস করে। মরণপথের যাত্রী-দিগকেও গঙ্গাযাত্রা করার মত তিরুবাদীর পুণ্যক্ষেত্রে নিয়ে আসে শুনলাম।

মন্দিরের কাছে একটি সরোবর দেখলাম। সরোবরটির নাম "পঞ্চনাথী"। লোকে বলে, দশহবায় গঙ্গাস্নানে যে পুণ্য হয়, পঞ্চনাথীতে স্নান করলেও তদনুরূপ ফল লাভ হয়। এই সরোবরের তীর্থস্নানকে লোকে "সরথ স্নান" বলে

"সরথ স্নান" সম্বন্ধে প্রবাদ শুনলাম। এই প্রবাদ থেকে ন্যায়মিশ্র প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের পূর্ব্বে যে আদি শিবলিঙ্গ ছিল, সে সম্বন্ধেও তথ্য জানা যায়।

পুরাকালে ত্রিশূলী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ছেলেবেলায়

ইনি এক ঋষির ভিক্ষাপাত্রে রহস্যচ্ছলে শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করেন। নিমীলিতনয়ন ঋষি করঙ্কে শিলাখণ্ড নিক্ষেপের শব্দ শুনে চোখ খুলে দেখে মনে মনে ত্রিশূলীকে অভিসম্পাত করলেন।

তারপর বহুদিন গত হয়েছে। ত্রিশূলী বিবাহ কোরে সংসারী হয়েছেন। পুত্রসম্ভাবনা কাল উত্তীর্ণ হয়ে যায় দেখে ক্ষুব্ধ ত্রিশূলী পুত্রলাভের আশায় যাগযজ্ঞ করতে লাগলেন। তখন একদিন স্বপ্নে দেখা দিয়ে সেই ঋষি বললেন, "আমিই তোমায় অভিশাপ দিয়েছিলাম, সেই অভিশাপে তুমি আজো নিঃসন্তান।"

ছেলেবেলার কথা স্মরণ হল ত্রিশূলীর। তিনি প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করলেন যে, কোন খাদ্যদ্রব্য আজ হতে তিনি গ্রহণ করবেন না এবং ঋষির ভিক্ষাপাত্রে নিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডই আজ থেকে তাঁর আহার্য্য হবে। এইজন্য এই প্রতিজ্ঞার পর থেকে শিলাভক্ষক হিসেবে তাঁর নাম "শিলাতরণ" হল।

ক্রমে কিছুদিন গত হবার পর ত্রিশূলীর কৃচ্ছ্রসাধন দেখে মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে প্রত্যাদেশ দিলেন। এই প্রত্যাদেশ অনুযায়ী শিলাতরণ মাটির ভেতর থেকে একটি সিন্দুক ও তার ভেতরে একটি পুত্রসন্তান পেল। দেখা গেল, এ সন্তানের আকৃতি মানুষের মত, কিন্তু মাথা ও মুখ গোসদৃশ। শিলাতরণ-এ ব্যাপার দেখে সন্তানকে শিবের নামে উৎসর্গ করলেন। এরই নাম "ত্রিনন্দী", অর্থাৎ শিবের তৃতীয় বাহন। শিব এই ত্রিনন্দীকে প্রমথদের অধিনায়ক ও পার্শ্বচর বলে গ্রহণ করলেন; এবং তদবধি শিবের নাম হল "ত্রিনন্দীকেশ্বর"।

পার্শ্বচর প্রমথদের অধিনায়ক বলে গ্রহণ করবার সময়

ত্রিনন্দীর যে অভিষেক হল, সেই অভিষেকের জলে, মহাদেবের কমণ্ডলুর জল, জটাস্থিত গঙ্গার জল, মহাদেবের বাহন বৃষরাজের মুখনিঃসৃত জল (লালা) ও চন্দ্রের অমৃত ছিল।

এই অভিষেকের জল মাথায় পড়ে সেখান থেকে গড়িয়ে যেখানে সঞ্চিত হয়েছিল, সে এই পঞ্চনাথী।

উক্ত চার প্রকারের পবিত্র জল ছাড়া আর একপ্রকারের পবিত্র বারি এর সংস্পর্শে আছে। এ সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে যে, তিরুবাদীর সন্নিকটস্থ শিয়ালী নামক স্থানে একসময়ে ইন্দ্রের কানন ছিল। বৃষ্টির অভাবে ইন্দ্রের এই প্রিয় কাননের একবার সমূহ ক্ষতি হয়। তখন নারদ ইন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন যে, পথিয়ম পাহাড়ে অগস্ত্যমুনি কমণ্ডলুতে জল রেখে দিয়েছেন, সেই কমণ্ডলুর জল যদি কোনরকমে মাটিতে পড়ে, তা হলে নদীধারা প্রবাহিত হয়ে তোমার প্রিয় কানন বাঁচবে।

ইন্দ্র তখনই গরুর মূর্ত্তি ধরে অগস্ত্যের কমণ্ডলুতে জলপানের জন্য গিয়ে উপস্থিত হলেন। অগস্ত্য গরুটিকে তাড়া করতেই কমণ্ডলু কাত হয়ে পড়ে গেল এবং সেই প্রবাহিত জলধারাই কাবেরী নামে প্রখ্যাত এই জলধারার সংস্পর্শ পঞ্চনাথীতে আছে বলে শোনা যায়।

চৈতন্য-চরিতামৃতের গ্রন্থকার এই ত্রিনন্দীকেশ্বরকে "গো-সমাজ শিব" বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ, উক্ত গ্রন্থে দেখি, মহাপ্রভু চিদম্বরম্ হয়ে শিয়ালীর ভৈরব দর্শন করেন, তারপর কাবেরী নদী-তীরে "গো-সমাজ শিব" দেখেন।

"গো-সমাজ শিব" নামের উৎপত্তির কারণ মনে হয়, ইনি ত্রিশূলীর গোমুখ সন্তান ত্রিনন্দীর ঈশ্বর বলে।

গোবিন্দ দাস তিরুবাদীকে "ত্রিবাদী" বলে উল্লেখ করেছেন এবং এর স্থান নির্দ্দেশ করেছেন, শ্রীরঙ্গমের কাছে।

তিরুবাদীকে এখানকার স্থানীয় লোক কেউ কেউ 'তিরুবইয়ার'ও বলেন। এই নামটি বোধ হয় চলিত কথায় বলা হয়। যেমন কলিকাতাকে আমরা কোলকাতা বলি।

তিরুবাদী থেকে সেলুনে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে গেল। বিকেলে বড় দুর্গে (বৃহদীশ্বরের মন্দিরের পাশে বলে যাকে উল্লেখ করেছি) পুরাতন কীর্ত্তি ও ধ্বংসাবশেষ দেখতে গেলাম।

প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে বিজয়নগরের নায়কেরা এখানে রাজত্ব করতেন, তারপর মহারাষ্ট্রীয় ভোঁসলা বংশীয় রাজারা এখানে রাজত্ব করেছিলেন। এই হল এর পূর্ব্ব ইতিহাস।

পরিখার ওপর দিয়ে দুর্গের ভেতরে পৌঁছে একটি বিরাট প্রাসাদ দেখলাম। শুনলাম, এর নির্ম্মাতা রাজা বিজয় রাঘব।

প্রাসাদের দু'পাশে দুটি গোপুরের মত উঁচু স্থান।

রাও বললেন, "এর একটিতে বসে রাজা শত্রুর আক্রমণ, তাদের গতি-বিধি প্রভৃতি লক্ষ্য করতেন, আর একটিতে প্রত্যহ দাঁড়িয়ে প্রভাতে ভক্তপ্রাণ মহারাজা শ্রীরঙ্গমের মন্দিরচূড়া দেখে শ্রদ্ধাবিগলিতচিত্তে প্রণাম করতেন।

এই শ্রীরঙ্গমের কথা পরে ত্রিচিনপল্লীতে বলব।

প্রাসাদের কাছ থেকে কিছুদূরে একটি বাইশ ফুট লম্বা কামান রক্ষিত আছে দেখলাম। এই কামানটি শিবাজীর ছিল।

এমন ধাতুতে এটি নির্ম্মিত যে, আজো বৃষ্টিধারা, সূর্য্যতাপ, কালের প্রভাব প্রভৃতি কিছুই একে মলিন করতে পারে নি।

প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ কোরে তাঞ্জোরের শেষ রাজা শিবাজীর দরবার-গৃহ দেখলাম। দেওয়ালে দেওয়ালে সাজানো রয়েছে রাজার পূর্ব্বপুরুষদের ছবি—যেন জীবন্ত কীর্ত্তিগাথা।

যেখানে শিবাজী বসে বিচার করতেন, সেইখানের পাথরের সিংহাসনটি দেখিয়ে রাও বললেন, "এখানে একখানি সোনার সিংহাসন ছিল; সেখানি ভারত সরকার অধিকার কোরে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছেন; তার বদলে এইটি এখানে আছে।"

রাজপ্রাসাদ—তাঞ্জোর

বাইরের অস্তগামী সূর্য্যের মত এই বিলীয়মান ধ্বংসাবশেষের ম্লান রশ্মিরেখা দেখে মনটা বিমর্ষ হয়ে গেল। বিভগ্ন প্রাসাদের ম্রিয়মান অতীত কীর্ত্তির সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি আর মন একান্ত হয়ে উঁকি দিলে সেই চারশ বছর আগেকার উদীয়মান কীর্ত্তি-গৌরবের

সমুজ্জ্বল অধ্যায়ে। শতাব্দীর সহস্র জাল ছিন্ন কোরে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগান্তরের পরিবেশকে ডিঙিয়ে সব এক এক কোরে যেন আমার সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল। সাহাজী, তুকাজী, সরকোজী, শিবাজী, শম্ভুজী—সবাই এলেন। মনে হল, "নহে এরা মূক মৌন পটে আঁকা ছবি—।"

মনে হল এঁরা মরেন নি—সবাই আজো বেঁচে আছেন। এই ভগ্ন প্রাসাদের পাঁজরে পাঁজরে এঁদের আত্মা অবিরত আছড়ে মরছে নিষ্ফল আক্রোশে, মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায়। মনে হল, দেশের, জাতির, মানুষের স্বাধীনতার জন্য আবার এঁরা অস্ত্র ধরেছেন, কোষমুক্ত তরবারী আবার সূর্য্যালোককে ব্যঙ্গ কোরে ঝলসে উঠছে। ওই ত সেই জীজাবাই, ওই ত তিনি শিবাজীর প্রশস্ত-ললাটে পৃথিবীর প্রথম প্রভাতে নব সূর্য্যের আশীর্ব্বাদের মত তিলক এঁকে দিচ্ছেন।

ঐ তো মারাঠার বীরত্ব হুঙ্কার......ওই ত তারা শিবশম্ভু নাম উচ্চারণ কোরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।......"দংশনক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ যেন যুঝে ভুজঙ্গ সনে।"......

মুহূর্ত্তের জন্যে......তারপর আবার ফিরে এলাম বর্ত্তমানে...... বেদনামুখর বাস্তবে। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে মনটা বারবার কোরে বলতে লাগল, "কথা কও, কথা কও—হে অতীত, কথা কও।"

ঘোরটা তখনো ভালো করে কাটেনি।

রাও বললেন, "চলুন, সারস্বত মহল দেখবেন।"

রাজপ্রাসাদের একাংশে সারস্বত মহল দেখতে গেলাম।

সারস্বত মহল একটি বিরাট গ্রন্থাগার। তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় হাতে-লেখা আঠারো হাজার পুঁথি এখানে আছে।

উঁকি মেরে থরে থরে সাজান পুঁথিগুলি দেখতে লাগলাম। কালের প্রভাবে পুঁথিগুলির রঙ হয়ে গেছে হল্‌দে……স্থানে স্থানে কালো—যেন বয়সের ছোপ লেগেছে। দেখতে দেখতে মনে হল, কতো বছর আগেকার চিন্তাধারা এর ভেতর সঞ্চয় করা আছে। কতো মহার্ঘ্য, অমূল্য কাহিনী যে লিপিবদ্ধ করা আছে, তা কে বলতে পারে! কতো মহর্ষি, কতো পণ্ডিত, কতো চিন্তাশীল ব্যক্তিরা হয়ত রাতের পর রাত জেগে পর্ণকুটিরে বসে মৃদু প্রদীপের আলোয় এই প্রখর ভুর্জ্জপত্রে বা তালপত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন!

দেশের কীর্ত্তি, জাতির কীর্ত্তি, মানুষের কীর্ত্তি প্রভৃতি কতো কীর্ত্তিগাথার কীর্ত্তনই না আছে এতে! চিন্তাধারার মৌলিক গবেষণায় এর প্রতি পৃষ্ঠা হয়ত অলঙ্কৃত। অথচ আমরা……

ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম সেলুনে।

তাঞ্জোরের আনন্দ অক্ষয় হয়ে রইল মনের ইতিহাসে, তীর্থপর্য্যটন-কাহিনার সমগ্র অধ্যায় জুড়ে।

---

# ত্রিচিনপল্লী ও শ্রীরঙ্গম্

ত্রিচিনপল্লী মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীব একটি জেলা। এই জেলাটিব নামেই প্রধান নগবেব নাম। জনপ্রবাদ আছে যে, পুবাকালে 'ত্রিশিরা' নামে এক দুর্দ্দান্ত বাক্ষস এখানে বাস করত। সুববত্তিদান নামে এক সাহসী বীব এই ত্রিশিবাকে নিধন কোরে

ত্রিচিনপল্লী সহরেব রাস্তা

এই স্থানকে নির্ভয় কবে। তারপর থেকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ এখানে জন-বসতি হয, এবং ত্রিশিবাব নামেব আঁচ পাওযা যায় এই ত্রিচিনপল্লী নামে।

ত্রিচিনপল্লী নামের অর্থ হচ্ছে, পবিত্র-ক্ষুদ্র নগর। ত্রি = শ্রী

বা পবিত্র ; 'চিন্' কথাটি 'চিন্না' কথার অপভ্রংশ, অর্থ—ক্ষুদ্র ; পল্লী অর্থে নগর বা জনপদ।

এখানে সুব্রহ্মণ্য দেবের অর্থাৎ দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকের যে মন্দির আছে. লোকে বলে ইনিই নাকি সুরবত্তিদান, যিনি ত্রিশিরা রাক্ষসী নিধন কোরে এই স্থানটিকে বাসযোগ্য ও নিরাপদ করেন। এ কিংবদন্তীর মধ্যে সত্য আছে বলে অনুমান করা মোটেই আশ্চর্য্যের নয়। কারণ, ত্রিশিরার কাহিনীর মধ্যে ওই প্রকারের আভাষই পাওয়া যায়।

ইতিহাসে পাই, এক সময় চোল-রাজগণ এখানে রাজত্ব করতেন। অশোক রাজের যে অনুশাসন-লিপি মগধে খোদিত আছে, তার মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিকরা চোল-রাজার নাম আবিষ্কার করেছেন।

সে সময়ে উরেয়ূর সহরে এদের রাজধানী ছিল। উরেয়ূর সহর এখনো আছে এবং বহু লোক এখানে বাস করে। ত্রিচিনপল্লী সহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় এক মাইল হবে। ত্রিচিনপল্লী এককালে দক্ষিণ-ভারতের যুদ্ধস্থান বলে প্রসিদ্ধ ছিল।

ইংরাজ, ফরাসী, মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতির অনেকানেক যুদ্ধ এখানে হয়েছে। ত্রিচিনপল্লীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কাহিনী দীর্ঘ এবং শতকাংশে জটিল।

আন্দাজ ১৭২০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বিজয়নগরের রাজা অচ্যুত রায় তাঁর শ্যালক সেবাপ্পা নায়ককে তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লীর শাসনভার দেন। এই সময় মাদুরার শাসনকর্ত্তা

বিশ্বনাথ নায়ক ত্রিচিনপল্লীর রাজার সঙ্গে একটি বিনিময় বন্দোবস্ত করেন। ফলে, বন্নাম দুর্গের অধিকার পান ত্রিচিনপল্লীর রাজা এবং এর পরিবর্ত্তে বিশ্বনাথ নায়ক পান ত্রিচিনপল্লী। বিশ্বনাথ নায়ক তেজস্বী, বীর-পুরুষ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। এঁরই আগ্রহে ও তত্ত্বাবধানে শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরের সংস্কার সাধন হয়।

এই সময় কাবেরী নদীর উভয় তীরের জঙ্গল কেটে নতুন চাষ-আবাদ আরম্ভ হল এবং ব্রাহ্মণদের জন্য তৈরী হল কয়েকটি আবাস।

বিশ্বনাথ নায়ক নিজে উদ্যোগী হয়ে এই স্থানে যাতে জনপদ গড়ে ওঠে, তার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ধার্ম্মিক রাজার সুবিস্তৃত সুখ্যাতি ছিল; সুতরাং ক্রমে ক্রমে দেশ-বিদেশ থেকে গুণী, জ্ঞানী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি নানানপ্রকারের লোকের সমাগম হতে লাগল; এবং এরাই উত্তরকালে শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে ত্রিচিনপল্লীকে সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত করলেন। মোটামুটি এই প্রকারের ঘটনাই ত্রিচিনপল্লীর জটিল ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হয়। আধুনিককালে সমস্ত প্রকারের সুবিধার দিক দিয়ে ত্রিচিনপল্লী দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত সহর। মান্দ্রাজ সহরের পরেই এর নাম করা যায়। পূর্ব্বে এখানে ইংরাজদের অধীনে একটি ভারতীয় সৈন্যাবাস ছিল। সহরের লোকসংখ্যা প্রায় বাইশ হাজার —তার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, বাকী সবই হিন্দু। ক্রিশ্চিয়ানদের একটি সুন্দর মিশন এখানে আছে। তা ছাড়া,

দক্ষিণ-ভারত রেল কোম্পানীর প্রধান আফিস এই ত্রিচিনপল্লী সহরে। মনে আছে বোধ হয়, "সা ওয়ালেস-"এর সামনার সাহেবকে দিয়ে আমরা এইখানেই সেলুন ঠিক করবার জন্য চিঠি লিখিয়েছিলাম।

এ অঞ্চলের সব জায়গার মত তাল-নারিকেল গাছ এখানে প্রচুর। আম-কাঁঠালের আবাদ, ধানের চাষও খুব হয়। তা ছাড়া, তামাকের চাষের জন্য ত্রিচিনপল্লী বিখ্যাত; খুব বেশী পরিমাণে হয়। সহরের ভেতর এর আশে-পাশে অনেক চুরুট প্রস্তুতের কারখানা আছে। এখানকার পাহাড়তলীতে আর একটি জিনিষের চাষ হয়—সেটি কফি।

গত কাল রাত্রে আমরা ত্রিচিনপল্লী স্টেশনে এসে পৌঁছেচি। রাত্রিটা স্টেশনেই কাটল। সকাল দশটা নাগাদ আমরা ভারত-বিখ্যাত শ্রীরঙ্গম্ দেউল দর্শনে যাত্রা করলাম। স্টেশন থেকে মন্দিরের দূরত্ব প্রায় আট মাইল।

পথে মোটর থামিয়ে আমরা কাবেরী জলস্পর্শ কোরে নিলাম।

শ্রীরঙ্গমের দক্ষিণ ও প্রধান গোপুর দ্বারে পৌঁছে দেখলাম, সেটি বন্ধ—সংস্কার হচ্ছে; সুতরাং, একটু ঘুরে পূর্ব্ব গোপুর দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলাম।

সমস্ত মন্দিরের পরিধি প্রায় দু মাইল ব্যাপী।

পুষ্করিণীর উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করলে যেমন ছোট ছোট বৃত্ত-কুণ্ডলী ক্রমবর্দ্ধমান বৃত্ত রচনা কোরে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি ভাবের সাতটি প্রাকার-বৃত্ত এই মন্দিরটিকে বেষ্টন কোরে আছে;

এবং প্রথম বৃত্ত প্রাকারের চেয়ে অভ্যন্তরের প্রাকারগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট বৃত্ত রচনা করতে করতে কেন্দ্রস্থ হয়েছে মূল মন্দিরে গিয়ে। মূল মন্দিরটি ওঁকার আকারে তৈরী। মনে হল ওঁকার— যিনি ব্রহ্ম, অর্থাৎ আদি বিন্দু—তাঁকে কেন্দ্র কোরে যেমন সমস্ত পৃথিবী-বৃত্ত সৃষ্ট হয়েছে, এই মন্দির প্রাকার ও কেন্দ্রস্থ মূল মন্দিরটি যেন সেই সৃষ্টি রহস্যের প্রতীক।

শ্রীরঙ্গম্—রঙ্গনাথ স্বামীর মন্দিরের গোপুরম্

ভেতরে প্রবেশ কোরে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। এ যেন আলাদা জগত! এদেশে কোন কিছুরই অভাব নেই। ইচ্ছে করলে এইখানে নিরুদ্বেগে বাস করা যায় যতদিন ইচ্ছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—এই তিনটি প্রাকারে বাজার, দোকান প্রভৃতি সমস্তই আছে, এখানে পাওয়া যায় না, এমন বস্তুই নেই। এটিকে ত্রিচিনপল্লীর অন্তর্গত একটি সহর বললেই হয়।

শুধু দোকান-পাটই নয়, হাজার হাজার লোক এই শ্রীরঙ্গমের মন্দির-প্রাকারে বছরের পর বছর ধরে বাস করছে— পুত্রপৌত্রাদি সমভিব্যাহারে, ভোগদখল সর্ত্ত নিয়ে।

চতুর্থ প্রাকারের প্রবেশদ্বার অর্থাৎ গোপুরটি অতি দীর্ঘ— উচ্চতায় হবে ১৫০ ফিট। কুম্ভকোনামে গোপুর দেখেছিলাম ১২৮ ফুট, আর এখানে দেখলাম ১৫০ ফুট। তখন ভেবেছিলাম, কুম্ভকোনামের গোপুরই বুঝি সবচেয়ে উঁচু, কিন্তু এখন দেখলাম, তা নয়। শ্রীরঙ্গমের চতুর্থ প্রাকারের গোপুর একেও অতিক্রম করেছে।

এই চতুর্থ প্রাকার থেকে কড়া পাহারা আছে বরাবর, যাতে হিন্দু ব্যতিরেকে অন্য কোন জাতি না প্রবেশ করতে পারে। সামনের তিনটি প্রাকারে দোকান-পাট, বাজার প্রভৃতি ; কাজেই সেখানে সকলের অবাধ গতি, কোন নিয়মাদি নেই।

মন্দির-কমিটির ম্যানেজার আমাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রথমে তিনি আমাদের লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে নিয়ে গেলেন। দেবীর নাম "রঙ্গনায়কী"। আরো দুটি সখী বা সপত্নীর মূর্ত্তি এঁর সঙ্গে রয়েছে। এদের নাম, "ভূমি দেবী" ও "শ্রী দেবী"। এখানকার প্রাঙ্গণে একটি সুপ্রাচীন বেলগাছ দেখলাম। দূরে একটি তুলসীমণ্ডপও আছে। বেলগাছটি পুরোনো হলেও ফলসম্ভারে শ্রীসম্পন্ন। তবে, বহুদিনের পুরাতন হওয়ার জন্য ফলের আকার বেশ একটু ছোট। এখানে দর্শন অর্চ্চনা, কর্পূরারতি প্রভৃতি শেষ কোরে আমরা রঙ্গনাথ স্বামীর মূল-মন্দির দেখতে গেলাম।

রঙ্গনাথ স্বামীর মন্দিরের সামনে একটি প্রস্তরের গরুড়-মূর্ত্তি। ভক্তিনত, কৃতাঞ্জলিবদ্ধ মূর্ত্তিটি দেখলে সত্যিই ভাবের উদ্রেক হয়। আর একটু তফাতে হনুমানজীর মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তিটি গরুড়-মূর্ত্তির চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট।

মন্দিরের ওপরে চারিটী সোনার কলস দেখলাম। মন্দির-সমিতির ম্যানেজার বললেন, ওগুলি চতুর্ব্বেদের নিদর্শনস্বরূপ।

মন্দিরের ঠিক চূড়ার কাছে সোনার বিষ্ণুমূর্ত্তি। এইটির নাম শুনলাম, "আদিমূর্ত্তি।" মন্দিরের ভেতরে রঙ্গনাথস্বামী নাগ-কুণ্ডলীর মধ্যে অনন্ত-শয়নে শায়িত। মাথার ওপর শেষনাগের বিস্ফারিত সপ্তফণা ছত্রের মত শোভা পাচ্ছে।

কাছেই ভোগমূর্ত্তি দেখলাম। ভোগমূর্ত্তি দণ্ডায়মান অবস্থায়—মূলমূর্ত্তির চেয়ে অনেক ছোট।

যথাবিহিত রঙ্গনাথ স্বামীর অর্চ্চনা-আরতি প্রভৃতি সারা হবার পর মন্দির-সমিতির ম্যানেজার আমাদের সঙ্গে করে মন্দির আপিসে নিয়ে গেলেন।

এখানে রঙ্গনাথ স্বামীর অলঙ্কার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি দেখলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, "এ সবের আন্দাজ মূল্য কত হবে?"

বললেন, "প্রায় আড়াই কোটি টাকা। উৎসবের সময় এই সমস্ত গহনা পরিয়ে শোভাযাত্রা করে ঠাকুরকে চতুর্থ প্রাকারের দ্বার অবধি নিয়ে যাওয়া হয়।"

এঁর মুখে শুনলাম, মাঘ মাসে একাদশীই এখানকার সবচেয়ে

বড় উৎসব। মন্দির প্রাকারের মধ্যে একটি দ্বার আছে। এই দ্বারটি সমস্ত বছর বন্ধ থাকে, কেবল মাঘ মাসের ওই নির্দ্দিষ্ট একাদশীর দিন খোলা হয় এবং রঙ্গনাথের শোভাযাত্রা এই দ্বার অতিক্রম করে। লোকে বলে, এই দ্বারটি "বৈকুণ্ঠ-দ্বার" এবং এই দ্বার দিয়ে ঠাকুর সেদিন বৈকুণ্ঠধামে যান। সেইজন্য ওখানকার লোকেরা ঐ একাদশী তিথিকে "বৈকুণ্ঠ একাদশী" বলে। আমাদের দেশে বৈকুণ্ঠ একাদশী বলে কোনও একাদশীর বর্ণনা নাই। বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশী আছে, তাও কার্ত্তিক মাসে হয়।

এখানে আর একটি নিয়ম শুনলাম, যা এর পূর্ব্বে এ অঞ্চলের আর কোথাও শুনি নাই। রাও বললেন, "রঙ্গনাথের ভোগমূর্ত্তির উৎসব ও শোভাযাত্রা যখন হয়, তখন লক্ষ্মীদেবী অর্থাৎ রঙ্গনায়িকা সঙ্গে থাকেন না।

মন্দির-সমিতির ম্যানেজারও এই উক্তির সমর্থন করলেন।

মনে মনে ভাবলাম, এর একটা কারণ হতে পারে। লক্ষ্মীকে সচরাচর "চঞ্চলা" বলে বর্ণনা করা হয়; সেই অপবাদ খণ্ডাবার জন্যেই রঙ্গনাথ বোধ হয় লক্ষ্মীকে স্থানচ্যুত না কোরে অর্থাৎ তাঁকে "অচলা" কোরে শোভাযাত্রায় বেরোন।

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা মন্দিরের চারিধার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। এতো বিস্তৃতি এই মন্দিরের যে, দু-তিন দিন ধরে দেখলেও শেষ হয় না। কিন্তু আমাদের সময় অল্প, সুতরাং যতদূর সম্ভব দেখে নিলাম।

চারিদিকে ছোট-বড় দেব-দেবীর মূর্ত্তি যে কতো আছে, তা

গণে শেষ করা যায় না। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মূর্ত্তি যে ক'টি দেখেছিলাম, তার মধ্যে মনে আছে—গরুড়, নৃসিংহ, প্রহ্লাদ, কোদণ্ডধারী রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির প্রস্তর-মূর্ত্তি।

ম্যানেজার মশায় সঙ্গে কোরে মন্দিরের হাতীশালায় নিয়ে গেলেন। বেশ সুন্দর এবং বড় হাতীশালাটি।

হাতীশালার সামনে উপস্থিত হওয়া মাত্র হাতী শুঁড় তুলে আমাদের অভিবাদন করলে। অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা করার এই প্রথা।

এখানে মন্দির-সংলগ্ন ধানের গোলা দেখলাম। খড়ের মরাই ও পাকা মরাই, দুইই এখানে আছে। গোশালায় চোদ্দ-পনেরটি গরু আছে। দেবতার প্রয়োজন মত যতটুকু দুধ খরচ হয়, ততটুকুই দোহন করা হয়, বাকীটুকু বৎসদের খাওয়ান হয়।

অলিন্দের এক জায়গায় একটি সমাধি দেখা গেল। জিজ্ঞাসা কোরে জানলাম, এটি কবি কামবারের সমাধি। কবি কামবার এ অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কবি তুলসীদাসের মত প্রসিদ্ধ। তামিল ভাষায় রচিত কামবারের রামায়ণ প্রত্যেক গৃহস্থ পাঠ করে।

রাও এই মন্দির সম্বন্ধে একটি প্রবাদ বললেন।

একজন চণ্ডাল এক সময়ে রঙ্গনাথ স্বামীর পরম ভক্ত ও সেবক ছিল। কিন্তু, অধুনা অস্পৃশ্য বলে চণ্ডালকে এ মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। * এ সংবাদে মনটা একটু বিমর্ষ হয়ে গেল।

* আজকাল দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অনেক মন্দিরে মহাত্মা গান্ধীজীর প্রভাবে হরিজনদের অবারিত দ্বার; কিন্তু এখানেব ব্যবস্থাপকেরা পূর্ব্বপ্রথা রক্ষা করিতেছেন।

মনে মনে বললাম, চণ্ডাল বলে তাদের কি ভক্তি থাকতে নেই ? তাদের যদি ভক্তি ও দর্শনাকাঙ্ক্ষা থাকে তো সে ভক্তিকে, সে আগ্রহকে এমন কোরে শৃঙ্খলিত করবার অধিকার কারো নেই, থাকতেও পারে না।

মন্দির প্রাকারগুলি পার হয়ে বাইরে আসবার সময় মনে হল ভক্তমাল গ্রন্থে পড়েছিলাম, এই ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত অপূর্ব্ব মন্দির ( মূলমন্দির নয় ) তৈরী করেছিলেন ভক্ত তিরুমঙ্গই আলোয়ার। চারজন শিষ্য সঙ্গে নিয়ে অলৌকিক উপায়ে তিনি অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। এই শিষ্যেরা এক একজন এক একটি বিদ্যা জানত। একজন জানত, কেমন কোরে ফুঁ দিয়ে চাবি খুলতে হয়, একজন জানত মানুষের ছায়ার ওপর পা দিয়ে তার গতিরোধ করতে, আর একজন জানত জলের ওপর দিয়ে অবাধে হেঁটে যেতে ইত্যাদি।

এই তিরুমঙ্গই আলোয়ারের কাল ছিল অষ্টম শতাব্দী।

তা হলে কতো পুরাতন এর শিল্প ও ভাস্কর্য্য, তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। এতো পুরোণো, কিন্তু এমন অপূর্ব্ব এ নির্ম্মাণ-কৌশল যে, এর জীবনের ওপর দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী পা ফেলে ফেলে চলে গেছে, অথচ কালের এতোটুকু ছাপ কি কোথাও লাগেনি ! অচিন্তানীয় বিস্ময় ছাড়া আর কি বলা যায় !

শুনলাম, এই মন্দিরটি তৈরী করতে পূরো ষাঠ বছর সময় লেগেছিল।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এ মন্দির দর্শনে এসেছিলেন। গোবিন্দ-দাসের কড়চায় আছে, নৃসিংহ ও প্রহ্লাদের মূর্ত্তি দেখে তাঁর

ভাবাবেশ হয়েছিল। বলা বাহুল্য, রঙ্গনাথদর্শনের কথাও চরিতামৃতে আছে।

মহাপ্রভু এখানে বেঙ্কট ভট্ট নামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের ভিক্ষা গ্রহণ ও চাতুর্ম্মাস্য করেছিলেন। ভট্ট শৈব ছিলেন বলে শোনা যায়। মহাপ্রভুর সঙ্গে নানান শাস্ত্রালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর তিনি প্রভুর পরম ভক্ত ও বৈষ্ণব হলেন।

ঘটনাটি রাওকে বলতেই তিনি বললেন, "ওই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বেঙ্কটভট্টের বংশাবলী এখনো এ অঞ্চলে আছে এবং এমন বৈষ্ণবও দেখা যায়, যারা বেঙ্কট ভট্টের শিষ্য বলে পরিচয় দেন। এঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব। রামানুজ মতাবলম্বী ন'ন।

আর একটি কথা। মাননীয় অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দে মহাশয় তাঁর "গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী" গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন, "এখানে (অর্থাৎ শ্রীরঙ্গমে) জম্বুকেশ্বর নামা বিখ্যাত শিব আছে।"

জম্বুকেশ্বরের বিবরণ আমরা পরে দেব। জম্বুকেশ্বর শ্রীরঙ্গমে নয়, এর দু ক্রোশ দূরে, দক্ষিণ-পূর্ব্বে। এ ছাড়া, অপর কোন শিবের মূর্ত্তিও আমরা শ্রীরঙ্গমে দেখতে পাই নি।

সেলুনে ফেরবার আগে এখানকার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কিছু কিনব বলে দোকানে ঢুকলাম। এখানকার বেতের জিনিষগুলি চমৎকার; সুতরাং, বেতের জিনিষ দু-একটি, কয়েকটি রূপার ছোট ছোট খেলনা ও চন্দন কাঠের উপর দেব-দেবীর কয়েকটি প্রতিকৃতি কিনলাম।

ঠিক হলো, বৈকালে জম্বুকেশ্বর শিবমন্দির দেখতে যাব।

## জম্বুকেশ্বর

জম্বুকেশ্বর মন্দির শ্রীরঙ্গম স্বামীর মন্দির থেকে আরো চার মাইল দূরে। এবারেও যাবার সময় পথে কাবেরীতে জল স্পর্শ কোরে নিলাম।

ফারগুসন সাহেবের মতে জম্বুকেশ্বরের মন্দির ১৬০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে প্রস্তুত। মন্দিরের কারুকার্য্য প্রভৃতি দেখে ফারগুসন হয় ত, এই ধারণায় উপনীত হয়ে থাকবেন, কিন্তু মন্দিরস্থিত দেবতা বহু পুরাতন, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, রামানুজাচার্য্যের জীবনীতে আমরা জম্বুকেশ্বরের উল্লেখ দেখি।

শুনলাম, জম্বুকেশ্বর শিবের বহু ভূসম্পত্তি ছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সেগুলি অধিকার কোরে তার পরিবর্ত্তে বছরে নশো পঞ্চাশ টাকা কোরে দেবার বন্দোবস্ত করেছেন। সুতরাং, এখন এই টাকা থেকেই জম্বুকেশ্বরের ব্যয়ভার বহন করা হয়।

এখানেও মূলমন্দিরের সামনে পৌঁছবার আগে পর পর পাঁচটি প্রাকার পার হতে হয়। তবে প্রাকারাভ্যন্তরস্থ স্থানগুলি শ্রীরঙ্গমের মত অতো বিস্তৃতও নয়, আর গঠন-ভঙ্গিও ও-প্রকারের নয়।

এখানে শিবলিঙ্গ হচ্ছেন "অপ-লিঙ্গ"। 'ক্ষিতাপতেজো মরুৎ ব্যোম' প্রভৃতির মধ্যে তিনটি আমরা এর পূর্ব্বে দেখেছি।

কালহস্তীতে মরুৎলিঙ্গ, চিদম্বরে ব্যোমলিঙ্গ ও শিবকাঞ্চীতে ক্ষিতিলিঙ্গ আর ত্রিচিনপল্লী অঞ্চলে এই অপলিঙ্গ (জম্বুকেশ্বর) দেখলাম। এখন বাকী রইল তেজলিঙ্গ।

এখানে একটি বহু পুরাতন জামগাছ দেখলাম। পূজারী বললেন, "প্রথমে এরই তলায় শিব আবির্ভূত হন।"

তাই বোধ হয় এঁর নাম "জম্বুকেশ্বর"। মন্দিরের গায়ে মাকড়সা ও হাতীর ছবি দেখে কালহস্তীর কথা মনে হল। এর কারণ জিজ্ঞেস করতেই পূজারী একটি গল্প বললেন। সেটি এই:—

প্রথমে এই জম্বুবৃক্ষতলে শিব যখন প্রকট হন, সেই সময় একটি মাকড়সা দেখলে যে, মহাদেবের মাথায় কোন আচ্ছাদন নাই। সুতরাং, সে জাল বুনে বুনে এই শিবের মাথায় একটি আচ্ছাদন কোরে দিলে।

কিন্তু পরের দিন এ আচ্ছাদন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। কারণ, একটি হাতী প্রত্যহ শুঁড় দিয়ে মহাদেবের জলাভিষেক করত। হাতীর শুঁড়ের ঘায়ে জাল ছিঁড়ে গেছে দেখে মাকড়সা হাতীকে দংশন কোরে যত বিষ তার দেহে ছিল, সবটুকু প্রয়োগ করলে। হাতী সে যন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য কোরে মাকড়সাকে দু পায়ে চেপে নিষ্পিষ্ট কোরে ফেললে। মাকড়সার মৃত্যুর কিছু পরে হাতীও বিষের ক্রিয়ায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল।

তখন মহাদেব আবির্ভূত হয়ে ভক্ত দুটিকে পুনর্জীবন দান কোরে এই কাহিনী যাতে প্রচার হয়, সেই উদ্দেশ্যে নিজের কাছে

রেখে দিলেন। সেইজন্য মন্দিরের দ্বারের কাছে এই উভয় ভক্তের মূর্ত্তি খোদাই করা আছে।

এখানে মন্দিরের ভেতর অপলিঙ্গে চারি পাশের মেঝে সর্ব্বদাই জলে পরিপূর্ণ। শুনলাম, কাবেরী সংযুক্ত একটি কূপ মন্দিরের ঠিক লিঙ্গ-মূর্ত্তির নীচে আছে। ঐ কূপ থেকে অবিশ্রান্ত জল ওঠে। এই জল-সেচন কাজের জন্যে সর্ব্বদা লোক নিযুক্ত আছে। তারা সঙ্গে সঙ্গে জল সেচন কোরে ফেলছে, যাতে মন্দিরের মেঝে জলে একেবারে উপচে না ওঠে।

প্রাঙ্গণে পার্ব্বতী দেবীর মূর্ত্তি আছে—নাম "অখিলেশ্বরী"। শুনলাম, পার্ব্বতী মহাদেবের জন্য এখানে এখনো তপস্যারতা।

জম্বুকেশ্বরের মন্দিরটি রঙ্গনাথের মন্দিরের চেয়ে ছোট হলেও এক এক জায়গায় শিল্প-নৈপুণ্য ও ভাস্কর্য্য রঙ্গনাথের মন্দিরের অপেক্ষা কোনও অংশে কম নয়।

জম্বুকেশ্বর দর্শন সাঙ্গ কোরে আমরা ত্রিচি শৈল বা রক্ টেম্পল দেখতে গেলাম।

* * * *

ত্রিচি শৈলটি দুশো তিয়াত্তর ফিট উঁচু। পাহাড় কেটে কেটে শৈলশিখরে ওঠবার জন্যে সিঁড়ি তৈরী আছে।

হেঁটে ছাড়া ওঠবার আর কোনও উপায় নেই।

সামর্থ্য তেমন অনুকূল না হলেও আস্তে আস্তে উঠতে আরম্ভ করলাম। পাহাড়ে-সিঁড়ি ; কাজেই, গোটা কয়েক সিঁড়ি
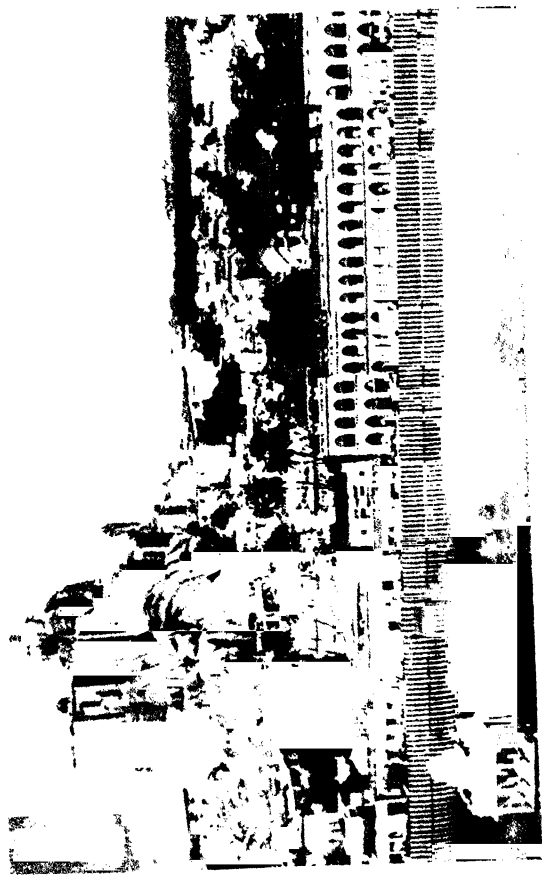
ত্রিচি শৈল মন্দির ও তার নীচেকার দৃশ্য—পৃঃ ১৬৮

ওঠবার পরেই বিশ্রামের প্রয়োজন হল। এখানকার সিঁড়িগুলি এমনভাবে তৈরী যে, ক্লান্ত যাত্রীরা ইচ্ছে করলে বিশ্রাম কোরে নিতে পারেন। এমনি কোরে বিশ্রাম করতে করতে একটি মণ্ডপের কাছে পৌঁছুলাম।

এ মণ্ডপে একশটি স্তম্ভ। স্তম্ভ বলতে এ অঞ্চলে মোটেই মসৃণ থাম বোঝায় না। কিছু না কিছু কারুকার্য্য এই সব স্তম্ভ-গাত্রে আছেই। তা ছাড়া, দেওয়ালের গায়ে অনেক দেব-দেবীর চিত্র উৎকীর্ণ।

এখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেওয়ালের ছবিগুলি দেখে আবার উঠতে আরম্ভ করলাম। একশ দশটি সিঁড়ি ওঠবার পর আবার একটি মণ্ডপ গোছের স্থান পাওয়া গেল। এখানেও বহু চিত্র-সম্বলিত দেওয়ালগুলি।

এই দেওয়ালের চিত্রগুলি অবলম্বন কোরে যে কাহিনীটি প্রচলিত আছে, রাও সেটি আমাদের শোনালেন।

কোন সময় রত্নাবলী নামে একটি চেটী বালিকা (চেটী কথাটি বোধ হয় শ্রেষ্ঠী কথার অপভ্রংশ) তার শ্বশুর-গৃহে প্রসব বেদনায় কাতর হয়। সে সময় বালিকা একলা ছিল। কাজেই, এই রকম সঙ্গীন অবস্থা দেখে সে তার মায়ের কাছে সংবাদ পাঠাল। মা ছিলেন কাবেরী নদীর অপর পারে।

কন্যার এই সংবাদে মা তাড়াতাড়ি কাবেরী নদীর তীরে পার হবার জন্যে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু এমন দুর্দ্দৈব যে, ঝড় উঠল প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে, বৃষ্টি নামল মুষলধারে। শান্ত-স্রোতা কাবেরী

উন্মাদ নর্ত্তনে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। এ দুঃসময়ে কোন মাঝিই পারে যেতে চাইল না।

রত্নাবলী তখন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভগবানকে ডাকতে লাগল।

গীতায় ভগবান বলেছেন—

যে "অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে"

তাকেই তিনি করুণা করেন। এখানে যোগ ও ধ্যান বলতে সমগ্রভাবে বোঝাচ্ছে ঐকান্তিকতা ও প্রাণপণ। এই আন্তরিক কণ্ঠে, প্রাণপণ আগ্রহে রত্নাবলী ভগবানকে ডাকতে লাগল। ভগবানের ধ্যান ভাঙল। আপন-ভোলা মহেশ্বরের কানে সংসারের আর কোন আবেদন না পৌঁছোক ভক্তের ডাক ঠিক পৌঁছুবেই। তিনি পার্ব্বতীকে সঙ্গে নিয়ে মাতৃবেশে রত্নাবলীর পর্ণকুটীরে উপস্থিত হলেন।

সকালবেলা সুস্থ প্রসূতিকে রেখে হর-গৌরী বিদায় নিলেন। খানিক পরেই রত্নাবলীর মা এসে পৌঁছুলেন।

সুস্থ কন্যাকে দেখে তাঁর আর আনন্দ ধরে না। রত্নাবলী কিন্তু অবাক হয়ে গেল, বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, "তবে সমস্ত রাত মায়ের মতন কে এমন যত্ন করলে! তুমি নও?"

দু'চোখ দিয়ে রত্নাবলীর আনন্দাশ্রু নামলো। সে তখন বুঝতে পারলে যে, স্বয়ং ভগবান মাতৃরূপে এসে তাকে পরিচর্য্যা কোরে গেছেন। পৃথিবীর পালক যিনি, আর্ত্তের করুণ প্রার্থনা না শুনে তিনি কি থাকতে পারেন?

এই উপরোক্ত গল্পটি চিত্রাকারে পরের পর আঁকা আছে
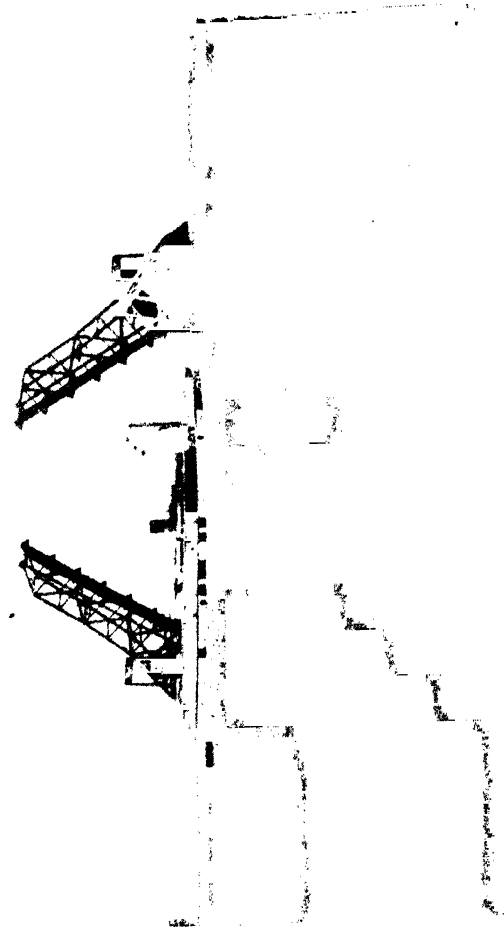
পাম্বাণ-মণ্ডপম্ মধ্যস্থিত সমুদ্র-খাড়ির উপর S. I. R.-এর সেতুর অন্য দৃশ্য—পৃঃ ১৭৩।১৭৪

দেওয়ালের গায়ে। মনে মনে ভাবলাম, মাতৃরূপ ধারণ কোরে আর্ত্তের ডাকে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বলেই বোধ হয় এখানে দেবতার নাম "মাতৃভূদেবেশ্বর"। কেউ কেউ মথুরভূতেশ্বরও বলে থাকেন। মথুবভূতেশ্বব নামটি শিবের নাম বটে, কিন্তু মাতৃভূদেবেশ্বর নামটির সঙ্গে এই কাহিনীর সংযোগ আছে।

শিবানীর নাম এখানে "পর্ব্বতবর্দ্ধিনী" বা "সুগন্ধকুণ্ডলা"।

একশ চল্লিশটি সিঁড়ি অতিক্রম করবার পর রাও বললেন, "আসুন, সকলে এই জানালাব ভেতর দিয়ে ত্রিচিনপল্লী সহরের দৃশ্য দেখুন।"

পর্ব্বতগাত্রের একটি বাতায়ন দিয়ে আমরা সবাই ত্রিচিনপল্লী সহরের দৃশ্য দেখলাম। বড় বড় বাস্তা, বড় বড় বাড়ী, গাছপালা প্রভৃতি সবই যেন ছবির মত। মনে হল, আবো ওপরে উঠলে এ সহরের দৃশ্য বোধ হয় আর দৃষ্টিগোচর হবে না......মন যেন বললে এমনি কোবে মূল আত্মা থেকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি আত্মা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে মানব-দেহ আশ্রয় কোবে কর্ম্মের ভেতর দিয়ে, সংসারেব ভেতব দিয়ে......পার্থিব স্রোতের টানে যতদূর চলে যায়, ততই সে অস্পষ্ট হয়ে আসে, অবশেষে এমনি কোরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাই মানব-দেহ আশ্রয় কোরেও যতো সন্নিকটে, যতো কাছাকাছি সেই ভিন্ন দেহধারী আত্মা থাকতে পারে, ততই তার মঙ্গল। এতে তার বঙও বজায় থাকে, আকৃতি-প্রকৃতিও অপরিবর্ত্তিত থাকে। কাজেই মানুষের উচিত, সেই মূল আত্মার সঙ্গে সংশ্রব রাখা, সেই পরমাত্মাব যত কাছে পারা যায় তত কাছে থাকা।

এই 'কাছে-থাকা'র অনুষ্ঠানের মধ্যেই ভক্তিযোগের জন্ম, কর্ম্মযোগের প্রসার। এরই মূল কথা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মভাব।

১৮৫টি সিঁড়ি ওঠবার পর লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি দেখলাম। ২১৬টি সিঁড়ি পার হয়ে কার্ত্তিক ও দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি দেখে আবার ওপরে উঠতে লাগলাম।

তিনশ ষাটটি সিঁড়ি পার হবার পর মূল মন্দির ( পর্ব্বত-দুর্গ মন্দির বা Rock Fort Temple ) পাওয়া গেল।

এই মন্দিরেই শিবের মাতৃভূদেবেশ্বরের মূর্ত্তি বিরাজমান। এর ওপরেও সিদ্ধিদাতা গণেশের মন্দির আছে শুনে আমরা আবার উঠতে লাগলাম।

এখান থেকে পথটি একটু কষ্টসাধ্য। কারণ, পথ অল্প হলেও সেটি একেবারে খাড়া উঠেছে। পথের দু'পাশে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা, যাতে কোন যাত্রী না পড়ে যেতে পারে।

এখান থেকে শ্রীরঙ্গম্ ও জম্বুকেশ্বরের গোপুর শীর্ষগুলি দেখা যায়। পাহাড় থেকে নামবার আগে যতদূর দৃষ্টি যায়, চারিদিকেব দৃশ্যটি একবার দেখে নিলাম। দূরে বিলীয়মান দিগন্তরেখা, সারি সারি পর্ব্বত, আকাশ প্রভৃতি মিশে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ কোরেছে।

ত্রিচিনপল্লীর রক টেম্পল অপূর্ব্ব। পাহাড়ের ওপর থেকে চতুর্দ্দিকের দৃশ্যও খুবই উপভোগ্য।

সেলুনে ফিরে এসে সেই রাত্রেই আমাদের রামেশ্বর যাত্রা সুরু হল।

---

পাম্বান মণ্ডপম্ খাড়ির উপর রেলওয়ে সেতুর এক দৃশ্য—পৃঃ ১৭৩।১৭৪

# রামেশ্বর

এই প্রথম আমাদের ভ্রমণ-তালিকা অদল-বদল হল। এর পূর্ব্বে তালিকার অনুক্রম অনুযায়ী আমরা দেবালয়গুলি দর্শন করেছি। এখানে আসবার আগে পর্য্যন্তও ঠিক ছিল যে, ত্রিচিনপল্লী সেরে মাদুরায় যাব ; কিন্তু মত বদলাল এই কারণে যে, চব্বিশে ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ আগামী কাল শিবরাত্রি।

পাল পার্ব্বনের ব্যাপার মেয়েদেরই বেশী মনে থাকে। সহধর্ম্মিণীই খবরটা গোচর করলেন। কাজেই রামেশ্বর তীর্থে শিবরাত্রির দিন শিবদর্শনের সুযোগ যখন এতো হাতের কাছে, তখন সৌভাগ্যকে ছাড়তে পারলুম না।

রামেশ্বর যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল গতরাত্রি সাড়ে দশটার সময়। রাস্তায় ট্রেণখানি সময়ের সঙ্গে ঠিকভাবে পাল্লা না দিতে পেরে কিঞ্চিৎ পেছিয়ে পড়েছিল।

সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেই দেখলাম, মণ্ডপ স্টেশন থেকে ট্রেণখানি সবেমাত্র ছেড়েছে। মণ্ডপ স্টেশনের প্লাটফরম পার হবামাত্রই ট্রেণ প্রবেশ করল সমুদ্র-সেতুর ওপর। গাড়ীর গতিবেগ তখন মন্দীভূত হয়ে এসেছে······ শান্ত, মন্থর গমনে মৃদু শব্দ করতে করতে চলল সেতুর ওপর দিয়ে। উঁকি মেরে সেতুর দৈর্ঘ্য দেখবার চেষ্টা করলাম, দেখা গেল না।

রাও বললেন, "সেতুটি লম্বায় প্রায় দু' মাইল হবে।"

নীচের দিকে চেয়ে দেখলাম। মনে হল, ট্রেণটি যেন সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলেছে। আর দেশ-বিদেশের ধূলি-ধূসরিত চাকাগুলি রামেশ্বরের পবিত্র তীর্থে পেঁাছবার আগে সমুদ্র যেন ঢেউয়ের জলোচ্ছ্বাসে ধুইয়ে পবিত্র কোরে দিচ্ছেন। বেশ ভয় করে নীচের দিকে চাইলে, মনে হয় সমুদ্রের ঢেউ বুঝি সব শুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

দু'পাশে চেয়ে দেখলাম। চারিদিকে কেবল জল। ডান-দিকে, বাঁদিকে, যেদিকে চাও, শুধু জল, আর জল। অনেক দূরে, যেখানে দৃষ্টি হারিয়ে যায়......মনে হয়, আকাশ বুঝি ওইখানে ঝুঁকে পড়ে সাগর স্পর্শ করছেন—কিম্বা সমুদ্রের জলরাশি বোধ হয় আকাশের গায়ে গিয়ে পড়ছে। অপূর্ব্ব সে দৃশ্য! হৃদয়-দুয়ার খুলি—সাগরে আকাশে কী গভীর কোলাকুলি!

শুনলাম, রামচন্দ্রের সেতু-বন্ধের এইটি নাকি নমুনা। এই থরে থরে সাজানো পাথরখণ্ডের সুযোগ নিয়ে রেল কোম্পানী সেতু প্রস্তুত করিয়েছেন।

সেতুর ওপারে পাম্বান স্টেশন। সেতুটী যত শেষ হয়ে আসতে লাগল, ততই আমাদের নজরে রামেশ্বর মন্দিরের দৃশ্য স্পষ্টতর হতে লাগল। দু পাশের বাড়ীগুলির মাঝখান দিয়ে সিঁথিপথের মত একটি রাস্তা সমুদ্রের বেলাভূমে এসে মিশেছে। রাস্তার পাশে সমুদ্রের ওপর একটি মণ্ডপ দেখতে পেলাম।

মন্দির-সমিতির সদস্যেরা স্টেশনে আমাদের জন্যে অপেক্ষা

বামেশ্বরের বথ—পৃঃ ১৭৫

করছিলেন। গলায় মালা, কপালে চন্দনের ফোঁটা প্রভৃতি দিয়ে তাঁরা সসম্ভ্রমে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

অভ্যর্থনা-পর্ব্ব শেষ হলে আমরা স্নান সেরে নেবার জন্যে তাড়াতাড়ি করতে লাগলাম।

স্নানের পর মন্দিরে প্রবেশ করেই দেখি কেবল অগণ্য মানুষের মাথা। যেদিকে চাই, সেদিকেই দেখি জন-সমুদ্র।

ভীড়ের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দেখতে পেলাম, রথারূঢ় দেব-দেবীর মূর্ত্তি। সবাই বলছেন রথ চলেছে। রাও বললেন, "এতো ভীড়ের কারণ, রামেশ্বরের রথের দড়ি টানবার আশায়—এ দড়ি স্পর্শ করা নাকি বহু ভাগ্যের ফল।

কিন্তু এই অশেষ, অখণ্ড সৌভাগ্য বুঝি বা ঘটে না। যে ভীষণ ভীড়—সঙ্গে মেয়েরা, আমিও শারীরিক সামর্থ্যে অক্ষম।

মন্দির-সমিতির ম্যানেজার আমাদের এই বাসনা মেটাবার জন্য লোকজন সঙ্গে কোরে ভীড় সরাতে লাগলেন। সে যে কী আয়াস-সাধ্য কাজ, তা চোখে না দেখলে লিখে বোঝান যায় না—বর্ণনাতীত। সমুদ্রের বেলাভূমিতে যেমন তরঙ্গোচ্ছ্বাস অন্ধ উন্মাদনায় উপর্য্যুপরি আঘাত পেতে থাকে, ঠিক তেমনি কোরে জনসমুদ্র রামেশ্বরের রথের কাছি ছোঁবার জন্য আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়তে লাগল। এ যেন "আগে কেবা প্রাণ, করিবেক দান তারই লাগি কাড়াকাড়ি।"

ভাবতে লাগলাম, এই যে মানুষের ঐকান্তিকতা, এই যে জনতার প্রাণপণ, এই যে ভক্তসমুদ্রের অদম্য আবেগ,

এইখানেই তো তীর্থকামনার সাফল্য, এইখানেই তো ভগবানের মাহাত্ম্য। ভগবান যদি নেই তো এ উন্মাদনা মানুষের প্রাণে আসে কেমন কোরে? এ প্রেরণার উৎস কে যোগায়? কে দেয় এই আবেগ, এই নিষ্ঠা, এই প্রাণপণ প্রচেষ্টা? এরই ধারাস্রোতকে অবলম্বন কোরে ধর্ম্ম বেঁচে আছে, জাতি বেঁচে আছে, জগৎ বেঁচে আছে। এর ক্ষয় নেই, ব্যয় নেই, শেষ নেই।

হিন্দুধর্ম্মের এইই হল মূল। এই তীর্থানুষ্ঠানে ধর্ম্ম জাগ্রত, জীবিত, পরিপুষ্ট। হিন্দুজাতও আজ এরই জোরে বেঁচে আছে—মেরুদণ্ড নুঁয়ে পড়েছে, তবু ভেঙ্গে পড়েনি।

মন্দির-সমিতির সদস্যের আয়াস সফল হল বহু চেষ্টায়। জন-সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হলেও সংবদ্ধ হলেন সাময়িকভাবে।

আমরা সবাই গিয়ে রথের রজ্জু স্পর্শ কোরে এলাম।

তারপর অতিথির সম্মানের জন্য মন্দিরের কর্ম্মাধ্যক্ষ আমাদের মাথায় লাল চেলীর উষ্ণীষ বেঁধে দিলেন। এখান থেকে বিশ্বেশ্বরের পূজার্চ্চনার জন্যে গেলাম।

মন্দিরটি রামেশ্বরের নামে প্রখ্যাত হলেও আগে বিশ্বেশ্বরের পূজার্চ্চনাই রীতি। এই রীতির মূলে যে কাহিনী আছে, সেটি মন্দিরের কর্ম্মাধ্যক্ষ আমাদের শোনালেন।

রাবণ নিধন সম্পন্ন হয়ে গেছে—জনকনন্দিনীকে সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্র ফিরছেন অযোধ্যায়। দুষ্কৃত বিনাশের জন্য, সাধুগণের পরিত্রানের জন্য, ভগবান যুগে যুগে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন—এ কথা সত্যি। সে কাজও সম্পন্ন হয়েছে, দুষ্কৃত

রামেশ্বর—বামঝরুক।—পৃঃ ১৮৩

রামেশ্বরের পথিমধ্যে রথযাত্রা পৃঃ—১৭৩

রাবণও নিধন হয়েছে। কিন্তু ভগবান রামচন্দ্র তবুও বিমর্ষ। তাঁর মন ভারাক্রান্ত। রাবণ-বধের গ্লানি তাঁর মনকে বড়ই ভারাতুর কোরে তুলছে। কেবলই মনে পড়ছে—পতিপ্রাণা মন্দোদরীর ধূলি-ধূসরিতা মূর্ত্তি; মনে পড়ছে—লক্ষ লক্ষ রক্ষবধূদের দীর্ঘশ্বাস, সতী সীমন্তিনী পতিহারা তারার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন।

কাতর হয়ে পড়েছেন রামচন্দ্র। সীতা উদ্ধারের আনন্দে চাঁদের কলঙ্কের মত কলঙ্ক লেগেছে। ক্ষুব্ধ রামচন্দ্র মনে মনে প্রায়শ্চিত্তের সংকল্প করলেন। ঠিক হল সর্ব্বপাপতাপহারী শান্তি-দাতা, সকল মঙ্গলের আধার শিব প্রতিষ্ঠা কোরে এ অনুশোচনা, পাপ ও কলঙ্কের মোচন করবেন। *

---

* এই কাহিনী শুনে মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা। ঠাকুমার কাছে রামায়ণের কত গল্পই না শুনেছি। আজও মনে আছে, তিনি বলেছিলেন যে, বীরভক্ত বানরগণ সাহায্যে সেতু দ্বারা সমুদ্র বন্ধন হল, রাবণের চর সে সংবাদ তাকে জানালে। রাবণ রাতারাতি সেতু ভঙ্গ করে দিলে। পর দিন রামচন্দ্র প্রভৃতি সকলে দেখলেন সেতুর ভগ্নাবস্থা। আবার সেতু গঠন হল, আবার রাত্রিকালে রাবণ কর্তৃক ভঙ্গ হল। বার বার তিনবার এইরূপ গঠন ও ভঙ্গ হবার পর, শ্রীরামচন্দ্র চিন্তিত হয়ে সকলের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। মন্ত্রী জাম্ববান ক্ষুরধার তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, রাবণ পরম শিবভক্ত, যদি এই সেতুর উপর শিব-প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে রাবণ তার ইষ্টদেবকে আসন হতে বিচলিত কোরে কোনো-মতে শিবের অবমাননা করতে পারবে না। যে কথা, সেই কাজ—অমনি আদেশ হল হনুমানের প্রতি শিবলিঙ্গ অনুসন্ধানের জন্য হিমাচলে যেতে। বস্তুতঃ তাই হয়েছিল। শিব-প্রতিষ্ঠার পর রাবণ আর সেতু ভঙ্গ করেনি। মন্দিরের কার্য্যাধ্যক্ষের কাহিনীর অবশিষ্টাংশ ঠাকুমার কাহিনীর সঙ্গে মিল আছে। মোট কথা, একটি মত হচ্ছে, এই রামেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা

এ ভার অর্পণ হল হনুমানের ওপর। হনুমান শিবলিঙ্গের অনুসন্ধানে নগাধিরাজ হিমালয়ে গেলেন।

অনেক সময় অতীত হয়ে গেল, তবু হনুমান ফিরছেন না দেখে অধীর রামচন্দ্র একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কোরে ফেললেন।

এদিকে হিমালয় থেকে শিবলিঙ্গ সংগ্রহ কোরে ফিরে এসে হনুমান দেখলেন, তাঁর চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেছে। রামচন্দ্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কোরে ফেলেছেন এবং তাঁর আনীত শিবলিঙ্গের আর কোন প্রয়োজনই নেই। বিষণ্ণ, ক্ষুব্ধ হনুমান ম্রিয়মান হয়ে গেলেন।

অন্তর্য্যামী রামচন্দ্র তখন হনুমানের মন জানতে পেরে বললেন, "হে বীর, তুমি মৎপ্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ উৎপাটিত কর, আমি তৎস্থানে তোমা কর্ত্তৃক আনীত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করব।"

উৎফুল্ল হনুমান তখনই লাঙ্গুল বেষ্টনে শিবলিঙ্গটিকে উৎপাটিত করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু শিব অচল, অটল। সহস্র হনুমান এলেও বোধ হয় নড়াতে পারত না, এমনি দৃঢ় সে শিবলিঙ্গ।

ক্লান্ত হনুমান তখন মর্ম্মাহত হয়ে বসে পড়লেন। দুঃখে, অভিমানে তাঁর চোখে জল এসে পড়ল। ভক্তের দুঃখ দেখে রামচন্দ্রের হৃদয় দ্রবীভূত হল। তিনি বললেন, "তুমি দুঃখ করো না বৎস, তোমার শিবলিঙ্গও আমি এইখানে প্রতিষ্ঠিত করব।

---

লঙ্কা আক্রমনের পূর্ব্বেই হয়েছিল, আর একটি মত যে রামচন্দ্র রাবণ বিজয়ী হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় রাবণবধজনিত ব্রহ্মবধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যই এই রামেশ্বর লিঙ্গের স্থাপনা করেন।

রামেশ্বরের জগদ্বিখ্যাত সহস্রাধিক স্তম্ভের অলিন্দ—পৃঃ ১৭৯

সে শিবালিঙ্গ "বিশ্বেশ্বর" নামে পৃথিবীতে প্রচার হবে ; বারাণসীর বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্যের সঙ্গে এর মাহাত্ম্য সমান হবে এবং প্রথমে বিশ্বেশ্বর দর্শন কোরে তবে ভক্তরা মৎপ্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর শিবদর্শনে অধিকারী হবে।"

এই কাহিনীর ওপর ভিত্তি কোরে প্রথমে বিশ্বেশ্বর ও পরে রামেশ্বর দর্শন করাই রীতি। এখানে বিশ্বেশ্বর শিবের কাছে বিশ্বেশ্বরীও আছেন। কাশীর মত এঁর নাম "দেবী অন্নপূর্ণা।"

রামেশ্বর মন্দিরের পূর্ব্ব গোপুরম্

বিশ্বেশ্বরের পূজার্চ্চনা সেরে আমরা রামনাথ বা রামেশ্বর শিব দর্শনে গেলাম। এ অঞ্চলে যত শিবলিঙ্গ দর্শন করেছি, দেখলাম রামেশ্বর শিবলিঙ্গ তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট—মাত্র একফুট উঁচু। মনে পড়ল, সর্ব্বাপেক্ষা বড় শিব লিঙ্গ দেখেছি তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর—প্রায় তেরো ফুট উঁচু।
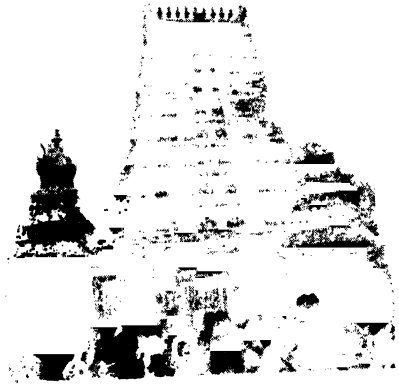
পাণ্ডারা বললেন, "এখনো রামেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তিতে হনুমানের লাঙ্গুলচিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

দূর থেকে দেখবার চেষ্টা করলাম—দেখতে পেলাম না। হয় ত একসময় ছিল, কালের ক্ষয়িষ্ণুতায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রমাণ নিশ্চিহ্ন হোক, লোকের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে কাহিনী আজো বেঁচে আছে—অসংখ্য ভক্তের তীর্থযাত্রার একাগ্রতাকে আশ্রয় কোরে ধারাবাহিকতা আজো বজায় আছে।

শ্রীশ্রীরামেশ্বর দেবের লিঙ্গ-মূর্ত্তির ওপর পাঁচটি সুবর্ণ নির্ম্মিত সাপের ফণা আছে। সর্পফণা-ভূষিত সুবর্ণ-ছত্র-মস্তকে রামেশ্বর শিব একটি সোনার সিংহাসনের ওপর বিরাজ কোরছেন।

মনে পড়ল, কাশীর বিশ্বেশ্বরকে স্পর্শ করেছিলাম, এখানে সে সুযোগ নেই। দাক্ষিণাত্যের কোন দেব-দেবীকেই ভক্তরা স্পর্শ কোরতে পারে না। অভিষেকের বারি পুরোহিতের হাতে দিতে হয়, তিনিই অভিষেক সম্পন্ন করেন।

গঙ্গোত্রীর জল দিয়েই রামেশ্বরের অভিষেক হয়। গঙ্গোত্রীর জল দুষ্প্রাপ্য। সেইজন্যে সাধারণে বলে যে, রামেশ্বর শিবের মাথায় গঙ্গোত্রীর জল দিয়ে অভিষেক করলে খুব পুণ্য হয়। ভগবানের এমন মাহাত্ম্য যে, প্রত্যহই একজন না একজন দর্শনার্থী এখানে আসে, যার কাছে গঙ্গোত্রীর জল থাকে। যদি কদাচ এমন হয় যে, গঙ্গোত্রীর জল সেদিন পাওয়া গেল না, তবে স-বৎসা গাভীর দুগ্ধ দিয়ে এ অভিষেক সম্পন্ন করা হয়।

আগেই বলেছি, একজন একপাত্র গঙ্গোত্রীর জল দিয়েছিলেন।

রামেশ্বর মন্দিরের এক অংশ—পৃঃ ১৮০

তা ছাড়া, বিলুর মাও প্রয়াগ-সঙ্গমের প্রচুর জল সঙ্গে এনেছিলেন। আমরা অভিষেকের জন্য দু'টাকা দিয়ে একখানি টিকিট কিনলাম এবং এই গঙ্গাজল পুরোহিতের হাতে দিয়ে রামেশ্বরের অভিষেক সম্পন্ন করলাম।

অভিষেকের সময় আমাদের গোত্র, নাম ইত্যাদি বললাম; সেই নাম গোত্রগুলি-উচ্চারণ কোরে কোরে পুরোহিত অভিষেক করাতে লাগলেন।

দেবালয়ের সামনে রামেশ্বর শিবের বাহন নন্দী (বৃষ) বর্দ্ধমান। এই বৃষের আকৃতি তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর শিবের নন্দী অপেক্ষা কিছু বড়ই হবে। নাটমন্দিরের কাছেই রামেশ্বরীদেবী আছেন। দেবীর ষোড়শোপচারে পূজার জন্য আমরা কলকাতা হতে সোনার নথ প্রভৃতি নিয়ে এসেছিলাম।

যথারীতি কর্পূরালোকে দেবদেবীর পূজা-অর্চ্চনা প্রভৃতি সেরে সেলুনে ফিরে আসবার আগে মন্দির-সমিতির সদস্যেরা সমুদ্রোপকূলস্থ অতিথি-আবাসে থাকবার জন্য অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সেলুন থাকায় আমরা আর অনর্থক পৃথক্ বাসা করতে সম্মত হলাম না। শুনলাম, স্যর এন, এন, সরকার কে, সি, এস, আই, মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে রামেশ্বর দর্শনে এসে এই অতিথি-আবাসটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ফেরবার মুখে সমস্ত মন্দিরটি ঘুরে আর একবার দেখলাম। শ্রীরঙ্গমের মত এ মন্দিরটি অত বড় না হলেও, দাক্ষিণাত্যের

অন্যান্য বড় বড় মন্দিরের সমতুল, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। সব না হোক, এখানকার এক একটি কারুকার্য্য দেখবার বস্তু।

রামেশ্বরজীর সামনে সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতির এক একটি যে পাথরে খোদাই মূর্ত্তি আছে, তা সত্যিই নয়নাভিরাম। বোঝা যায় যে, মেঝের ও মূর্ত্তির পাথর অখণ্ড, অভিন্ন। এক একটি বড় প্রস্তর খণ্ডকে, কেটে-ছেঁটে তাই থেকে এই মূর্ত্তিগুলি তৈরী করা হয়েছে। প্রশস্ত নাটমন্দিরের মাঝে ছোট ছোট এক একটি মন্দিরে ভ্রাতা লক্ষ্মণ, ভ্রাতৃজায়া জনকনন্দিনী ও অনুচরবৃন্দের মধ্যে হনুমান ও সুগ্রীবের মূর্ত্তি বিরাজিত।

নাটমন্দিরের সামনে সোনার পাতে মোড়া তালগাছ। এখানকার কয়েকটি স্তম্ভ ভেঙে গিয়েছে, আবার নতুন কোরে তৈরী হচ্ছে দেখলাম।

পুরাতন স্তম্ভগুলিতে যে সব ছবি দেখলাম, সেগুলি এলা-মাটি ও গেরীমাটি দিয়ে রং করা।

* * * * *

বৈকালে পাঁচটা নাগাদ আমরা ডবল-ঝটকা কোরে **রামঝরুকা** দর্শনে গেলাম। রামেশ্বর-মন্দির থেকে রামঝরুকার দূরত্ব প্রায় আড়াই মাইল। সমুদ্রের বেলাভূমির উপর এই রাস্তাটি বরাবর বালির। গরুর গাড়ী ছাড়া পথাতিক্রম করবার অন্য কোনও যান ব্যবহার হয় না। কাজেই মেয়েরা চললো গরুর গাড়ীতে, আর আমি, প্রভাত ও রাও চললাম হেঁটে।

দেব-দর্শনের জন্যে এই আড়াই মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে যেতে বড়ো ভাল লাগল। এর আগে কাছে-দূরে যত জায়গা গেছি, সবই প্রায় মোটরে বা বাণ্ডিতে।

নীরবে চলেছি আমরা তিনজন; পাশে চলেছে মেয়েদের গরুর গাড়ী, বালির মধ্যে পথরেখা আঁকতে আঁকতে।......মাঝে মাঝে শব্দ হচ্ছে চাকার—মনে হচ্ছে, সে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে রামনাম করতে করতে চলেছে রামঝরুকার উদ্দেশে।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগল আমাদের পৌঁছুতে।

পাহাড়ের মত উঁচু একটি জায়গার ওপর মন্দির। শুনলাম, এই উঁচু জায়গায় বসে শ্রীরামচন্দ্র সেতুবন্ধ, সৈন্যচালনা, রক্ষঃকুলের আক্রমণ প্রভৃতি লক্ষ্য করতেন।

মন্দিরাভ্যন্তরে একটি পাথরের ওপর শ্রীরামচন্দ্রের দু'খানি চরণ-চিহ্ন দেখলাম। এখানে বিগ্রহ নেই। অনেকটা গদাধরের পাদ-পদ্মের মত ( বুদ্ধদেবের চরণ-চিহ্ন নয় ত ? কারণ, বৌদ্ধযুগের কিছু কিছু চিহ্ন এ অঞ্চল হতে আরম্ভ হয়ে সিংহলে বিস্তৃতি লাভ করেছে )।

অনেক সাধু-সন্ন্যাসী, ভক্ত দর্শনার্থী যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সবাই মন্দির প্রদক্ষিণ করছেন দেখে আমরাও প্রদক্ষিণ করলাম।

যাত্রীদের মধ্যে একটি অন্ধকে দেখলাম, হাতড়ে হাতড়ে সমস্ত মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করছে। তার নিষ্ঠা দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। এই দীর্ঘপথ সে অতিক্রম কোরে এসেছে......শুধু ভক্তি আর ঐকান্তিকতাকে সম্বল কোরে।

আমরা দু'চোখ দিয়ে নারায়ণের অবতার রামচন্দ্রের চরণ-চিহ্ন দেখে ধন্য হলাম, কিন্তু ও তা দেখতে পেল না। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, চোখে দেখতে না পেয়ে ও যা পেল, আমরা হয় ত তার এক কণাও পেলাম না। ও শুধু কানে শুনলে রামচন্দ্রের চরণ-চিহ্নের কথা, আর সেই সঙ্গে নিজের কল্পনা দিয়ে মনের কোণে সযত্নে সাজালে সেই ছবিটি—যেমন কোরে প্রাণ চায়, যে সাজে সাজালে তার মন ভরে।

বাইরের দৃষ্টি ওর নেই, এ কথা সত্যি, কিন্তু অন্তরের...... দৃষ্টি তো আছে। বাইরের দৃষ্টি যেখানে হার মানে, অন্তরের দৃষ্টির মহিমা যে সেইখানেই। বাইরের চোখে যা দুর্নিরীক্ষ্য, অন্তরের কাছে তাই যে স্পষ্ট। "বাইর দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।" বাইরের দুয়ারে কপাট না লাগলে ভেতর দুয়ার কি খোলে? তাই বাইরের দৃষ্টির শেষ যেখানে, অন্তরের দৃষ্টির যে সেইখানেই আরম্ভ।

মনে মনে বললাম, অন্তর্য্যামী সেই দৃষ্টি দাও, যে দৃষ্টি দিয়ে ভেতরটা দেখতে পাই।......সেই প্রেরণা দাও, যে প্রেরণায় বাইরের দোর বন্ধ হয়ে ভেতরের দোর খুলে যায়।

ভাবতে ভাবতে এসে দাঁড়ালাম সমুদ্রের বেলাভূমিতে।

চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। একটা অপার্থিব আনন্দে সমস্ত মনটি হিল্লোলিত হয়ে ওঠে। রামেশ্বর দ্বীপের চতুর্দ্দিক ঘিরে কেবল জল। যেদিকে চাও, অপার নীলাম্বুধি......আদি নেই, অন্ত নেই। তারই কোলে হরিদ্রাভ বর্ণের সুবিস্তৃত বেলাভূমি......মনে

হচ্ছে যেন, নীলশাড়ীর প্রান্তরেখা। সূর্য্যকিরণে বিকীর্ণ জ্যোতিঃ শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি দেখে মনে হয়, নীলশাড়ীর এই পাণ্ডুবর্ণ পাড়ের ওপর কে যেন চুম্‌কী বসিয়ে দিয়েছে।

সন্ধ্যে পর্য্যন্ত এখানের বেলাভূমিতে বেড়িয়ে কাটালাম······ তারপর উৎফুল্ল মন নিয়ে ফিরে এলাম রামেশ্বরে।

পথে হনুমানজীর মন্দির দেখলাম। মানুষের আকারের চেয়েও বড় এই হনুমান-মূর্ত্তি। পুরোহিত প্রসাদ দিলেন, সিদ্ধ ছোলা।

সেলুনে ফেরবার আগে আর একবার রামেশ্বর-মন্দিরটি ঘুরে দেখে এলাম।

রাত্রি তখন এগারোটা হবে। সবাই বসে গল্প করছি রামেশ্বরের। এ গল্পে সকলেই যোগ দিয়েছেন, সুব্বারাও, প্রভাত, বিলুর মা, সহধর্ম্মিণী, খুকুমণি—সবাই।

রাও হিন্দী জানেন বেশ। কাজেই সবাইয়ের সঙ্গে কথা কইতে কোন রকম বাধা-বিঘ্ন ঘটছে না। তা ছাড়া, রাওয়ের একটা গুণও আছে বেশ। দু'দিনেই লোককে সে খুব আপনার কোরে নিতে পারে। তার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা দেখে মনে হয়, বুঝি কতো দিনের চেনা, কতো দিনের আলাপ।

খুকুমণির ভাল নামটা তার গোচর হয়ে গেছে। কারণ, অর্চ্চনার সময় পুরোহিতকে নাম গোত্র বলতে হয়। সেই থেকে রাও শুনেছেন, খুকুমণির নাম রমলা দেবী। কিন্তু উচ্চারণ করেন তিনি হসন্ত যোগ করে অর্থাৎ রমলা দেবী। এখানকার

পুরোহিতরাও ঐ রকম উচ্চারণ করেন। সেই থেকে প্রভাতকে ছোট বাবু, আর বিলুর মাকে বড় মাতাজী ও আমার স্ত্রীকে ছোট মাতাজী বলেন রাও।

কথা হচ্ছিল, কোথা থেকে কোন পর্য্যন্ত রামচন্দ্র সেতু বেঁধেছিলেন?

আমি বললাম, "রোলার ব্রীজ, অর্থাৎ মণ্ডপ স্টেশন থেকে যে ব্রীজের ওপর দিয়ে আমাদের ট্রেণ এলো, সেই ব্রীজও রামচন্দ্রের সেতুর খানিকটা অংশের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।"

রাও হিন্দীতে বললেন, যাতে মেয়েরাও বুঝতে পারে, "রামেশ্বরটি একটি দ্বীপ"।

বাকীটুকু আমি বললাম, শক্তিশেলে লক্ষ্মণ যখন অজ্ঞান হন, তখন বিশল্যকরণী চিনতে না পেরে হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বতটাই উপড়ে নিয়ে এলো। বিশল্যকরণী তুলে নিয়ে রামচন্দ্র অনুজকে বাঁচালেন। তারপর সেই গন্ধমাদনকে হনুমান সমুদ্রে ফেলে দেয় এবং এই গন্ধমাদন দ্বীপই রামেশ্বর বলে বিখ্যাত হয়েছে।

প্রভাত বললে, "তা হলে মণ্ডপম্ থেকেই রামচন্দ্রের সেতু বন্ধন আরম্ভ, বল?"

বললাম, "মণ্ডপমের আরো আগে থেকে। শোনা যায় দর্ভশয়ন থেকে"......বাধা পড়ল গল্পে। সেলুনের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাও বললেন, "মন্দির-সমিতির ম্যানেজার আপনাদের জন্য গাড়ী পাঠিয়েছেন।"

রামেশ্বর শিবের শোভাযাত্রা দেখতে যাবার জন্যে সবাই উঠে দাঁড়াল। আমার কিন্তু যাওয়া হল না। রামঝরুকার পথ অতিক্রম কোরে ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়েছিল। মনে মনে ভাবলাম, ভাগ্য ওদেরই ভাল।

সবাই শোভাযাত্রা দেখবার জন্য মোটরে গিয়ে উঠল। আমি রামেশ্বরজীকে মনে মনে প্রণাম কোরে শুয়ে রইলাম।

বড় মজার জিনিষ এই মানুষের মন—কিছুতেই চুপ কোরে থাকতে পারে না। কিছু না কিছু একটা ভাবনা দিয়ে জাল বুনবেই। ভাবতে লাগলাম শুয়ে শুয়ে। নিজের খুসিমত মন আমার কল্পনায় মেতে উঠলো।

বিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক পারিপার্শ্বিকের মাঝে বসে মন আমার পিছু হেঁটে সেই সুদূর অতীতে ফিরে গেল। যেদিন সেই নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম দশরথাত্মজ এখানকার সমুদ্রতীর আলো কোরে খুঁজে ফিরেছিলেন সীতাকে। সঙ্গে ছিল অগ্রজানুগমন-কারী প্রাণপ্রতিম লক্ষ্মণ, আর সেবক রামদাস। এখানকার আলো, ছায়া, মাটি, গাছ-পালা, পশু-পক্ষী—সবাই বলেছিল এক স্বরে—প্রভু, এই সেই পথ, যে পথ দিয়ে রাক্ষস-রাবণ মা-জানকীকে অপহরণ কোরে নিয়ে গেছে।

সমুদ্রের বেলাভূমিতে বিদার্ণ শুক্তি থেকে বিচ্যুত মুক্তার পঙক্তিও যেন মা-জানকীর ছিন্ন, পরিত্যক্ত কণ্ঠমালার চিহ্ন রচনা কোরে রামচন্দ্রকে বলেছিল—এই সেই পথ।

তখন ভগবান রামচন্দ্র বানর-সৈন্য সমভিব্যাহারে সেতু-

বন্ধন সম্পন্ন করেছিলেন। এই সেতুর দৃশ্য বর্ণনায় মহাকবি বলেছেন—

"রসাতলাদিবোমগ্নং শেষং স্বপ্নায় শার্ঙ্গিণঃ।"

অর্থাৎ সেতু দেখে মনে হয়, নারায়ণের শয়নের জন্যে যেন রসাতল থেকে শেসনাগ জাগ্রত হয়ে সমুদ্রের ওপর ভেসে উঠেছে।

*   *   *   *

পরের দিন। সকালে স্নানাদি সমাপন কোরে শ্রীশ্রীরামেশ্বরজীর দুগ্ধাভিষেক দেখতে গেলাম। কলসী কলসী দুধ ঢেলে রামেশ্বর শিবের দুগ্ধাভিষেক-পর্ব্ব সমাধা হল। এর পর ভগবানকে ভোগ দেবার অভিলাষের কথা মন্দির-সমিতির ম্যানেজারের মারফৎ প্রধান পুরোহিতের গোচর করলাম। খিচুড়ি-রান্না প্রভৃতি সমস্ত কাজই তাঁরা নিজেরা সম্পন্ন করলেন, ব্যয়ভার বহন কোরে আমরা ধন্য হলাম।

বিগ্রহের উদ্দেশে উক্ত ভোগ উৎসর্গীকৃত হবার পর কিয়দংশ প্রসাদ আমাদিকে দিয়ে বাকীটুকু মন্দিরের ভেতর বিতরণ করা হল।

এই তো গেল সকালের অনুষ্ঠান। বিকেলে আবার মন্দিরে গেলাম। শোভাযাত্রা কোরে মন্দিরের দেব-দেবীর ভোগমূর্ত্তিগুলি সমুদ্রতীরস্থ মণ্ডপে আনা হল। আমরাও শোভাযাত্রার অনুগমন কোরে এই মণ্ডপে এলাম।

শুনলাম, এই মণ্ডপে ঘণ্টাখানেক দেব-দেবীদের রেখে তারপর আবার মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

মণ্ডপের ওপর সাজানো দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি দেখে মনে হল, দেবতারা যেন দেবী সমভিব্যাহারে দক্ষিণ-সমুদ্রের বেলাভূমিতে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন।

সামনে প্রসারিত নীল-সমুদ্র, দু'পাশে বালুকাময় বেলাভূমি, তার কোলে সারি সারি তাল-নারিকেলের গাছ—দেখলে মনে হয়, এ যেন ভগবানের রাজ্য। নিত্যকালের জন্যে ভগবান যেন এই শান্ত-সুন্দর প্রকৃতির পরিবিতে বাঁধা আছেন।

এখান থেকে আমরা বেলাভূমিতে নামলাম। কড়ি, ঝিনুক, শাঁখ প্রভৃতি কুড়িয়ে বেলাটা কাটানো গেল। মেয়েদেরই এ সবে বেশী উৎসাহ—বিশেষ কোরে বিলুর মার।

বয়সে আমাদের মধ্যে খুকুমণি ছাড়া কেউই ছেলেমানুষ নয়, প্রাচীনের গণ্ডীতে প্রায় সকলেই পা বাড়িয়েছি। তবু ছেলেমানুষের মত বালির চড়ায় খুঁজে খুঁজে শামুক-ঝিনুক কুড়োনর কী আনন্দ! মনে হয়, শৈশবের কথা—যখন আনন্দ ছিল অপরিসীম. প্রাণ ছিল বিচিত্র কৌতূহল ও অফুরন্ত রসসম্ভাবে পরিপূর্ণ। মনে হয়, সেই 'হারিয়ে যাওয়া' শৈশবের স্মৃতির মুকুতা এই বালুচরে কে যেন ছড়িয়ে রেখেছে……সে আনন্দ যেন এইখানে দানা বেঁধে আছে থরে থরে। বেশ লাগে ভাবতে। এই রকম কোরে ছেলেমানুষ হতে কী সাধই না যায়!

সন্ধ্যার সময় দেবদর্শন, পূজার্চ্চনা প্রভৃতির সঙ্গে এই অতিরিক্ত আনন্দও অর্জ্জন কোরে আমরা বাজার বেড়াতে গেলাম। বাজারে গিয়ে দেখি, শাঁখ, শাঁখা, ও ঝিনুক, কড়ি প্রভৃতির নানান রকমের

জিনিষপত্র বিক্রীর জন্যে সাজানো রয়েছে। দেখলে লোভ হয়, মনে হয়, এখানকার সমুদ্রের স্মৃতি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, আনন্দ প্রভৃতি যা পেলাম, তা নিজের মনের মাঝেই গাঁথা রয়ে গেল, দূরে সরে গেলেও এ সঞ্চয় অক্ষয় হয়ে থাকবে, নিজে উপভোগ করব তিল তিল কোরে। কিন্তু, নিজের এই যে আনন্দ, পাঁচজনের কাছে এ তো বিলোতে পারব না! এ আনন্দকে বিলোবার উপায় হচ্ছে, এই সব জিনিষগুলি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। এগুলি হবে রামেশ্বরের অক্ষয়-স্মৃতির নিদর্শন। যাকে দেখাব, যাকে দোব, তাকেই বলব—এ সব রামেশ্বরের।

শাঁখা কেনবার সময় মজা দেখলাম, এরা শাঁখাগুলিকে বাংলাদেশের শাঁখা বলে অভিহিত করে। ভাবলাম, বাংলাদেশের মেয়েরা বেশী শাঁখা ব্যবহার করে বলেই বোধ হয় এই কথাটি প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম যে, তা নয়। এখানকার বেলাভূমি থেকে সংগ্রহ করা মরা শাঁখগুলি ঢাকায় পাঠানো হয়—সেখান থেকে পরিষ্কার হয়ে ঘষে-মেজে সেই সব শাঁখ ও শাঁখা আবার এখানে এসে বিক্রী হয়। এই-জন্যেই এ অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা একে বাংলাদেশের শাঁখ ও শাঁখা বলে।

কথাটা শুনে প্রচুর আনন্দ হল। তবু ভাল, ভারতবর্ষে এমন একটা জায়গা এখনো আছে, যেখানে এই অব্যবসায়ী বাঙালীর শিল্প-সম্ভার একচেটিয়া।

বাঙালী জাতের অব্যবসায়ী বিশেষণটা যেন কায়েমী হয়ে

গেছে। ভারতবর্ষের আর সব জাতই অল্প-বিস্তর ব্যবসা করে। কিন্তু আমরা, এই বাঙালীরা, ব্যবসাকে ভয় করি, দুর্জ্জনকে দূর থেকে পরিহার করার মত এড়িয়ে চলি। আমরা লেখাপড়া শিখি চাকরীর জন্যে, বাঁচি চাকরীর জন্যে, যা কিছু করি, সবই যেন চাকরীর জন্যে। দুঃখ হয় আমাদের এই অবনতি দেখে। শুনেছি, আমাদের বাপ-মায়েরা ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা কোরে বলেন, "ছেলে বড় হয়ে মানুষ হবে, চাক্‌রা-বাক্‌রী কোরবে।" কথাটা খুবই সাধারণ, সব ঘরে আমাদের সর্ব্বত্রে প্রচলিত। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের আর কোন পন্থা কি নেই? 'চাক্‌রী-বাক্‌রী' ছাড়া আর কি মানুষ হবার কোন রাস্তা খোলা নেই? মানুষের কর্ম্ম-জীবনে এইই কি সবচেয়ে বড় ভবিষ্যৎ? বাপ-মা যখন আমাদের এই আশা পোষণ করেন, তখন ছেলেরা আর কি শিখবে? মনে হয়, বাপ-মায়ের এ নিদারুণ আশীর্ব্বাদটা বদলান দরকার। তাঁরা যদি ভাবতে শেখেন, তাঁরা যদি বুঝতে শেখেন যে, কর্ম্ম-জীবনের উন্নতি ও পরিণতি চাকরীতেই পর্য্যবসিত নয়, তাঁরা যদি ছেলে-বেলা থেকেই ছেলেদের সামনে কর্ম্ম-জীবনের উজ্জ্বল দীপ-শিখা জ্বেলে দেন, তবেই বাঙালীর জীবনে এই অপবাদ ঘুচবে।

তীর্থভ্রমণ-কাহিনীতে রামেশ্বরের শাঁখ ও শাঁখার কথা লিখতে গিয়ে অনেক কথা লিখে ফেললাম। কেউ কেউ মনে কোরবেন হয় ত অবান্তর। কিন্তু, আমার মনে হয়, সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে এরও মূল্য আছে।

বাজার ঘুরে ফিরতে রাত্রি হয়ে গেল।

মন্দির-সমিতির ম্যানেজার আসবার সময় বললেন, "আপনাদের জন্যে দশটার সময় গাড়ী পাঠাব। শয়নারতি দেখতে আসবেন।"

কথামত দশটার সময় গাড়ী এসে পেঁছিল। আমরা গেলাম শয়নারতি দেখতে।

সমস্ত দিনে শ্রীশ্রীরামেশ্বরজীর অনেকবার আরতি হয়, তার মধ্যে রাত্রি দশটা নাগাদ যে আরতি হয়, তার নামই শয়নারতি।

মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা সবাই ভগবানের শয়নারতি দেখলাম। এই আরতি সম্পন্ন হবার পর পুরোহিত ও ব্রাহ্মণেরা শ্রীশ্রীরামেশ্বরজীকে বাজনা-বাদ্য কোরে পার্ব্বতীর শয়ন-মন্দিরে নিয়ে চললেন। আগেই বলেছি, মূল বিগ্রহকে কখনো আসনচ্যুত করা হয় না; কাজেই এ সময় রামেশ্বরের যে সোনার ভোগমূর্ত্তি আছে, তাই বয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

মন্দির-প্রাঙ্গণের এক ধারে একটি মঞ্চ আছে। এই দোলায়মান মঞ্চের ওপর পার্ব্বতী মূর্ত্তি ( মূল মূর্ত্তি নয় ) বিরাজিত। প্রধান পুরোহিত এই পার্ব্বতীর মূর্ত্তির পাশে রামেশ্বরজীর মূর্ত্তি নিয়ে গিয়ে স্থাপন কোরলেন।

তারপর এই যুগল-মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা শ্রুতিসুখকর সুরে বেদপাঠ কোরতে লাগলেন। এইখানে একটা কথা বলা উচিত মনে করি।

এখানকার পুরোহিত বা ব্রাহ্মণেরা সকলেই প্রায় ভাল সংস্কৃতজ্ঞ এবং এঁদের উচ্চারণ বেশ স্পষ্ট ও নির্ভুল।

পরদিন ভোরবেলা আবার রামেশ্বরজীর ঘুম ভাঙিয়ে বাজনা-বাদ্যি কোরে মূল মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়। এই সময় মন্দির-সমিতির পক্ষ থেকে নিযুক্ত একজন লোক একটি স-বৎসা গাভী সঙ্গে কোরে আনে। মন্দির-প্রাঙ্গণে গাভীর দুগ্ধ দোহন কোরে সেই দুধে রামেশ্বরজীর অভিষেক সম্পন্ন হয়।

প্রতি শুক্রবারে পার্ব্বতী দেবীর শোভাযাত্রা হয়। দেবী তখন সালঙ্কারা এবং সুসজ্জিতা হন।

মন্দির-সমিতির ধার্য্য দক্ষিণা দিয়ে আমরা রামেশ্বরজীর ও পার্ব্বতী দেবীর অলঙ্কারাদি দেখলাম। দেবীর শোভাযাত্রায় যে পাল্কীখানি ব্যবহৃত হয়, তারই দাম প্রায় এক লক্ষ টাকা ; এ ছাড়া কয়েক লক্ষ টাকার গহণা আছে। রামেশ্বর শিবের পার্ব্বতীর নাম "পর্ব্বতবর্দ্ধিনী"। কিন্তু অর্চ্চনার সময় মন্ত্রে বা শ্লোকে এই পর্ব্বতবর্দ্ধিনী নাম উল্লেখ কোরতে দেখলাম না।

আগামী কালের জন্য অন্যান্য তীর্থগুলি দর্শন, স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করবার ব্যবস্থা কোরে সেলুনাবাসে ফিরলাম।

পরের দিন সকালে সমুদ্র-জল মাথায় ঠেকিয়ে দেবদর্শন সেরে রামেশ্বর মন্দিরের দালান পথটি দেখলাম। এটি একটি দেখবার বস্তু। রামেশ্বরের মন্দির কৃতিত্বের বৈশিষ্ট্য এইখানে। এই দালানের দু পাশে প্রায় একশ ষাট-সত্তরটি স্তম্ভ আছে। দালান-পথের এই স্তম্ভে বড বড় নারীমূর্ত্তি—ভক্তি নম্র ভঙ্গিতে কৃতাঞ্জলি পুটে দাঁড়িয়ে আছে। এই আনত বিনম্র নারীমূর্ত্তিগুলি যেন ভক্তদের, পুণ্যার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে সমস্বরে বলছে,—

"নমো হে নম, নমো হে নম"।

মনে পড়ল, মহাপ্রভু এই রামেশ্বরে এসে তিন দিন ধরে ভাবে বিভোর হয়ে নাম সংকীর্ত্তন করেছিলেন।

এখানের দেখা শেষ কোরে গেলাম পর্ব্বতবর্দ্ধিনী দেবীর মন্দিরের সামনের পুষ্করিণী-তীরে।

রাও বললেন, "এর নাম শিবতীর্থ। এক সময় স্বয়ং মহাদেব এ পুষ্করিণীটি খনন করেছিলেন বলে প্রবাদ শোনা যায়।"

এমনি আরো অনেক তীর্থ কাছাকাছি আছে, সুতরাং রাও যুক্তি দিলেন, "স্নান করাও যা, মাথায় জলস্পর্শ করানোও তাই; কাজেই আপনারা সকলে জল স্পর্শ করুন।"

আমরাও রাও-এর যুক্তিকে সমর্থন কোরে তাই করলাম।

তারপর এক এক কোরে হনুমৎ কুণ্ড, বেতালবরদ, কোটিতীর্থ ও সীতাসর তীর্থ প্রভৃতি দর্শন ও জলস্পর্শ করলাম।

কোটিতীর্থের উৎপত্তি-কাহিনী শুনলাম। কেউ কেউ কোটি তীর্থকে কোটিলিঙ্গও বলেন। এ নামের প্রচলন দেখে অনুমান হয় যে, কোটিলিঙ্গ দর্শনের পুণ্যার্জ্জন এই কোটিতীর্থে স্নান করলে হয়—এই কথাই বোধ হয় বোঝাবার উদ্দেশ্য। রাবণ নিধন কোরে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে রামচন্দ্র যখন রামেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন অভিষেক সম্পন্ন করতে গিয়ে অভাব হল গঙ্গা জলের। গঙ্গা জল ছাড়া শিবের অভিষেক কী কোরে সম্ভব? সুতরাং ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে ছোট একটি গর্ত্ত খুঁড়ে রামচন্দ্র মা জাহ্নবীকে একান্ত মনে স্মরণ করলেন।

ভক্তের আকুল প্রার্থনা পৌঁছোল মায়ের কাণে। মাটির ভেতর থেকে কোটি ছিদ্র দিয়ে কোটি ধারায় আবির্ভূতা হয়ে তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করলেন। সেই জন্যেই এর নাম কোটিতীর্থ।

অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে এই কোটিতীর্থে স্নান কোরে তিনি রাবণ-বধ জনিত পাপ হতে বিমুক্ত হয়েছিলেন।

পুরোহিতের মুখে ও রাও-এর মুখে শুনলাম, এই কোটিতীর্থের জল নাকি সঙ্গে নিতে হয়।

পুণ্য বারি সংগ্রহের লোভ বিলুর মারই বেশী। কারণ, তিনিই এনেছিলেন দু' কলসী প্রয়াগ সঙ্গমের জল। কথাটা শুনেই তিনি জল সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

এর পরে বেতালবরদের জলস্পর্শ কোরে আমরা এসে দাঁড়ালাম সীতাসর তীর্থ তীরে। পুষ্করিণীটি নেহাৎ ছোট নয়— বেশ বড়ই বলা চলে।

রাও বললেন, "এরই তীরে মা জানকী অগ্নি-পরীক্ষা দিয়েছিলেন।" কথাটা শুনেই মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে মনে বললাম, ভগবান রামচন্দ্র! তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তবু সব জেনেও এ কঠিন পরীক্ষা কেন করেছিলে? তুমি তো জানতে সাধ্বী সতী সীতা কায়মন ও বাক্যে একান্ত তোমারই ছিলেন। এ কথা তুমি ছাড়া এতো ভাল কোরে আর কে জানত? তবু এমন কাজ কেন করলে? কিম্বা মানবজন্ম পরিগ্রহ কোরে সে সময়ে তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক বোধ হয় রাহুগ্রস্থ হয়েছিল।

অথবা কূর্ম্ম পুরাণেই বোধ হয় এর সঠিক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা আছে। আমরা বাইরে দেখে বিচার করি, তাই এর সম্যক উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারি না।

কূর্ম্ম পুরাণে আছে ঃ—

"সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥
পরীক্ষা সময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিং সীতা সমানীয় স্বপুরাদুদনীনয়ৎ॥"

অর্থাৎ দশাননের কবলস্থ হবার আগে সীতা অগ্নির শরণ নিয়েছিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে অগ্নি কর্ত্তৃক প্রদত্ত ছায়াসীতাই রাবণ হরণ করেছিল। অগ্নি-পরীক্ষার সময়ে অগ্নি আবার সেই সত্য সীতাকেই রামচন্দ্রের কাছে প্রত্যর্পণ করেন।

মনে মনে ভাবলাম, এই-ই বোধ হয় এর সঠিক কারণ ; তাই প্রয়োজন অগ্নি-পরীক্ষার হয়েছিল, না হলে রামচন্দ্র, সর্ব্বজ্ঞ হয়ে কেন এমন অন্যায় করবেন।

রাও-এর মুখে বেতালবরদ তীর্থের কাহিনী শুনতে শুনতে আমরা অগস্ত্য, মঙ্গল, ব্রহ্ম প্রভৃতি কুণ্ড দর্শনে চললাম।

পুরাকালে মুনি গালবের কান্তিমতী নামে একটি কন্যা ছিল। গালবের পূজার্চ্চনার জন্য ফুল তুলতে গিয়ে দুই বিদ্যাধরের দুরভিসন্ধিতে পড়ে তিনি বলপূর্ব্বক হৃতা হন। গালব কন্যার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখে ধ্যানস্থ হয়ে সব ঘটনা জানতে পারেন।

ক্রুদ্ধ মুনি বিদ্যাধরদ্বয়কে শাপ দিলেন, "তোরা মনুষ্য জন্মগ্রহণ কোরে বেতালত্ব প্রাপ্ত হবি।"

হয়েছিলও তাই। বিদ্যাধরদ্বয় বেতালত্ব প্রাপ্ত হয়ে পাপ-বিমোচনের জন্য নানাতীর্থ ভ্রমণ কোরে অবশেষে আসে এই বেতালবরদ তীর্থে এবং এখানে স্নানের পর এর পুণ্যবারির স্পর্শে তাদের বেতালত্ব ঘোচে। সেই থেকে এ তীর্থের নাম "বেতালবরদ" হয়েছে।

গল্প শুনতে শুনতে আমরা ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে এসে পৌঁছুলাম।

এক সময় ব্রহ্মা নিজে এইখানে যজ্ঞ করেন। সেইজন্যে এর নাম "ব্রহ্মকুণ্ড"। এখানকার অধিবাসীরা বলেন, গ্রীষ্মকালে কুণ্ডের জল শুকিয়ে গেলে, এর ভেতর এখনো যজ্ঞের ভস্মাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়।

কাছাকাছি অগস্ত্য-তীর্থ ও মঙ্গলতীর্থের জল স্পর্শ কোরে আমরা কিয়দ্দূরে লক্ষ্মণ-তীর্থ ও লক্ষ্মণেশ্বর মহাদেবের মন্দির দর্শনে গেলাম।

লক্ষ্মণেশ্বর শিব ও লক্ষ্মণতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনায় শুনলাম, এই তীর্থে স্নান কোরে কোন অপুত্রক যদি পুত্র কামনায় শিবের কাছে সংকল্প করেন তো, তা নিশ্চয়ই সফল হয়।

রাও বললেন, "আরো কয়েকটি তীর্থ এর কাছাকাছি ছিল; সমুদ্রের কৃপায় সেগুলি লুপ্ত হয়েছে।"

আরো খানিকটা এগিয়ে রামকুণ্ড, সীতাকুণ্ড প্রভৃতির জল স্পর্শ কোরে আমরা শ্রাদ্ধাদি ও পিণ্ডদানের জন্য রামেশ্বর মন্দিরের কাছে ফিরে এলাম।

এখানে মাধবতীর্থের উত্তর দিকে বসে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করা হল। পাণ্ডা ও পুরোহিত বললেন যে, প্রচলিত প্রথানুযায়ী এ অঞ্চলের সবাই ছাতু ও আটা দিয়ে পিণ্ডদান করে। কিন্তু আমরা আমাদের দেশের প্রচলিত প্রথানুযায়ী চাউল, কলা, দধি তিল সহযোগে পিণ্ডদান করলাম।

খুকুমণির স্বামীপুত্র বর্ত্তমান এবং বিলুর মা বিধবা হলেও পুত্র-ভাগ্যে ভাগ্যবতী, কাজেই তাঁর শ্রাদ্ধাধিকার নেই ; তাই এঁরা ও আমার সহধর্ম্মিনী ভোজ্য উৎসর্গ করলেন।

শ্রাদ্ধাদি শেষ কোরে পুরোহিতকে ব্রাহ্মণ ভোজনের কথা জানালাম।

মন্দির-সমিতিব ম্যানেজার উপস্থিত ছিলেন, বললেন, " এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণকে দিয়ে পাক করালেও অন্য কারো বাড়ী আহার করেন না।

সুতরাং এখানকার স্থানীয় পুরোহিতের বাড়ী ব্রাহ্মণ-ভোজনেব আয়োজন করতে বলে আমরা ব্যয়ভার বহন করলাম। আহারের পর যথারীতি দক্ষিণা দিয়ে মনে মনে স্বর্গতঃ পিতৃপুরুষদেব আত্মাব পরিতৃপ্তি কামনা করতে করতে সেলুনে ফিরে এলাম।

রাত্রিটা সেলুনে কাটল। রামেশ্বরের কথা, এর পুণ্যকাহিনী, এর তীর্থ-মাহাত্ম্য প্রভৃতিতে কদিন ধরে মনটা বেশ ভরপুর হয়ে রইল।

পরের দিন সকাল বেলা—তখনো ঘুমের ঘোর ভালো কোরে কাটেনি—হঠাৎ আমাদেব সেলুনখানি মৃদু ঝাঁকানিতে সজীব হয়ে

উঠে চলতে আরম্ভ করল। বুঝলাম, ট্রেণ চলেছে ধনুষ্কোটির দিকে। উঠে বসলাম। নিদ্রালস চোখ মেলে যাবার আগে একবার রামেশ্বরকে দেখে নিলাম ভাল কোরে।

ট্রেণের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রামেশ্বর যাবে সরে, ধনুষ্কোটি আসবে কাছে। ধনুষ্কোটি······সেও রামসীতার লীলা-কাহিনীতে মুখর। মনে পড়ল, সীতাকে সঙ্গে কোরে পুষ্পকরথারূঢ় রামচন্দ্র ধনুষ্কোটির সেতুবন্ধ দেখে বলেছিলেন—

"বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্‌বিভক্তং মৎ সেতুনা ফেনিলাম্বুরাশিম্।"
অর্থাৎ "হে মৈথিলি, আমার সেতুর দ্বারা মলয় পর্য্যন্ত বিভক্ত ফেনিল-জলরাশি কেমন দেখাচ্ছে দেখ"। তারপর তুলনা দিয়ে বলেছেন—

"ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্"।

"কেমন দেখাচ্ছে জানো ?—শরতের তারকাশোভিত সুচারু আকাশে ছায়াপথ যেমন শোভা পায়, তেমনি"। নীল সমুদ্রের ফেনপুঞ্জের সঙ্গে এখানে কবি তারকাখচিত আকাশের সঙ্গে তুলনা করেছেন, আর সেতুর সঙ্গে তুলনা করেছেন ছায়াপথের। ভাবতে ভাবতে মনটা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। যে চোখে ভগবান রামচন্দ্র এর শোভা সন্দর্শন করেছিলেন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষ আমি, হয়ত সে শোভা দেখবার সামর্থ্য বা ভাগ্য আমার নেই, তবু মহাকবি কালিদাসের বর্ণনা মনে ভেবে সঞ্জাত আনন্দের রোমন্থন করতে তো পারব! সেও কি কম ভাগ্য!

যাবার আগে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম রামেশ্বরকে, মনে মনে বললাম, বিশ্বেশ্বরজী! তোমায় প্রণাম,

রামেশ্বরজী তোমায় প্রণাম, আর প্রণাম তোমায় নররূপী নারায়ণ! জনম-দুখিনী সীতা! এবং প্রভু রামদাস।

মুখ তুলে দেখলাম, রামেশ্বর অস্পষ্ট হয়ে এসেছে—দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে দুরান্তরের পরিবেশে।

চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে ট্রেণ এসে দাঁড়াল ধনুষ্কোটি স্টেশনে।

## ধনুষ্কোটি

ধনুষ্কোটি রামেশ্বর দ্বীপেরই পশ্চিমাংশে অবস্থিত। ট্রেণ থেকে নেমে শুনলাম, সাগর-সঙ্গম এখান থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে। সমস্ত পথটি বালুকাময়, সুতরাং গরুর গাড়ী ছাড়া যাবার কোন উপায় নেই। যাতায়াত ভাড়া এক একটি গরুর গাড়ীর সঙ্গে রফা হল আড়াই টাকা কোরে।

সমুদ্র-সঙ্গমে পেঁাছুতে প্রায় সাড়ে সাতটা বাজল।

শোনা যায়, রাবণ-বিজয়ী রামচন্দ্র সীতা সমভিব্যাহারে যখন অযোধ্যা প্রত্যাগমন করেন, সেই সময় বন্ধন-ব্যথিত সমুদ্র রামচন্দ্রের কাছে বন্ধন মোচনের জন্য প্রার্থনা কোরে বললে, "ভগবান! তোমারই সৃষ্টি এই যে অসীমত্ব আমার, বন্ধন হেতু আমার উপর দিয়ে শৃগাল কুকুরও যাতায়াত করবে, এই কি তোমার অভিপ্রায় ঠাকুর!" রামচন্দ্র এই কথা শুনে অনুজ লক্ষ্মণকে বন্ধন মোচনের

জন্য নিযুক্ত করলে তিনি ধনুর্ব্বাণ দিয়ে সেতুটির স্থানে স্থানে ভগ্ন করেন। এখানে সাগর-সঙ্গমে স্নান কোরে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করলে আত্মার মুক্তি হয়।

সুতরাং, আমরা শ্রাদ্ধের আয়োজন করলাম।

এই ধনুষ্কোটির জন্য আমরা কোলকাতা থেকে সোনার ধনুর্ব্বাণ নিয়ে এসেছিলাম। এখানে ব্রাহ্মণকে সোনার ধনুর্ব্বাণ দানের প্রথা আছে।

ধনুর্ব্বাণ দান, শ্রাদ্ধ সমাপণ কোরে সেলুনে যখন ফিরলাম, তখন সূর্য্য পশ্চিমমুখী হতে আরম্ভ কোরেছেন।

ফেরবার সময় বিলুর মা, খুকুমণি ও আমার স্ত্রী অনেক বালি সংগ্রহ করলেন।

এখানকার এমন মাহাত্ম্য যে, এক একটি বালুকণা এক একটি শিবলিঙ্গের সমান।

শুনলাম, মধু দিয়ে এই ধনুষ্কোটি-সঙ্গমের বালির শিবলিঙ্গ প্রস্তুত কোরে প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে সমর্পণ কোরতে হয়। শিব ও গঙ্গার এইপ্রকার মিলন-প্রথা অনেক দিন থেকে চলে আসছে। তীর্থযাত্রা শেষে ফিরে এসে মাসখানেক পরে আমরা প্রয়াগ রাজ্যে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেকেই উক্ত প্রণালীতে শিব গঠন কোরে পূজার্চ্চনার পরে সেই লিঙ্গমূর্ত্তি-গুলিকে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম।

বেলা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ একখানি ট্রেণ এসে আমাদের সেলুনখানিকে টেনে নিয়ে চললো রামনাদ অভিমুখে।

## রামনাদ

রাত্রি সাড়ে নটার সময় আমরা রামনাদ পৌঁছুলাম।

ধনুষ্কোটি থেকে রামনাদের দূরত্ব পঁয়ত্রিশ মাইল। রামেশ্বর, ধনুষ্কোটি প্রভৃতি সবই রামনাদের এলাকাভুক্ত। রামনাদ মাদুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত একটি ভূসম্পত্তি। এর দক্ষিণাংশের নামই রামেশ্বর। রামনাদের রাজারা খুব ধর্ম্মপ্রাণ ও দয়ালু। এই রামেশ্বর সেতুর অধিপতি বলে এখানকার রাজাদের পুরুষানুক্রমে "সেতুপতি" পদবী চলে আসছে। রামেশ্বরজীর মন্দিরের জন্য এই সেতুপতি রাজারা বছরে দেড় লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দান করেছেন।

সহর ও রাজধানী হিসাবে রামনাদ বেশ বর্দ্ধিষ্ণু, কিন্তু পানীয় জলের বড় কষ্ট। এ কষ্ট ঘোচাবার জন্য রাও ছুটোছুটি করতে লাগলেন।

রাত্রে আর কোথাও বেরুলাম না। ঠিক করলাম, সকালবেলা বাস ভাড়া কোরে তীর্থ দর্শনে বেরুব।

পূর্ব্বদিনের পরামর্শমত সকাল-বেলাই রাও বাসের বন্দোবস্ত করবার জন্যে বেরিয়ে গেলেন। আমরা ইত্যবসরে স্নানাদি সেরে নিলাম। খানিক পরেই বাস এসে দাঁড়ালো।

প্রথমে আমাদের বাস **নবপত্তন বা নব-পাষাণ** অভিমুখে চলল।

রাও আমাদিগকে রামনাদের কাহিনী বলতে লাগলেন। শুনলাম, এই রামনাদের নাম পুরাকালে "রামনাথ ক্ষেত্র" ছিল।
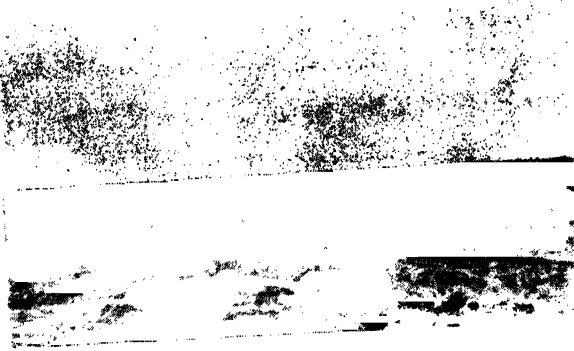
নবগ্রহ স্তম্ভ—( নবপত্তনম্ )

শোনা যায়, শ্রীরামচন্দ্র, সুগ্রীব, বিভীষণ, জাম্বুবান, হনুমান প্রভৃতি সবাই এই পবিত্র ক্ষেত্রে মিলিত হয়ে সীতা-উদ্ধারের পরামর্শ করেছিলেন।

নবপত্তন বা নবপাষাণ সম্বন্ধেও গল্প শোনা গেল।

কেউ কেউ ধারণা করেন যে, এই জায়গা থেকেই রামচন্দ্র সেতুবন্ধ আরম্ভ করেন; এবং এরই প্রারম্ভে রামচন্দ্র যে আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা করেছিলেন, এটি তারই প্রমাণ। তাই আজো সমুদ্রতীরের জলের ভেতর ন'টি প্রস্তরখণ্ড তার সাক্ষ্যরূপে বিরাজমান।

প্রায় আধ ঘণ্টাটাক ঝাঁকানি খেয়ে আমরা সমুদ্রতীরে পৌঁছুলাম।

রাও দূর থেকে আঙ্গুল দিয়ে নির্দ্দেশ কোরে প্রস্তরস্তম্ভক'টি দেখালেন। দেখলাম, স্তম্ভগুলির কিছু কিছু সমুদ্রের জলের ওপর জেগে আছে।

রাও বললেন, নবগ্রহের প্রীতির জন্যে এখানে সমুদ্রের জলে অবগাহন কোরে অর্চ্চনা করতে হয়।

একে নতুন জায়গা, তায় সমুদ্রের জলে অবগাহন কোরে অর্চ্চনা। আমাদের সাহস হল না, কাজেই এজেন্ট পাঠালাম রাওকে।

ইত্যবসরে মেয়েরা যে সঞ্চয়ী, তাই প্রমাণ করবার জন্যে বিলুর মা, খুকুমণি ও আমার স্ত্রী তিনজনে বাচ্ছাশাঁখ, ঝিনুক, শামুক প্রভৃতি কুড়োতে বেলাভূমিতে নামল। আমার ভাই প্রভাতও তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেল।

মণি নয়, মুক্তো নয়, হীরে-জহরৎ-পান্নাও নয়—তবু সবার কী আনন্দ! আজ যেখানে সূর্য্যকিরণে ঝিনুক, শামুক প্রভৃতি চক্‌চক্‌ কোরে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, একদিন সেখানে বিদীর্ণ শুক্তিপুট থেকে খসে যাওয়া মুক্তো পড়ে থাকতো থরে থরে। হয় ত সমুদ্র-সৈকতের সুদূর বিস্তৃত বালুকারাশির পানে তাকান যেত না—সূর্য্যের আলো সেই মুক্তায় প্রতিফলিত হয়ে সমস্ত সমুদ্রতটটি উজ্জ্বল কোরে রাখত—সমুজ্জ্বল দর্পণের মত চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত কোরে দিত। তাই মহাকবি কালিদাস সে যুগের বর্ণনায় রামচন্দ্রের উক্তিতে বলেছেন—

"সৈকতভিন্নশুক্তি-পর্য্যস্ত-মুক্তা পটলং"।

রত্নাকরের বেলাভূমি থেকে আহৃত এই অমূল্য স্মৃতিরত্ন-গুলিকে বাসে বোঝাই দিয়ে আমরা দর্ভশয়নের দিকে যাত্রা করলাম।

## দর্ভশয়নম্

রাও বললেন, "দর্ভশয়নকে সত্য বলে মানলে এই স্থানটিকে রামেশ্বর সেতুর প্রারম্ভ বলা উচিত। কারণ শোনা যায়, শ্রীরাম-চন্দ্র এখানে দর্ভ অর্থাৎ কুশের ওপর শয়ন কোরে * সেতু-বন্ধন মানসে বরুণদেবের উপাসনা করেন।

বললাম, "আমারো মনে হয়, এই দর্ভশয়নেই সেতুবন্ধের আরম্ভ। কারণ, রামনাদ দ্বীপের এক প্রান্তে এই দর্ভশয়ন।

দর্ভশয়নে পৌঁছুতে বারোটা বাজল।

মন্দিরে রামচন্দ্রের অনন্তশয়ন মূর্ত্তি দেখলাম। সঙ্গে দেবী নেই—দেখে মনে হলো, রামচন্দ্রের এ শয়ন-মূর্ত্তির পরিকল্পনা যে সময়ে, সে সময়ে সীতাদেবী অপহৃতা হয়েছেন, চেড়ী পরিবৃতা তিনি তখন রক্ষোপুরের অশোক কাননে চোখের জল ফেলছেন।

---

* সাগরের কূলে শয্যা করিলেন কুশে।
তদুপরি রহিলেন রাম উপবাসে ॥ (কৃত্তিবাসী রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড)

তাই রামচন্দ্রের এ মূর্ত্তির সঙ্গে বোধ হয় সীতা নেই। কিন্তু সোনার ভোগমূর্ত্তি আছে দেবীর।

শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য প্রব্রজ্যায় বেরিয়ে এখানে যে এসেছিলেন, সে কথা আমরা চৈতন্য-চরিতামৃয়ত পাই।

"কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেশন।
দুর্ব্বেশন-রঘুনাথে করি দরশন॥"

'দুর্ব্বেশন' কথাটি বোধ হয় ছন্দের আনুকূল্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি খুব সম্ভব দর্ভশয়নেরই অপভ্রংশ এবং 'দুর্ব্বেশন-রঘুনাথ'ই এই অনন্তশয়ন-মূর্ত্তি।

এ ছাড়া, আরো কয়েকটি মূর্ত্তি দেখলাম, যথা—জগন্নাথ স্বামী, মহালক্ষ্মী, হনুমান ইত্যাদি।

এখান থেকে বেরিয়ে একটু দূরে পুত্রকামীর হোম দর্শন করতে গেলাম। এখানে একটি বহু প্রাচীন অশ্বত্থ-বৃক্ষ তার বিপুল জটাজাল বিস্তার কোরে দাঁড়িয়ে আছে। এরই তলায় একজন পুত্রকামী হোম করছেন। পাণ্ডারা বললেন, এই প্রাচীন অশ্বত্থ-বৃক্ষের তলায় বসে হোম করলে অপুত্রকও পুত্রবান হয়। তারপর পুত্রলাভের পর সেই ব্যক্তি একটি নাগছত্রী দেব-মূর্ত্তি এর তলায় প্রতিষ্ঠা কোরে দেন।

দেখলাম, এই নাগছত্রী দেব-মূর্ত্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে অশ্বত্থ গাছের তলায়। ছোট ছোট মূর্ত্তিগুলি—মাথার ওপর বিকশিত ফণার সর্প-ছত্র।

এখান থেকে বেরিয়ে সেলুনে ফিরতে বেলা দুটো বাজল।

মাত্বরা—মীনাক্ষী মন্দিরের প্রাঙ্গণ ও অলিন্দ পৃঃ—২০৭
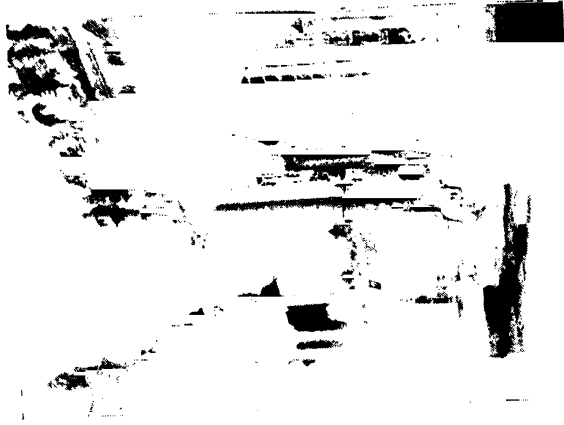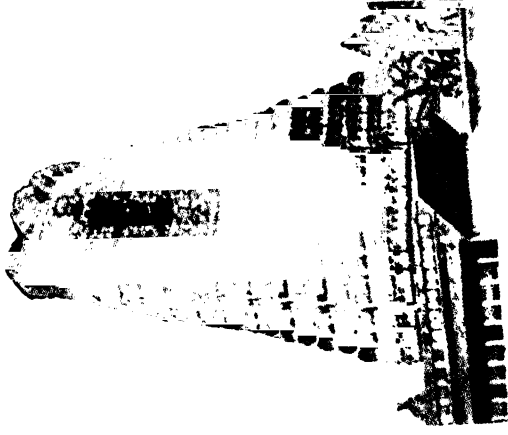
মাত্বরা মন্দিরের একটী গোপুর-দ্বার পৃঃ—২০৭

বিকেলের দিকে সহর দেখতে বেরুলাম। সেতুপতি রাজাদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দির এখানে আছে। এর মধ্যে প্রধান ও প্রসিদ্ধ হচ্চে, "রাজরাজেশ্বরী দেবী।" দেবী দর্শন কোরে বাজার থেকে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রাদি কিনে ফিরে এলাম।

মাদুরা যাবার পথে পশ্চিমঘাট—আমাদের ট্রেণের ছবি

রাত্রি আটটার সময় ট্রেণ এসে আমাদের সেলুন নিয়ে চললো মাদুরার পথে।

## মাদুরা

চলন্ত গাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া সেরে কটার সময় গাড়ীখানি মাদুরা পৌঁছোবে দেখবার জন্যে টাইম-টেব্‌ল ওলটাচ্ছি, এমন সময় মাদুরা স্টেশনে গাড়ীখানি প্রবেশ করল।

টাইম-টেব্‌ল রেখে উঠে বসলাম। গাড়ী থামবামাত্রই মিঃ নাইডু, (বার-এট-ল), ও রাধাকিষণ (য়্যাডভোকেট) আলাগার কয়েলের মন্দিরাধ্যক্ষ এসে আমাদের সেলুনের সামনে দাঁড়ালেন।

উভয় পক্ষেই অভিনন্দন, করমর্দ্দনও নমস্কারের পালা চললো। তারপর খানিকক্ষণ ধরে মন্দিরাদি দর্শনের ব্যবস্থা ঠিক কোরে রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বিদায় নিলেন। যাবার আগে বললেন, "কাল দেব দর্শনের জন্যে মোটর পাঠাবো।"
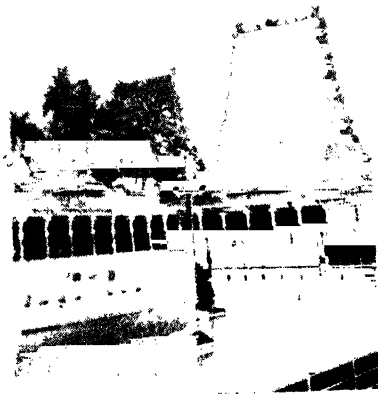
পরের দিন দু'খানি মোটর এসে উপস্থিত হল, বেলা তখনপ্রায় দশটা হবে। মোটরে উঠে আমরা মীনাক্ষী-মন্দির দেখবার জন্যে বেরুলাম। পনেরো মিনিট পরেই আমাদের মোটর বহু আকাঙ্ক্ষিত. সুবিখ্যাত মীনাক্ষী দেবীর মন্দির-দ্বারে পৌঁছোল। আমরা পৌঁছবামাত্রই মন্দিরের কর্ম্মাধ্যক্ষ এলেন। মিঃ নাইডু ব্যারিষ্টার হলেও এখানকার মন্দির-সমিতির একজিকিউটিভ অফিসার অর্থাৎ উচ্চপদস্থ একজন কর্ম্মচারী।

মাদুরা—মীনাক্ষী মন্দিরের গোপুরম্
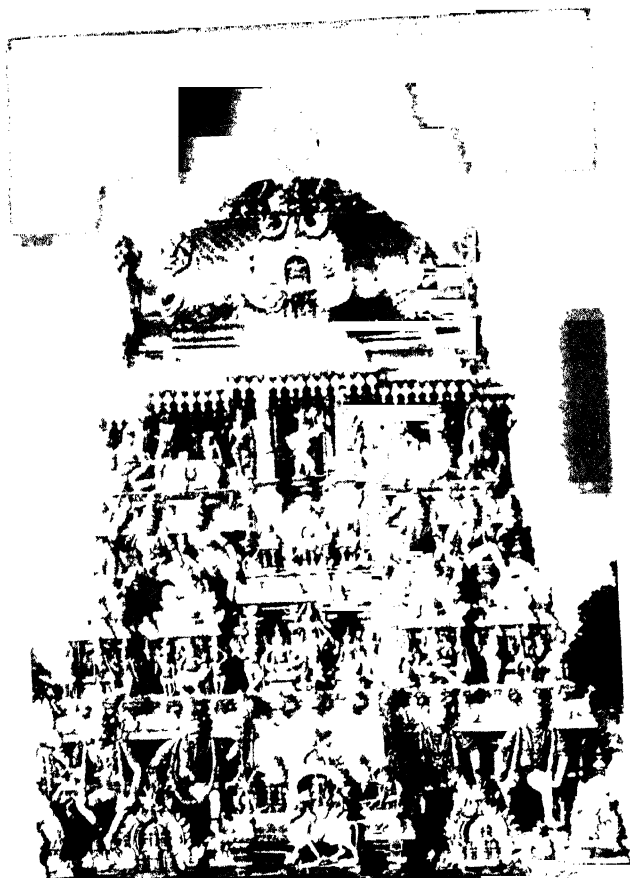
স্ববর্ণ-মন্দির—মাদুরা—পৃঃ ২০৯

কর্ম্মাধ্যক্ষের পেছনে পেছনে এলেন পুরোহিত, এলো প্রসাদী-ভস্ম, চন্দন, মাল্য প্রভৃতি আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে।

মাল্য, চন্দন, প্রসাদী-ভস্ম প্রভৃতিতে ভূষিত হয়ে আমরা মন্দিরের পূর্ব্ব দুয়ার ( গোপুরম্ ) দিয়ে প্রবেশ করলাম। এই গোপুর থেকে সোজাসুজি তাকালেই মূল মন্দির-দ্বার খোলা রয়েছে দেখা যায়। মূর্ত্তি অবশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না ; তার কারণ, মন্দিরের ভেতরটি অন্ধকার। কিন্তু এখানকার কোন মন্দিরে এ সুবিধাটি নেই। সব জায়গাতেই গোপুর পার হয়ে প্রাঙ্গণে পৌঁছুলে তবে দেব-দেবীর মূর্ত্তি দর্শন সম্ভব হয়। কিন্তু দেবী এখানে, সদয়া—করুণায় মূর্ত্তিমতী ; তাই বোধ হয় এমন সুবন্দোবস্ত। প্রথম তোরণ থেকে দেবীকে দেখা গেলেও আরো কয়েকটি তোরণ-দ্বার ও প্রাঙ্গণ পার হয়ে তবে দেবীর সন্নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়।

প্রথম গোপুর পার হয়েই আমরা অষ্টলক্ষ্মী মণ্ডপ দেখলাম। আটটি পাথরের লক্ষ্মীমূর্ত্তির ওপর মণ্ডপের ছাদটি স্থাপিত। এই মণ্ডপের তৈলচিত্রগুলি অনিন্দ্যসুন্দর। দেবীর কাহিনীকে অবলম্বন কোরে এই ছবিগুলি আঁকা।

মন্দিরের কর্ম্মাধ্যক্ষ আমাদিগকে এক একখানি ছবি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন :—"ইনি বিজয়নগরের রাজা, প্রায় তিন হাজার বছর আগে ইনি পুত্রেষ্ঠি-যজ্ঞ করেছিলেন। এই দেখুন, আর একখানি ছবি—এই যজ্ঞে আহুতি দেবার সময় পুত্রের বদলে রাজা এক কন্যা লাভ করলেন। মাছের মত চোখ বলে কন্যার নাম হল "মীনাক্ষী"। এই দেখুন, রাজার মৃত্যুর পর বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী

ছবিগুলি দেখে মন্দিরের দিকে আর কয়েক পদ অগ্রসর হতেই সম্মুখে দেখলাম, এক সারিতে চারটি হাতী, দুটি উট ও দুটি সজ্জিত বৃষ দাঁড়িয়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "এ সব কেন ?"

মন্দিরের কর্ম্মাধ্যক্ষ বিনীত হাস্যে নিবেদন করলেন, এ সব অতিথি সেবার জন্য।"

সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ-ঘণ্টা ও আরো নানা রকমের বাজনা-বাদ্য আরম্ভ হল। হাতী, উট, বৃষ প্রভৃতি এক সঙ্গে ডেকে উঠল।

আমাদিগকে সম্মান দেখাবার ঘটা দেখে মনটা খুসি হলো খুবই, কিন্তু সেই সঙ্গে অস্বস্তিও বোধ করতে লাগলাম। মনে হল, যেখানে আমরা এসেছি, সেখানে সম্মান-অসম্মানের কোন বালাই না থাকাই উচিত। যত সহজে এখানে আসা যায়, ততই শ্রেয়ঃ। এখানে সম্মানের, ভক্তির, শ্রদ্ধার পাত্র মাত্র একজন, যিনি ওই মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁর কাছে ছোট নেই, বড় নেই, সম্মান নেই, অসম্মান নেই। এ সবের অতীত না হলে, অর্থাৎ এ সবের মোহ ত্যাগ করতে না পারলে মানুষের কি এখানে ঠাঁই হয় ?

তবু সম্মানের এ অনুষ্ঠান নীরবে সইতে হল। কারণ, এক পক্ষ নিয়ে জগৎ নয়—সেখানে আর এক পক্ষও আছেন। লোকাচার ও দেশাচার নিয়ে পৃথিবী......আর এক জনের ইচ্ছার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার নাম সংসার। মিলন ও সংঘাত, এই দুয়ের ওপর ভিত্তি কোরেই সমস্ত পৃথিবী চলছে। আকর্ষণে পাছে নুঁয়ে পড়ে বলেই, বিকর্ষণ বলে আর একটা শক্তি আছে, যে তাকে

খাড়া করে রাখে। এই দুয়ের টানাটানির এমন মহিমা যে, পৃথিবী এরই জন্যে ভারসাম্য রক্ষা কোরে যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

চেয়ে দেখি, প্রভাত ইত্যবসরে ফটো তোলবার সরঞ্জাম বার কোরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ তোরণের ফটো তুলতে আরম্ভ করেছে। এখানে সর্ব্বসমেত ন'টি তোরণ-দ্বার। এতো তোরণ-দ্বার এর পূর্ব্বে আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। এক একটি তোরণ আট থেকে দশ তোলা পর্য্যন্ত। সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে যে, কোন তোরণ-দ্বারের কারুকার্য্য ও নির্ম্মাণ-কৌশল এক নয়। প্রত্যেকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ও স্বকীয় বৈচিত্র্যে পরিচিত।

দ্বিতীয় তোরণ-দ্বার হয়ে আমরা মূল মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মূল মন্দিরটি আটটি হাতীর ওপর অবস্থিত: অর্থাৎ আটটী দিক্‌পাল। রাওকে অনুসরণ কোরে এখানকার প্রথা অনুযায়ী আমরা দেবীর মন্দির প্রদক্ষিণ করলাম। প্রদক্ষিণ কালে পাণ্ডারা ছাদের ফাঁক দিয়ে মীনাক্ষী দেবীর ও সুন্দরেশ্বরের মন্দিরের চূড়া দেখালেন।

রাও বললেন, "মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের আয়তন শ্রীরঙ্গমের চেয়ে কিছু কম। হোক আয়তনে ছোট, কিন্তু একথা মানতে হবে যে, এমন কারুকার্য্যকুশলী অপূর্ব্ব মন্দির দক্ষিণ-ভারতে আর নেই, আর পৃথিবীর কোথাও যে আছে, তাও মনে হয় না। মন্দিরের প্রত্যেক স্তম্ভটি এক একখানি অখণ্ড পাথর থেকে কেটে ছেঁটে তৈরী কোরে তার ওপর খোদাই করা হয়েছে। কোথাও যোড় নেই। এমন স্তম্ভ একটি দুটি নয়, কতো যে আছে, তা

গণে শেষ করা যায় না। কতো সময়, কতো পরিশ্রম যে এর জন্যে ব্যয় হয়েছে, সে কথা কল্পনা করতে গিয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যেতে হয়।

মন্দিরের প্রাকারে প্রাকারে, অলিতে-গলিতে অসংখ্য দেব দেবীর মূর্ত্তি। এতো বেশী এর কারুকার্য্যের বহর যে, ভাল কোরে দেখতে হলে বোধ হয় এক মাস সময় লাগে। একদিন দুদিনে দেখে ফুরিয়ে ফেলবার বস্তু এ নয়।

স্থাপত্য বিদ্যা, প্রস্তরে উৎকীর্ণ রূপৈশ্বর্য্য প্রভৃতি যে কতো বিস্ময়কর, কতো অভাবনীয়, সে কথা লিখে বোঝান যায় না। বর্ণনায়, ভাষায়, কল্পনায়, ভঙ্গিতে, কিছুতেই এর ঐশ্বর্য্যের কথা চিত্রিত করা যায় না—এমনি অচিন্ত্যনীয় এর কীর্ত্তি। কী পরিশ্রম, কী সাধনা, কী প্রতিভা দিয়ে এর নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হয়েছিল, তা বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিও ধারণা করতে পারে না।

এ দেখলে, মানুষের বিস্ময় বলে আমি হার মেনেছি, কল্পনা বলে আমার সামান্য পুঁজির অনেক ঊর্দ্ধে এ-সব, সাধনা বলে সিদ্ধিরও বহির্ভূত এ-সব কীর্ত্তি-কৌশল।

মায়ের মন্দিরের তিনটি মহল। শেষ মহলটিতে দেবী মীনাক্ষী অধিষ্ঠিতা। নানালঙ্কারভূষিতা, প্রশান্তবদনা জননী মীনাক্ষীর সে গরিমাময় মূর্ত্তি আজো চোখ বুজলেই মনে পড়ে। কর্পূরালোকে দেবী দর্শন করলাম। কারণ, মন্দিরের ভেতরটি অন্ধকার। মায়ের সামনে দিবালোকেরও বোধ হয় প্রবেশাধিকার নেই।

দক্ষিণা দিয়ে মায়ের অর্চ্চনা ও আরতি করালাম। প্রজ্জ্বলিত

দীপমালার শিখালোকে মায়ের সেই অপার করুণামূর্ত্তি যেমন বর্ণনাতীত, তেমনি অপার্থিব।

মায়ের মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা বাবার মন্দিরে গেলাম। মহাদেব এখানে লিঙ্গমূর্ত্তি—নাম "সুন্দরেশ্বর"।

পুরোহিতের মুখে সুন্দরেশ্বর পৌরাণিক বৃত্তান্ত শুনলাম।

পুরাকালে ত্বষ্টার মহাপরাক্রমশালী পুত্র বৃত্রকে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র সংহার করেন। বৃত্রের ব্রাহ্মণত্ব ছিল, কাজেই ইন্দ্র ব্রহ্মবধ পাপে লিপ্ত হলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে এই পাপস্খলনের বিধান নিয়ে তিনি সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করতে লাগলেন। তীর্থদর্শন, তীর্থস্নান প্রভৃতি করতে করতে একদিন ইন্দ্র এই স্থানে আসেন। এখানে কদমের বনে প্রবেশ করতেই ইন্দ্রের ব্রহ্মবধ পাপ বিদূরিত হল। তিনি সাশ্চর্য্যে এর কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। অবশেষে কদমশাখা-সমাচ্ছন্ন এই গভীর বনে একটি শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হল।

তখন ইন্দ্র দিবারাত্রি ভক্তিভরে এই শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করতে লাগলেন এবং এঁর নাম দিলেন "সুন্দর"। এদিকে রাজার অভাবে স্বর্গরাজ্যে বিশৃঙ্খলতা দেখা দিলে। তখন মহাদেব লিঙ্গমূর্ত্তি থেকে আবির্ভূত হয়ে ইন্দ্রকে স্বর্গে ফিরে গিয়ে রাজ্য শাসনে মনোনিবেশ করতে আদেশ দিলেন।

দুঃখিত কণ্ঠে ইন্দ্র বললে, "প্রভু, তা হলে আপনার পূজার্চ্চনা কে করবে" ?

মহাদেব বললেন, "বৎসরের বৈশাখী পূর্ণিমায় তুমি এসে

আমার অর্চ্চনা করো, তা হলেই সারা বছরের পূজার্চ্চনা করা হবে।

হৃষ্টমনে ইন্দ্র ফিরে গেলেন।

বহুদিন পরে ধনসঞ্চয় নামে এক বণিক একদিন পথভ্রান্ত হয়ে কদমবনের ভেতর এই শিবলিঙ্গ দেখতে পায়। এ সংবাদ পৌঁছল কল্যাণপুরের রাজা কুলশেখরের কাছে। তিনি বারাণসী থেকে ব্রাহ্মণ আনিয়ে এঁর যথাবিহিত পূজা করলেন।

একদিন প্রত্যাদেশে রাজা কুলশেখর জানতে পারলেন যে, স্বয়ং মহাদেব তাকে এই স্থানের বনজঙ্গল কাটিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠার আদেশ দিচ্ছেন।

রাজা কুলশেখর মহাদেবের আদেশ পালন করলেন। রাজাধানী স্থাপনের পর কি নামকরণ হবে রাজধানীর, সেই নিয়ে রাজা চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

সেইদিন রাত্রে রাজা স্বপ্ন দেখলেন, রাজধানীর পথে পথে মহাদেব কমণ্ডলু থেকে অমৃত বিন্দু ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এটি রাজধানীর নামকরণের *জন্য* মহাদেবের ইঙ্গিত ভেবে তিনি এর নামকরণ করলেন "মধুরাপুর।" এই মধুরাপুরের অপভ্রংশ এখন মাদুরা হয়েছে।

চৈতন্যচরিতামৃতে এই মাদুরা বা মধুরাপুরকে দক্ষিণ-মথুরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাপ্রভু এখানে এসে রামদাস নামে জনৈক রামায়ত বৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। এই রামদাস নির্ব্বিঘ্নে উপবাস করছে দেখে মহাপ্রভু একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"বিপ্র কাহে কর উপবাস ?
কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ ?"

বিপ্র রামদাস তখন সখেদে দুঃখ নিবেদন করল—

"জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তারে—ইহা কর্ণে শুনি॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায়॥"

মহাপ্রভু তখন তাঁকে বোঝাতে লাগলেন—

"ঈশ্বরপ্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তারে দেখিতে নাহি শক্তি॥
*   *   *   *   *   *   *
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল॥
'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর'।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥"

ভক্ত রামদাস মহাপ্রভুর মুখনিসৃত এই উপদেশ-বাণী শুনে প্রীত হয়ে উপবাস ত্যাগ করেছিলেন।

সুন্দরেশ্বরের পূজার্চ্চনা শেষ কোরে আমরা মীনাক্ষী দেবীর যানবাহন, অলঙ্কার ইত্যাদি দেখতে গেলাম। মন্দির-কমিটি সযত্নে আমাদের এ গুলি দেখালেন। বাহনের মধ্যে একটি সোনার পাতে মোড়া ঘোড়া দেখলাম। দাম শুনলাম, ৩৫,০০০ টাকা।

মায়ের অলঙ্কার দেখলাম খুব পুরাতন গঠনের। গহনার মধ্যে মুক্তা, হীরা, চুনী, পান্না প্রভৃতি প্রচুরভাবে বসান আছে। চুনী, পান্নাগুলি আকাটা—অন্যান্য দেবদেবীর গহনার পাথরের মত 'ইংলিশ কাট' নয়। দুটি সোনার ঘড়াও দেখলাম। শুনলাম, ১৮৭৫ সালে সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজ হয়ে ভারতবর্ষে আসেন, তখন মীনাক্ষী দেবীর সিংহাসনের মুক্তাখচিত আবরণ তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে দেখাবার জন্য বিলেত নিয়ে যান। পরে অবশ্য সেটি প্রত্যর্পণ করেছিলেন।

এখানকার দেখা এক রকম মোটামুটি শেষ কোরে আলাগার কয়েল দেখতে গেলাম। কয়েল অর্থে মন্দির।

মন্দিরে যাবার পথে রাস্তার ধারে একটি মন্দির নজরে পড়ল।

রাওকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন, "এমনি মণ্ডপ আরো কয়েকটি দেখতে পাবেন—এগুলি আলাগার মন্দিরের বিষ্ণু দেবের বিশ্রাম-মণ্ডপ।"

বললাম "দেবতা কি সফরে বেরোন নাকি ?"

মৃদু হেসে রাও বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু বছরে মাত্র একবার।"

অর্থাৎ শুনলাম, সুন্দররাজ বিষ্ণুদেব সম্পর্কে মীনাক্ষীর ভাই; এবং ভগিনী প্রীতি আজো তার অটুট। সেই জন্যে এই তেরো মাইল অতিক্রম কোরে তিনি ভগিনী মীনাক্ষীর সঙ্গে দেখা করতে যান ও এই মণ্ডপে পথিমধ্যে বিশ্রাম করেন।

হঠাৎ মোটরখানা ঝাঁকানি দিয়ে থেমে গেল।

"কি হল ?" বলে ড্রাইভারের দিকে মুখ ফেরালাম।

দরজা খুলে নামতে নামতে ড্রাইভার বললে, "একটা গাছ পড়ে রাস্তা আটক হয়ে গেছে।"

গাছটিকে সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার কোরে মোটর চলতে আরো মিনিট দশেক ব্যয় হল।

*    *    *    *    *

আলাগার মন্দিবের সন্নিকটে যখন পৌঁছলাম, বেলা তখন প্রায় দেড়টা। পথে আসতে আসতে একটু দূবে একটি হাতীর আকারের পাহাড় দেখলাম।

আলাগাব মন্দির

রাও বললেন, ওর নীচেও ছোট ছোট মন্দির ও দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে।

আলাগার মন্দিরটিকে দুর্গ মন্দির বলা যায়। সমস্ত মন্দিরটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। শুনলাম, মুসলমানদের আক্রমণে এক সময় ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল। তাই, ভবিষ্যৎ ক্ষতি থেকে বাঁচাবার

জন্য প্রাচীর দিয়ে দুর্লঙ্ঘ্য না হোক অন্ততঃ কিছু পরিমাণে নিরাপদ করা হয়েছে।

শুনলাম, এই মন্দিরের আশ-পাশ খুঁড়ে গ্রীক ও রোমীয়দের পুরাকালের অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গেছে। আলাগার মন্দিরের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহোদয় নিষ্ঠাবান এবং পরোপকারী ব্যক্তি। হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুসংস্কৃতি প্রভৃতির উপর তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। সযত্নে রক্ষিত একটি প্রদর্শনী তিনি দেখালেন। এই প্রদর্শনীটিতে নানারকমের নানাদেশের মুদ্রা সঞ্চিত আছে। পুরোনো দিনের স্মৃতির জন্য যে সব শঙ্খ-ঘণ্টা প্রভৃতি ব্যবহার হতো, সেগুলিও তিনি সুন্দর কোরে সাজিয়ে রেখেছেন। এর মধ্যে একটি সোনা-বাঁধানো দক্ষিণাবর্ত্ত-শাঁখ দেখলাম। সকলেই জানেন দক্ষিণাবর্ত্ত-শাঁখের গুণাগুণ। সাধারণতঃ আমরা বামাবর্ত্ত-শাঁখই ব্যবহার করি। শোনা যায়, দক্ষিণাবর্ত্ত-শাঁখ খুবই শ্রী সম্পন্ন......স্বয়ং লক্ষ্মী নাকি এই শাঁখের মধ্যে অধিষ্ঠিতা।

এ ছাড়া, কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের আর একটি সদনুষ্ঠানের কথা শুনলাম। একটি গুরুকুল শিক্ষা-সমিতি স্থাপন কোরে তিনি স্থানীয় ছাত্রদের সংস্কৃত, তামিল, অঙ্ক, ইংরাজী প্রভৃতি শিক্ষা দেন। এ-সব ছাড়া, অনেক প্রকার অর্থকরী শিল্পবিদ্যা, যেমন—তাঁত-বোনা, কাগজ তৈরী প্রভৃতিও শেখানো হয়।

দরকার না থাকলেও এঁদের শিল্পশিক্ষাশ্রমের তৈরী তোয়ালে কয়েকটি কিনলাম—উৎসাহ দেবার জন্য।

মনে মনে ভদ্রলোককে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলাম। সত্যি ত,

এ কী কম শুভ প্রচেষ্টা ? এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষক সম্প্রদায়। চাষবাস প্রভৃতিতে ছেলেবেলা থেকেই তারা নিযুক্ত হয়, শিক্ষার আলো দেখা এদের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। সুতরাং, এদের শিক্ষার ভার যিনি গ্রহণ করেছেন, তাঁর দেশপ্রীতি, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা যে কী পরিমাণ, তা সহজেই অনুমেয়।

মন্দিরে বিগ্রহ দেখলাম--কালো পাথরের দণ্ডায়মান বিষ্ণু-মূর্ত্তি। কাছেই ভোগমূর্ত্তিও বিরাজমান—সোনার।

দেবতার পূজার্চ্চনা সেরে দেবী দর্শনে গেলাম। দেবীর নাম "কল্যাণ সুরবল্লী"।

দেবী দর্শনের পর কর্ম্মাধ্যক্ষ আমাদিগকে দেব-দেবীর 'পোষাক-আসাক,' আভরণ ইত্যাদি দেখাবার জন্য নিয়ে গেলেন।

হাতীর দাঁতের তৈরী একটি সিংহাসন দেখলাম। ভেঙে যাওয়াতে সেটি এখন অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়ে আছে। এই সিংহাসনটি দিয়েছিলেন ধর্ম্মপ্রাণ রাজা তিরুমল নায়েক। সিংহাসনের কারুকার্য্যগুলি সুন্দর—এমন কি, কোন কোন স্থানে বিস্ময়কর। ছোট ছোট মূর্ত্তিগুলি আগে সিংহাসন সংলগ্ন ছিল, সেগুলি দেখলাম। কী সূক্ষ্ম এর কারুকার্য্য !

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা মণ্ডপের ছাদে উঠলাম। এখান থেকে সুন্দররাজের মন্দিরের চূড়ায় যে সোনার ধ্বজাটি আছে, সেটি স্পষ্ট দেখা যায়।

বেশ দেখায় মণ্ডপের ছাদ থেকে চারিদিকের দৃশ্য ! পাহাড়ের

ওপর মন্দিরটি, কাজেই আশে-পাশের সমস্ত জমি ও শস্যক্ষেত্রগুলি অনেক নীচুতে।

শুনলাম, এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই চাষবাস করে খায়। ওপরে আকাশ, আর নীচে মৃত্তিকা ......এরই মায়ায় এরা এই পাহাড়তলীতে বাঁধা পড়ে আছে। চাষাদের ভক্তিও খুব। প্রতি বছর, শস্য মাঠ থেকে উঠে যায়—তখন, নিজেরা ব্যবহার করবার আগে এরা কিছু পরিমাণ দেবতাকে নিবেদন করে। পরের বছর চাষ করবার সময় সেই নিবেদন-করা শস্য এক মুঠো নিজে গিয়ে বীজের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন চাষ আরম্ভ করে। এদের বিশ্বাস, এই প্রসাদী-বীজ মিশিয়ে চাষ করলে সুন্দররাজের কৃপায় শস্যসম্ভারে মাঠ উপচে পড়বে। হয়ও তাই—এ বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখেন দেবতা এবং এখানকার অধিবাসীরা সুন্দররাজের কৃপা ও মৃত্তিকা-মায়ের অপার করুণায় কাঞ্চন-সম্পদে ধনবান না হলেও শস্য-সম্পদে বিশেষ ধনবান।

আলাগার মন্দির থেকে বিদায় নিয়ে মোটরে উঠলাম সেলুনে ফেরবার জন্য। সমস্ত রাস্তাটি এলাম মন্দির-দর্শন জনিত আনন্দ উপভোগ করতে করতে। মন্দিরটির বেশ একটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ স্থানটি নির্জ্জন, দ্বিতীয়তঃ এর চারিধারের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে, তা সত্যিই মনোরম। তৃতীয়তঃ এখানকার প্রদর্শনী, মন্দিরের কর্ম্মাধ্যক্ষের ব্যবহার ও অমায়িকতা—দুইই বেশ আনন্দ-দায়ক।

সূর্য্যালোক হরিদ্রাভ হয়ে বেলা পড়তে আরম্ভ করেছে, এমন সময় আমরা সেলুনে এসে পৌঁছুলাম।

প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যালোকে আবার আমরা বেরুলাম সুব্রহ্মণ্য দেবের অর্থাৎ কার্ত্তিকের মন্দির দেখতে। স্টেশন থেকে প্রায় মাইল চারেক হবে মন্দিরটি। যে পাহাড়ে মন্দিরটি অবস্থিত, তার নাম "তিরুপ্রণকুন্তম্" বা "স্কন্দমলয়ম্"। এই পাহাড়ের খানিকটা কেটে মন্দির তৈরী করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্য মন্দিরগুলি যেমন পাহাড়ের ওপরে তৈরী করা হয়েছে, এটি সে রকম নয়। আদত পাহাড়টীর কতক অংশ কেটে মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে। রাস্তা থেকে একেবারে মন্দিরের সিঁড়ি আরম্ভ। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙ্গে মন্দিরে পৌঁছুতে হয়। বেশ নিখুঁত উৎকীর্ণ শিল্প। আর বিস্ময়ের বস্তু এইটি যে, কতো যুগ যুগ কেটে গেছে, কালপ্রবাহ হু হু করে বয়ে গেছে, তবু কোথাও এতটুকু বিমলিন হয় নি—আজো জীবন্তের মৃত স্পষ্ট, প্রাণবান।

সুব্রহ্মণ্য মন্দির থেকে বেরিয়ে ঠিক করলাম, যাবার পথে মীনাক্ষী মন্দির হয়ে তবে সেলুনে ফিরব।

খানিক দূর পথ এসে সুব্বারাও বললেন, "মোটর থামান, এখানে একটি বিষ্ণু মন্দির আছে, চলুন দেখিয়ে আনি।"

গাড়ী থেকে নেমে সেই ছোট বিষ্ণু মন্দিরটিও দেখলাম। দেখে ফিরে এলাম মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরে।

এখানকার প্রথম গোপুর দ্বারে এসেই আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম। দিবালোকে দেখেছিলাম এর অপূর্ব্ব স্থাপত্য

শিল্প, অচিন্ত্যনীয় ভাস্কর্য্য-প্রতিভা আর রাত্রে দেখলাম, দীপমালা-সুশোভিত, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য মণ্ডিতমন্দির। প্রথম গোপুর থেকেই দেখলাম মায়ের সস্মিতবদন মুখখানি জ্বল জ্বল করছে আলোর ছটায়।

প্রথম গোপুর দিয়ে প্রবেশ কোরে দেখলাম, চারিদিকে কেবল আলো—দীপমালা ঝলমল করছে চারিদিকে।

রাও বললেন, "এই যে সব বড় বড় দীপের ঝাড় দেখছেন, সব কুম্ভকোনামের"।

হাজার হাজার প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত মন্দিরের ভেতর যত যেতে লাগলাম, মনে হতে লাগল, এ যেন এক নতুন দেশে এসেছি—কল্পনার স্বর্গরাজ্য বোধ হয় এই। মায়ের মন্দির-দুয়ারে দীপ-সজ্জায় লেখা আছে—ওঁ। ওঙ্কারের এই আলোক-রশ্মি প্রস্তরে প্রতিফলিত হয়ে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে। এরই ঠিক নীচে যেন মীনাক্ষীদেবীর মূর্ত্তি বিরাজ করছে।

যেদিকে চাই, সেই দিকেই আলো, সজ্জিত দীপমাল্য······ দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়ে আসে।

দ্বারে দ্বারে দীপমালা অপূর্ব্ব মূরতি।
স্নেহ করুণায় দেবী চির মূর্ত্তিমতী॥

রাত্রে মীনাক্ষীদেবীর মন্দির যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, তা বলে বোঝান সম্ভব নয়।

রাত্রি ন'টার পর মায়ের শয়নারতি আরম্ভ হল। আরতির পর সুন্দরেশ্বরের ভোগমূর্ত্তিকে ব্রাহ্মণেরা পাল্‌কীতে কোরে বয়ে নিয়ে এলেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে আবহ-সঙ্গীতের মত

শানাই বাজতে লাগল। সুন্দরেশ্বরের ভোগ-মূর্ত্তিকে আনবার পথে প্রাঙ্গণের কয়েকটি স্তম্ভের কাছে দাঁড় করিয়ে আরতি হতে দেখলাম।

নাইডু মশায় সঙ্গে ছিলেন, তিনি এই প্রকার আরতির মানে বুঝিয়ে দিলেন ; বললেন, "মন্দির সংস্কার প্রভৃতির জন্যে যে সব মহান পুরুষেরা অর্থ, ভূসম্পত্তি প্রভৃতি দান করেছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করবার জন্যে নির্দ্দিষ্ট স্তম্ভের কাছে থামিয়ে আরতি করা হচ্ছে। এই আরতির জন্যে যা খরচ, তা সমস্ত তাঁদের প্রদত্ত সম্পত্তির আয় থেকেই সম্পন্ন হয়।"

আগে মন্দিরে দেবদাসীর প্রচলন ছিল। দেবদাসীরা এই সময়ে অথবা অন্যান্য উৎসব প্রভৃতিতে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করতেন। কিন্তু, আজকাল সে সব ব্যবস্থা নেই। যন্ত্রবাদ্য ও পুরুষ গায়ক দ্বারা উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত—এই সবেরই প্রচলন হয়েছে।

এই রকম আরতি প্রায় আঠারো উনিশবার হল। এমনি কোরে আরতিগুলি শেষ কোরে অবশেষে সুন্দরেশ্বর এসে পৌঁছুলেন দেবীর কাছে। ঈশ্বরকে ঈশ্বরীর কাছে সমর্পন কোবে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ভগবান ও ভগবতী চোখের অন্তরালে চলে গেলেন।

এই আলোকোদ্ভাসিত মন্দির, এমন কল্পনা-পরাজিত স্বর্গ-রাজত্বের মত মন্দিরের পারিপার্শ্বিকতা, কেমন যেন বিহ্বল হয়ে এই সব অনুষ্ঠান দেখছিলাম। সমস্ত মনটা লঘুপক্ষ ভ্রমরের মত ভগবান ও ভগবতীর রাঙা চরণ-পদ্মের কাছে গুঞ্জন কোরে ফিরছিল।

অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান হল সব। সমস্ত মন নিবেদনের মূহ্যমান কাতরতায় ফুঁপিয়ে উঠল—

এখনো মেটেনি দেখার সাধ
ঘোচেনিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব,
খোলো আরবার মন্দির দ্বার,
এখনি কোরো না বন্ধ।

তবু দ্বার খুলল না। ফিরে এলাম স্বপ্নাচ্ছন্নের মত। নিয়ে এলাম সঙ্গে কোরে আনন্দের মুকুলমাল্য—যা চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে, প্রস্ফুটিত হয়ে ঝরে যাবার ভয় নেই।

পথে আসতে আসতে বারবার কোরে মনে মনে বললাম, দেবী মীনাক্ষী, তোমায় প্রণাম—দেব সুন্দরেশ্বর, তোমায় প্রণাম।...... আর প্রণাম সেই সব গুণী, জ্ঞানী, মহান, ব্যক্তিদের—যাঁরা বুদ্ধি, কৌশল, আপ্রাণ চেষ্টা, প্রতিভা দিয়ে তিল তিল কোরে মন্দিরের মাঝে এমন জীবন্ত রূপ দান কোরেছেন। সবশেষে প্রণাম করলাম হিন্দু স্থাপত্যশিল্পকে—যে কীর্ত্তি জগতের সমস্ত মানবজাতিকে উন্নত ও প্রতিভাবান কোরে তোলবার প্রেরণা জুগিয়েছে।

পরের দিন আবার গেলাম মীনাক্ষী-মন্দিরে।

দেখা আর শেষ হয় না। দেখে দেখে মন যেন আর কিছুতেই ভরে না। সৌন্দর্য্য যেখানে অখণ্ড, সহস্রমুখী, সামান্য দুটি চোখ দিয়ে দেখে কিছুতে কি তৃপ্তি হয়? মনে হয়, আরো দেখি, আরো......আরো—পর্ণপুটের মত ছোট্ট মনটুকুতে এখানকার সমস্ত সৌন্দর্য্য ভরে নিয়ে যাই। এই সৌন্দর্য্যই ত

ভগবান—না হলে ভগবানের নাম হয় সুন্দরেশ্বর ! কিন্তু এ দুরাশার অণুপাতে সামর্থ্য আমাদের কতোটুকু ? বিন্দুর মধ্যে কি বিশালকে বাঁধা যায় ? ছোট মেয়ের পৃথিবীকে আঁচলের খুঁটে বাঁধবার কল্পনার মতই এ আশা অসম্ভব।

আজ সহস্রস্তম্ভ-মণ্ডপটি ভালো কোরে দেখলাম। ধারণা করা যায় না, এর বিশালত্ব এবং কারুকার্য্যের ঐশ্বর্য্য। এতো প্রাণবন্ত যে, এর মাঝে দাঁড়িয়ে বর্ত্তমানকে অতিক্রম কোরে অনায়াসে সেই সুদূর অতীতের যুগে ফিরে যাওয়া যায়। বেশ অনুভব করলাম সেই অতীত যুগের দিন—যে দিন সহস্র সহস্র প্রতিভাবান ভাস্কর তাদের প্রখর দৃষ্টি আর শক্তিশালী বাহু নিয়ে একটু একটু কোরে পাথরের গায়ে এমনি কোরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

কথায় বলি, পাষাণের কি প্রাণ আছে ! কিন্তু মীনাক্ষী-মন্দির দেখলে আর সে কথা বলতে ইচ্ছে হবে না। যেখানে ভগবান জাগ্রত, সেখানে নিষ্প্রাণ পাথরও প্রতিভাবান ভাস্করের সোনার কাঠির পরশে ঘুমন্ত রাজকন্যার মত জেগে উঠেছে……চোখ মেলেছে। সাধনা একেই বলে—আর অনন্তকালের এই যে সব সাক্ষী, এরাই ত সিদ্ধি।

কয়েকটি পাথরের থাম দেখলাম এক জায়গায়। মন্দিরের কর্ম্মাধ্যক্ষ বললেন, এটি সপ্তসুর-স্তম্ভ ; অর্থাৎ এই সাতটি পাথরের থামে লৌহকীলক দিয়ে আঘাত করলে সপ্তসুর বাজবে। আমাদের সামনে বাজিয়ে দেখানো হল সেই সঙ্গে।

কী অপূর্ব্ব প্রতিভা বলুন তো ! পাথর কেটে কেটে যে এই সপ্তসুরের সৃষ্টি করেছে, কী সুরেলা কান তার !

সমস্ত মন্দির-প্রাঙ্গণ, গোপুর প্রভৃতি আর একবার ঘুরে ঘুরে দেখলাম। আজ মাদুরা থেকে চলে যাব, মীনাক্ষীর মন্দির থেকে দূরে চলে যাব সবাই। হয়ত ভাগ্যে আর কোন দিন দেখা হবে না। কিন্তু যা দেখে গেলাম, কোন দিন কোন কারণে মনের প্রচ্ছদপট থেকে সে সব মুছবে না, মুছতে পারেও না।

বাইরে এসে মাদুরার শাড়ী কয়েকখানি কিনব বলে দোকানে ঢুকলাম। এখানকার চুড়ি খুব বিখ্যাত এবং মেয়েদের ধারণা, এই চুড়িগুলি নাকি খুবই পবিত্র। কাজেই, খুকুমণি ও আমার স্ত্রী চুড়ি পছন্দ করতে লাগলেন। সেই অবসরে রাও আমাকে ইঙ্গিত করলেন এবং চুপিচুপি বললেন যে, মান্দ্রাজে এই সমস্ত বস্ত্র-ব্যবসায়ীরই দোকান আছে, অতএব এখান থেকে কিনে বোঝা বয়ে কি লাভ ?

শাড়ী কেনা হতে কাজেই নিরস্ত হতে হল।

সেলুনে যখন ফিরলাম, তখন মনটা খুবই বিমর্ষ......আসন্ন বিদায়-ব্যথায় বিধুর......বিভ্রান্ত। বারবার কোরে কেবলই মনে হতে লাগল—কাল এ সব ছেড়ে যেতে হবে।

———

# ত্রিবেন্দ্রাম্

গত কাল রাত্রে মাদুরাকে বিদায়-অভিনন্দন জানিয়ে আমরা যাত্রা করেছিলাম। আজ ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় সুপ্রভাত জানিয়ে আমাদের সেলুন দাঁড়ালো ত্রিবেন্দ্রাম্ স্টেশনে। সহরের নামও ত্রিবেন্দ্রাম্। ত্রিবেন্দ্রাম্ সহরটি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী।
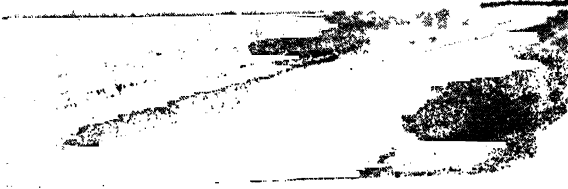
সমুদ্র-তীর—ত্রিবেন্দ্রাম্

তামিল ভাষায় ত্রিবেন্দ্রামের নাম "তিরুবন্তীপুরম্"। তিরু অর্থে শ্রী, অবন্তীপুরম্ অর্থে আনন্দনগর (তিরু + অবন্তীপুবম্ = তিরুবন্তী-পুরম্। তামিল ব্যাকরণে উ + অ = ব হয়।)

রাও আর আমি বসে বসে ত্রিবেন্দ্রামের এই নামেতিহাসের কথা আলোচনা করছি, এমন সময় একজন ভদ্রলোক আমাদের সেলুনের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি মিঃ চৌধুরী?" বললাম, "হ্যাঁ। মশায়ের পরিচয় জানতে পারি কি?"

জবাবে ভদ্রলোক বললেন, "আমি আসছি মহারাজার অতিথি-সম্বর্দ্ধনা আপিসের পক্ষ থেকে। আমি ওখানকারই একজন কর্ম্মচারী।"

"ধন্যবাদ আপনার মহারাজকে ও আপনাকে" বলে তাঁকে ভেতরে ডেকে এনে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলাম।

আসন গ্রহণ কোরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা আপনারা ভারতীয় অতিথশালায় থাকবেন, না ইউরোপীয় অতিথ-শালায় বন্দোবস্ত করব ?"

বললাম, "কোন্‌টায় গিয়ে উঠলে আমাদের সুবিধে হবে বলে মনে হয় ?"

প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোক বললেন, "সুযোগ-সুবিধার অভাব কোনটাতেই নেই। তবে যেটাতে যাঁর রুচি। হিন্দুয়ানী বজায় কোরে থাকতে হলে ভারতীয় অতিথশালাই প্রশস্ত। সেই কথা আন্দাজ কোরে পদ্মবিলাসে আপনাদের বন্দোবস্ত কোরে রাখা হয়েছে। এখন বলুন কোন্‌টায় অভিরুচি ?"

বললাম, "নামটি বেশ ত—পদ্মবিলাস। এটি কি সহরের একটি জায়গা ?"

হেসে ভদ্রলোক বললেন, "না। মহারাজার একটি বাড়ীর নাম। এই বাড়ীতে আপনারা চলুন ; এখানে ভারতীয় প্রথায় ( Indian style ) খুব আরামে থাকতে পারবেন।"

সেই ভাল। রাজি হয়ে গেলাম। কারণ, সঙ্গে বিলুর মা ও সহধর্ম্মিণী আছেন। আমার খুকুমণিও এ বিষয়ে কম সতর্ক নন।

পুরুষদের বাচ-বিচার আর মেয়েদের বাচ-বিচারে তফাৎ আকাশ-পাতাল।

রাজ-সরকার থেকে দু'খানি বৃহদাকার মোটর এসেছিল আমাদের জন্যে। বললাম, "মোটর দুটি কেন খামোকা দাঁড়িয়ে থাকবে। এখন যাক, বরং ন'টার পর পাঠিয়ে দেবেন।"

'যথা আজ্ঞা' বলে নমস্কারমের পালা সেরে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

ঠিক সময়মত মোটরগাড়ী দু'খানি আবার ফিরে এলো।

ততক্ষণে আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাপন কোরে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছি। দু-এক দিনের আবশ্যকীয় জিনিষপত্র প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে পদ্মবিলাসে গিয়ে উঠলাম। স্টেশন থেকে পদ্মবিলাসের দূরত্ব খুবই কম। মোটরযোগে মিনিট পাঁচেকের বেশী নয়।

'পদ্মবিলাস'—নামের মতনই সুন্দর বাড়ীখানি। শুনলাম, আগে এই বাড়ীখানিতে মহারাজার পিতৃস্বসা বাস করতেন। বাড়ীর ভেতর প্রাচীর-ঘেরা বাগানটি চমৎকার। নানা রকমের ফুল ও ফলের গাছে বাগানটি ভরে আছে। সে সময়টি ফাল্গুনের মাঝামাঝি......গাছের পাতা ঝরতে সুরু করেছে......মাঝে মাঝে জাগছে নব কিশলয়ের ইঙ্গিত। যারা ঝরে যাচ্ছে, তারা বলছে :—

যাওয়ার মাঝে রেখে গেলাম
ফিরে আসার আশা।

নবীনতার মাঝে আবার
শুনবে মোদের ভাষা ॥

আর যারা ভরে উঠছে নবীনতায়, তারা বলছে ঃ—

ঝরে যাওয়া মিছে শুধু
ভরে ওঠাই সব।
নতুন রূপে নতুন ভাবে
নবীন অনুভব ॥

গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, ফলে ফুলে—সর্ব্বত্র এই বাণী··· চিরন্তনের এই নিত্য কালেব কানাকানি চলেছে। সবার বেলাতেই এই কথা। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর মাঝে এই রহস্য-কথাই আভাষ-ইঙ্গিতে, ভাবে-ভঙ্গিতে রূপ পাচ্ছে।

মানুষের ভেতরও এই। দেহ হল আত্মার আবরণ—আত্মা নিত্যকালের। দেহ মরে কিন্তু আত্মা মরে না। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্য স্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য ······ইত্যাদি।

বাগানটি ঘুরে দেখতে দেখতে এক জায়গায় একটি কাঁঠাল গাছ দেখলাম। ফুল-ছাড়া কুশী, ছোট ছোট ফল, মাঝারী, আবার পাকাও আছে। এই অতি ক্ষুদ্র হতে বৃহৎ ও পাকা ফল এক কাঁঠাল গাছে ফলতে এর আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে

হয় না। শৈশব থেকে বার্দ্ধক্যের কালপ্রবাহকে, জীবনের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন স্তরকে একই পরিধির মাঝে এ যেন বেঁধে রেখেছে।

এক রকম ফলের গাছ দেখলাম। সম্ভবতঃ বিলিতি গাছ—নাম বললেন, ব্রেড-ফ্রুট ট্রি, অর্থাৎ বাংলা করলে দাঁড়ায় রুটি-ফলের গাছ। মানে, এই গাছের ফলের খোসা বাদ দিয়ে এ থেকে রুটি তৈরী করা যায়।

এখানে একটী নাগ-লিঙ্গের গাছও দেখলাম—ফুলগুলি সর্পছত্রী শিব লিঙ্গের ন্যায়। কলিকাতা আলিপুরের Horticultural Society-র বাগানে, ইডন্ গার্ডেনে ও বোটানিকাল গার্ডেনেও এই গাছ আছে। ইহার ফল কামানের গোলার ন্যায় আকৃতি; তাই ইংরাজীতে ইহাকে cannon ball tree বলে।

খানিক পরে মহারাজার মোটরে কোরে সহর দেখতে বেরোন গেল। প্রথমে দেখলাম এখানকার সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, অর্থাৎ সরকারী দপ্তরখানা। কাছাকাছি হাসপাতাল, হাইকোর্ট প্রভৃতিও দেখা গেল।

পথের মাঝে পথরক্ষীরা একবার গাড়ী আটকালে। শুনলাম, রাজার গাড়ী এই রাস্তা দিয়ে যাবে।

খানিক পরেই মহারাজার বিপুলকায় গাড়ীখানি আমাদের সামনে দিয়ে গেল। আমাদের গাড়ীর ড্রাইভার মহারাজকে নমস্কার করলে, আমিও অতিথিবৎসল রাজাকে হাত তুলে নমস্কার জানালাম।

সহরের অন্যান্য রাস্তাগুলি ঘুরে মহিলা কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ প্রভৃতি দেখে পশুশালায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। পশু-শালাটি ছোট হলেও এর বন্দোবস্ত বেশ সুন্দর। পশুগুলি বাগানের ভেতর থাকে—বিলিতি পার্ক ধরণের তৈরী এ বাগানটি। কৃত্রিম জঙ্গল তৈরী কোরে তাদের বিচরণ করতে দেওয়া হয়েছে। দেখে মনে হল, এ বন্দোবস্তের দৌলতে পশুরা বেশ ভালই আছে।

আজ সোমবার বলে যাদুঘর বন্ধ ছিল, কাজেই এটি দেখা হল না। পশুশালা থেকে বেরিয়ে আমরা Government Arts & Crafts-এর সৌধে প্রবেশ করলাম।

এখানকার আয়োজনও প্রচুর। হাতীর দাঁতের তৈরী কতকগুলি কারুকার্য্যসমন্বিত সৌখীন দ্রব্য প্রভাত পছন্দ কোরে কিনলে। আর কেনা হল, নারিকেলমালার তৈরী কতকগুলি দ্রব্য। এগুলি ত্রিবাঙ্কুরের বৈশিষ্ট্য—অপর কোন জায়গায় এ সব পাওয়া যায় না। যা যায়, তা এখান থেকেই চালান হয়। নারিকেলের ছোবড়া থেকে তৈরী এমন সুন্দর গালচে-পাপোষ প্রভৃতি সাজানো আছে যে, দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে।

দেখা শেষ কোরে ফিরে এলাম পদ্মবিলাসে। আহারাদি সেরে রোজনামচার খাতা খুলে বসলাম। লেখবার আগে ভাবছি, ত্রিবেন্দ্রাম্ সহরে কী নেই? ভারতবর্ষের বড় বড় সহরের মত সব জিনিষই এখানে আছে। তা ছাড়া, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও কি মনোরম! এক দিকে আরব সাগরের তরঙ্গবিধৌত

উপকূল, আর এক দিকে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণী। সমুদ্র আর পর্ব্বত—ভারতের সৌন্দর্য্যসম্পদের সবটুকুই ত এর আশেপাশে বর্ত্তমান !

হঠাৎ রাওয়ের সঙ্গে অতিথি-সম্বর্দ্ধনা আপিসের সেই কর্ম্মচারীটি ঢুকলেন।

'আসুন' বলে উঠে বসলাম।

"মোটর আনতে বলে দোব কি ? 'ওয়ারকলম্' যাবেন ত ?"

বললাম, "হ্যাঁ যাব।"

রাও জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোককে, "স্টেটের মোটরে সহরের বাইরে বেড়াবার ত হুকুম নেই বলেই শুনেছি।"

তিনি জবাব দিলেন, "সে সাধারণ অতিথির জন্যে—ইনি রাজার খাস-অতিথি।"

"তাই নাকি ?" রাও আমার দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালেন।

বললাম, "এমন অসাধারণ এবং রাজার খাস-অতিথি কেমন কোরে হলাম, তাত জানি না !"

'তবে পাঠিয়ে দিই গে', বলে মোটর পাঠাবার জন্যে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন, আর রাও গেলেন প্রস্তুত হয়ে নেবার জন্যে।

রাজার খাস-অতিথি ! মনে আনন্দ হল প্রচুর। বুঝলাম, এ সব শুধু বৈবাহিক স্যর বি, এল, মিত্রের দৌলতে।

এখানকার দেওয়ান স্যর সি, পি, রামস্বামী আয়ার বৈবাহিক মহাশয়ের সুহৃদ। সুতরাং এ সৌভাগ্য পাওয়া বিশেষ কিছু আশ্চর্য্যের নয়।

খানিক পরেই আমাদের মোটর এসে উপস্থিত হল। “ওয়ারকলম্” বা জনার্দ্দন যাবার জন্যে বেরোন গেল।

মোটরে উঠে রাওকে জিজ্ঞেস করলাম, “কতোটা রাস্তা হবে এই জনার্দ্দন মন্দির?”

বললেন, “প্রায় ছাব্বিশ মাইল হবে।”

খানিক পরে সহর পার হয়ে আমাদের মোটর পাহাড়ে-রাস্তা ধরল। এই অসমতল রাস্তায় কখনো গাড়ীখানি ওপরে ওঠে, কখনো নীচে নামে। যখন ওপরের দিকে ওঠে, এক একবার মনে হয়, আর বোধ হয় রাস্তা নেই, এই খানেই শেষ। আবার উঁচু জায়গায় শেষ সীমায় পেঁছুলেই দেখি, অনেক দূর পর্য্যন্ত সর্পিল রাস্তাটি আঁকাবাঁকা ভঙ্গিতে দিগন্ত রেখার কোলে মিশে গেছে। দূরের গাছ-পালাগুলি সাজান রয়েছে যেন ছবির মত। পথের দু’ পাশে কেবলই চলেছে দীর্ঘ নারিকেলগাছের আর ঘোমটা-টানা কলাগাছের সারি। কলাগাছে ঢালু পাতার মসৃণ ঐশ্বর্য্যে পড়ন্ত রোদের আলো পড়েছে—যেমন মনোরম তেমনি সুন্দর। এরাই এ অঞ্চলের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য দাবি করতে পারে। পাহাড়ের গায়ে কোথাও কোথাও সমতল ভূমি...শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ। বসন্তের প্রারম্ভ। কখনো কখনো পাখীর ডাকে মন সচকিত হয়ে উঠছে। পাশের ধানজমিগুলির দিকে চাইলে কল্পনা যেন পেয়ে বসে। কোন কোন মাঠে ধানকাটা হয়েছে, কোথাও বা লতিয়ে-পড়া ধান্যমঞ্জরীতে ভরে আছে ক্ষেত্রগুলি। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অধিকাংশ স্থানেই রবারের (India rubber) প্রচুর চাষ হয়। বোধ হয়

এত রবার চাষ ভারতবর্ষের আর কোথাও হয় না; আর প্রায় সকল তালুকেই (Tapioca) টেপিওকার চাষ হয়। এই গাছের ক্বাথ হতে একপ্রকার সাবু জাতীয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়। বহু-বিস্তর টেপিওকা দেশবিদেশে চালান হয়।

দু'ধার দেখতে দেখতে চলেছিলাম, আর ভাবছিলাম মনে মনে, ধন্য আমরা যে এই ভারতবর্ষে জন্মেছি। এর মাটিতে সোনা ফলে।

জনার্দ্দন বা ওয়ারকলমের একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে।

পুরাকালে একদিন বিষ্ণু, নারদ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মার সামনে এসে দাঁড়ালেন। সাষ্টাঙ্গে বিষ্ণুকে প্রণাম করলেন ব্রহ্মা। প্রণাম শেষ হলে মুখ তুলে চাইতেই দেখলেন বিষ্ণু অন্তর্হিত হয়েছেন, আর তাঁর স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন নারদ।

"কাকে প্রণাম করলাম—পুত্রকে ?"

ক্রুদ্ধ ব্রহ্মা নারদকে অভিশাপ দিলেন। অভিশপ্ত নারদ তখন বিষ্ণুর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "প্রভু, নির্দ্দোষী আমি—।"

'মা ভৈঃ', বিষ্ণু নারদকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "আমি এই বল্কলখানি পৃথিবীতে নিক্ষেপ করছি। যে স্থানে ঐ বল্কল পড়বে, তুমি সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে আমার তপস্যা করো, তা হলেই শাপমুক্ত হবে।"

বিষ্ণুর সেই বল্কলখানি এই সমুদ্রকূলে এই স্থানে পড়েছিল এবং নারদ এইখানে তপস্যা কোরে শাপমুক্ত হয়েছিলেন; তাই এ
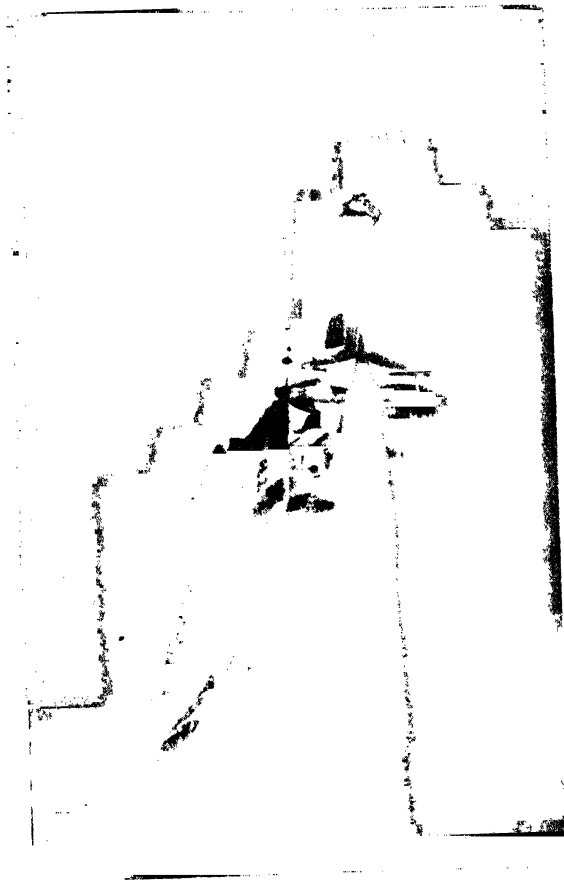
জনার্দ্দন—সমুদ্রতীর—পৃঃ ২৩৭

স্থানটির নাম বরকলম (সংস্কৃত শব্দ বল্কলম্), আর বিগ্রহের নাম জনার্দ্দন।

বেশ বোঝা যায়, বল্কলম্ কথাটিই কালে বরকলম্ বা 'ওয়ার-কলমে' দাঁড়িয়েছে। তামিল ভাষায় 'ব'-এর উচ্চারণ 'ওয়া'।

পাকা একটি ঘণ্টা মোটর চালিয়ে আমরা 'ওয়ারকলম্' বা জনার্দ্দনে পৌঁছুলাম।

মন্দিরের সামনে মোটর থামিয়ে রাও মুখ বাড়িয়ে দেখে বললেন, "মন্দির-দুয়ার এখনো বন্ধ—ঠাকুরের অঙ্গরাগ হচ্ছে। চলুন ততক্ষণ সমুদ্র-তীরে বেড়িয়ে আসি।" রাওকে জিজ্ঞাসা করলাম অঙ্গরাগ কত দেরি হয়। রাও বললেন, এখানকার অঙ্গ-রাগের একটু বৈশিষ্ট্য আছে, কাজেই একটু দেরী হয়। পুরোহিতেরা সকলেই বেশ শিল্পী। দুপুর বেলা ঠাকুরের বিশ্রামের পর তাঁরা হরিদ্রা, চন্দন ও কুমকুম্ মিশিয়ে একটি প্রলেপ বেশ পুরু কোরে ঠাকুরের সারা দেহের 'পরে লেপন করেন। তারপর তুলির সাহায্যে চোখ, ভুরু, অধর প্রভৃতি কজ্জল ও সিন্দুর দিয়ে যেখানে যা আবশ্যক, সেই মত এঁকে দেয়। পাথরের মূর্ত্তির পাথর কোথাও দেখা যায় না। পরে বসন, মাল্য, চূড়া ইত্যাদি পরিয়ে দিয়ে একেবারে যেন সজীব কোরে তোলে।

মোটর চলল সমুদ্রতীরে।

ভেবেছিলাম মোটর একটু দূরে দাঁড়াবে, আর আমরা পায়ে হেঁটে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হব। কিন্তু তা হল না, গাড়ীখানি সোজাসুজি একেবারে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হল। নদী যেমন

কোরে সাগরে এসে হারিয়ে যায়, ঠিক তেমনি কোরে রাস্তাটি জনার্দ্দন মন্দিরের গা দিয়ে বেঁকে এসে সমুদ্রের বেলাভূমিতে হারিয়ে গেছে।

মোটর থেকে নেমে দাঁড়ালাম। সাগরের দুরন্ত হাওয়া হু হু কোরে বয়ে যেতে লাগল। মেয়েদের মাথার আঁচল ও চুল নিয়ে সাগরের পাগলা হাওয়া মাতামাতি করে বিপর্য্যস্ত কোরে তুললে। হাওয়া যেন খেলা করছে আমাদের সঙ্গে......কখনো ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যতিব্যস্ত করছে, কখনো পরম যত্নে শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে হাওয়ার ঘূর্ণি বেলাভূমির বালুকাকণা নিয়ে আবর্ত্ত রচনা কোরে ছিটিয়ে দিচ্ছে চারিদিকে।

নির্জ্জন জায়গা—জনারণ্য নেই, মানুষের সাড়াশব্দ নেই, কোলাহল নেই......শুধু আছে উন্মত্ত সাগর-তরঙ্গের ছল ছল সুরধ্বনি। মন্দিরের পাদদেশে ঘা খেয়ে ফিরে গিয়ে আবার শক্তি সঞ্চয় কোরে ফিরে আসছে......দ্বিগুণ উৎসাহে আছড়ে পড়ছে।

দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম প্রকৃতির এই খেলা—বেশ লাগে। প্রকৃতিকে এমনি কোরে কাছে পেয়ে উপভোগ করতে বেশ লাগে। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত এই অনন্ত রূপৈশ্বর্য্যের মাঝখানে দাঁড়ালে মন কী অনস্নুভূত আনন্দেই না ভরে ওঠে! ঢেউয়ের পরে ঢেউ......তার 'পরে ঢেউ—একবার জাগছে, আবার মিশে যাচ্ছে। এই ওঠা আর পড়া......আসা আর যাওয়া—এ না থাকলে সৃষ্টি কি বাঁচত? মরণের পরিশিষ্টে জন্ম......জন্মের

উপসংহারে মরণ। মৃত্যু চলেছে জন্মের পিছু পিছু······ জন্ম চলেছে মৃত্যুকে অনুসরণ কোরে। এক বহুর মাঝে বিক্ষিপ্ত······ বহু একের মাঝে সংক্ষিপ্ত। এই আবর্ত্তন······গমন আর প্রত্যাগমন—এই নিয়েই পৃথিবী, এই নিয়েই সৃষ্টি।

এমনি কোরে সাগরের বুকে ঢেউয়ের মত আমরাও একদিন মিলিয়ে যাব। আমরা যাব, আসবে অন্যেরা, আবার তারা যাবে, আসবে আর একদল। এই ভাঙ্গা-গড়া নিয়েই সংসার······নতুন-পুরাতন নিয়েই মানুষের হাসি-কান্না। অথচ আসলে এর মূল্য কী! কিছুই নয়—সেই একই ত সব।

"শুষ্ক পত্র পড়ে না ঝরিয়া
সেই-ই দেখা দেয় নূতন করিয়া—"

সেই আমিই আসি অন্য রূপে, অন্য মূর্ত্তিতে, অন্য দেহাশ্রয়ে। তখন সবাই ভাবে আমি নতুন। তাই ভগবান বলেছেন—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

অথচ এই 'বাসাংসি জীর্ণানি'র মহিমা প্রাত্যহিক জীবনে কতো পরিচিত, তবু আমরা বুঝি না। বাহিরের অনুষ্ঠানটা যদি অন্তরের অনুষ্ঠানের বেলায় প্রয়োগ করি তো, "আত্মানং বিদ্ধি" সমস্যাটি যে কতো সহজ হয়, তা আমরা মোটেই ভাবি না।

কল্পনা চলেছিল তীরবেগে। হঠাৎ বাধা পেলাম।

'মিঃ চৌধুরী !'

ফিরে তাকালাম।

হাত-ঘড়িটি দেখে সুব্বারাও বললেন, "চলুন—এইবার মন্দির খোলবার সময় হয়েছে।

কল্পনার উর্দ্ধগতি বাস্তবের অধোগতি পেল।

মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেছে। সেই ঝিমিয়ে-পড়া মন নিয়ে আর যেন কোথাও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, এ ভার আর বয়ে কাজ নেই। বসে পড়ি এই বালুবেলার 'পরে। সাগরের উন্মাদ বায়ু উচ্ছ্বসিত উন্মত্ততায় ছুটে আসুক……খেলা করুক আমাকে নিয়ে। সময় চলে যাক হু হু কোরে। এইখানে এই প্রকৃতির উন্মুক্ততার মাঝে বসে আমি শুধু ডুবে থাকি গভীর আনন্দে……রোমাঞ্চিত পুলকে। তারপর……তারপর আর কিছু নেই। এইই ভরপুর……এইখানেই এর আরম্ভ, এইখানেই এর শেষ। উপক্রমণিকার উত্তেজনাও এতে নেই, উপসংহারের অবসাদও নেই।

কখন সকলের পিছু পিছু মোটরে উঠেছি, কখন মোটর এসে জনার্দ্দন-মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েছে, কিছুই খেয়াল নেই আমার। রাও-এর কথায় চমক ভাঙল।

"হ্যাঁ। মন্দির-দুয়ার খুলেছে। নামুন, মায়েদেরও নামতে বলুন।"

সবাইয়ের সঙ্গে আমিও নামলাম। তখনো ঘোরটা যেন
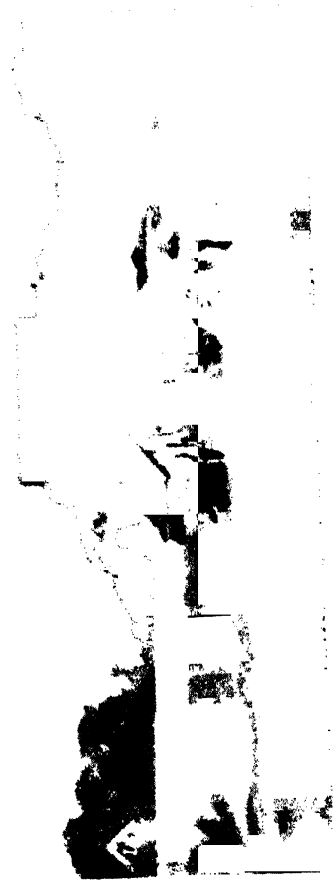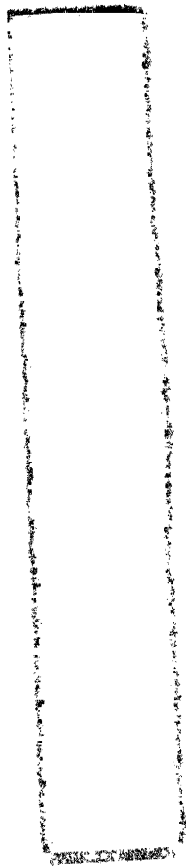
জনার্দ্দনের মন্দির-দ্বার—পৃঃ ২৪০

ভাল কোরে কাটেনি। পাহাড়ের ছোট ছোট সিঁড়িগুলি পার হয়ে মন্দিরের দরজার কাছে যেতে যেতে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম।

মন্দিরটি এ অঞ্চলের মন্দিরের তুলনায় খুবই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু মন্দিরের ভেতর দেবতার মূর্ত্তির দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠলাম। সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে পুলকের বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। আহা রে, চোখ যেন জুড়িয়ে গেল! মন যেন সহস্র বীণার ঝঙ্কারে বেজে উঠে বললে, "পেয়েছি, পেয়েছি।" অন্তরের সমস্ত অনুভূতি একাগ্র হয়ে গুঞ্জন কোরে উঠল, এই……ওরে, এই সেই! কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা—সব একাকার হয়ে গেল—রইল শুধু রস-সমাহিত আত্মার আনন্দোক্তি—এই, এই সেই ভুবনমোহন রূপ, যা অন্তর-বাহির ছেয়ে আছে। আনন্দে সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো! মনে মনে বললাম, এমনি কোরে সকল চাওয়া, সকল পাওয়া সফল হল মোর। সত্যি, সফল হল। কে জানতো এই ছোট্ট মন্দিরে অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন কোরে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করব? কে বলে, তিনি রূপের মাঝে, বাঁধনের মাঝে ধরা দেন না? এই তো তিনি রূপ পরিগ্রহ কোরে আছেন। তাই সেই অব্যক্ত অরূপকে উদ্দেশ কোরে মনে মনে বললাম—

হে অরূপ, রূপের মাঝে তোমার স্বরূপ মূর্ত্ত হয়েছে—সে মূর্ত্তি জনার্দ্দন। হে অব্যক্ত, তুমি ব্যক্ত হয়েছ রূপে, সম্ভব হয়েছ মূর্ত্তির আশ্রয়ে, আত্মপ্রকাশ করেছ উপাসকের সিদ্ধির জন্য —"একোহহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়" এই শ্রুতি-বাক্যের সার্থকতা

করেছ। অরূপ হয়েও তুমি "রূপে" অর্থাৎ ঘট-পটাদিতে, "অরূপে" অর্থাৎ নিরাকার আকাশাদি পদার্থে, "সংজ্ঞাতে" কি না জ্ঞানময় গ্রহ-নক্ষত্র বা মনুষ্যাদিতে, আর জড় পদার্থে ও অচেতনে—সর্ব্বত্র বিরাজমান হয়ে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রের প্রমাণ করছ—কে বলে তুমি অব্যক্ত, কে বলে তুমি অরূপ ?

সমস্ত দাক্ষিণাত্যের মন্দির দর্শন কোরে যা পাই নি, আজ এমনি একটি ছোট্ট মন্দিরে তাই পেলাম। চিরকালই তুমি এমনি কোরে লুকিয়ে থাক প্রভু। কোলাহলে তুমি নেই, বিপুলতার মাঝে তুমি নীরব—তাই নীরবতার মাঝে তোমার আসন, ক্ষুদ্রের স্বল্পতায় তোমার করুণা। তাই বিদুরের খুদ খাবার জন্যে তোমার আগ্রহ জেগেছিল একদিন।

জনার্দ্দন, অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু এখানে কিশোর। মরি মরি, "কিবা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।" সত্যিই তাই। মনের উচ্ছ্বাস নয়, সত্যোক্তি। ঠাকুর আমার হাসছেন—মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ। সে হাঁসির রেশ যেন ঠিক্‌রে পড়েছে চারিদিকে। দেখলে মনে হয়, যেন আমারই দিকে চেয়ে হাসির জোয়ার ঠোঁটের আগায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

আহা, কে সেই শিল্পী ! যার সাধনায় এ মূর্ত্তি এমন রূপ পেয়েছে ? কার সেই প্রতিভা, যার গুণে ঠাকুরের আমার হাসি এমন অমর ও অপার্থিব হয়েছে ? কে সেই একনিষ্ঠ একাগ্রচিত্ত ভক্ত, যার জন্ম জন্ম তপস্যার ফলে মূর্ত্তিশ্রী এমন অপূর্ব্ব হয়েছে ?

পুরাণের বর্ণনায় শ্রীবিষ্ণুর মূর্ত্তির কথা যেমন পড়েছি, ঠিক

তেমনি……একেবারে নিখুঁত। একটি চোখের চাহনি ঈষৎ বাঁকা। এই অপাঙ্গের চাহনির জন্যে ঠাকুর আমার আরো মনোহর। মনে হয়, বাইরের এই মূর্ত্তিকে মনের ঘরে দোর দিয়ে চিরকালের জন্য আট্‌কে রাখি—চিরদিন পলকহীন চোখে চেয়ে থাকি।"

মনে পড়ল বৈষ্ণব কাব্যের কথা। শ্রীমতী বলছেন, "সখি, আমার মীনজন্ম নিতে সাধ হয়।

"জগতে এতো জন্ম থাকতে সামান্য মাছের জন্ম? কেন?" সবিস্ময়ে সখী জিজ্ঞেস করে।

শ্রীমতী উত্তর দেন, বলেন, "কেন জানো? 'কী পুণ্য করিয়ে মীন, হয়েছে পলকহীন।' অর্থাৎ কতো জন্মজন্মান্তরের পুণ্য কোরে তবে মীন এমন পলকহীন হয়েছে। অমনি যদি আমি হতে পারতাম তো পলকহীন নেত্রে ওই নবঘন শ্যামরূপ অনন্তকাল ধরে দেখতাম।"

সত্যি, এ রূপ দেখে চোখ ফেরান যায় না, মনে হয় আজন্মকাল ধরে পলকহীন নেত্রে খালি চেয়ে থাকি। দেখে দেখে মন আর ভরে না, আশা আর মেটে না। একান্ত মনে বলতে লাগলাম—

"(প্রভু) দুই চোখে যে কুলায় না মোর
তোমার রূপের আলো,
লক্ষ কোটি নয়ন পেলে
হতো যে মোর ভালো।"

সে রূপ? মরি মরি……জন্ম জন্ম ধরে দেখে ফুরিয়ে ফেলবে

এ সামর্থ্য মানুষের নেই। দেখার আশা সে মেটাতে পারে না। তাই বিদ্যাপতি গেয়েছেন—

"জনম জনম হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

রাও চমক ভাঙালেন, "মিঃ চৌধুরী, এইবার আমাদিগকে ফিরতে হবে। পদ্মনাভের মন্দির সন্ধ্যার কিছু পরেই বন্ধ হয়ে যায়।"

মোটরে আসতে আসতে একবার পেছন ফিরে তাকালাম।

সূর্য্য ডুবছে……। সমুদ্রের জলের ওপর ঘোর লাল রঙের ছোপ লেগেছে। আকাশের গায়ে বর্ণচ্ছটার আর অবধি নেই। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যরাশি দেখবার সুযোগ হল না। ফিরে ফিরে চাইতে চাইতে নেমে এলাম। কারণ, দেরী হলে ভ্রমণের জন্যে যে তালিকা আগে থেকে রেল-কোম্পানী এবং মন্দির-সমিতির কাছে দাখিল কোরে রেখেছি, সে সব গোলমাল হয়ে একাকার হয়ে যাবে।

সুতরাং, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমরা ত্রিবেন্দ্রাম্ অভিমুখে মোটর চালালাম। তবু পৌঁছুতে প্রায় সাড়ে সাতটা বাজল।

ভাগ্য বিরূপ কি ভগবান বিরূপ, তা জানি না—এসে দেখলাম মন্দির-দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। মনটা খুবই ক্ষুন্ন হল। ফিরে এলাম "পদ্মবিলাস" এ।

পরের দিন। খুব ভোরে উঠলাম। গতরাত্রে শুনেছিলাম, ভোর পাঁচটা থেকে বেলা সাতটা পর্য্যন্ত পদ্মনাভের দর্শন পাওয়া যাবে।

'পদ্মবিলাস' থেকে পদ্মনাভ-মন্দির কাছেই। আমরা সবাই পায়ে হেঁটে দেখতে গেলাম।

পায়ে হেঁটে দর্শনাভিলাষে দেব-মন্দিরে যাওয়ার মধ্যে বেশ একটা আনন্দ আছে। এতদিন সে আনন্দ উপভোগ করিনি ; যা উপভোগ করেছিলাম রামঝরুকা যাবার সময়। ত্রিবেন্দ্রামে জনবিরল পথে আমরা ক'জন দেবদর্শনাকাঙ্ক্ষী চলেছি, মনে মনে এই কথা ভেবে এক অননুভূত আনন্দে অন্তর ভরে উঠল। মন্দিরের নিকটে একটি দোকানে রাও আমাদের নিয়ে গিয়ে, আমাকে ও ভায়াকে উদ্দেশ কোরে বল্লেন, "আপনারা দুজনে জামা-টা খুলে ফেলুন—উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত কোরে উত্তরীয়টি কোমরে বাঁধুন। পুরুষ-যাত্রীদের জন্য ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে যত দেবস্থানম্ আছে, সেখানে দেব-দর্শনের সময় এই বিধি।"

এইবার মন্দিরে পেঁ'ছুলাম, শুনলাম এই মাত্র দেবতার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে।

মন্দিরের ভেতরটি গভীর অন্ধকার, বিনা আলোর সাহায্যে দেবমূর্ত্তি দেখা অসম্ভব।

এখানকার নিয়মানুযায়ী আমরা মণ্ডপে দাঁড়ালাম। রাও বুঝিয়ে দিলেন, "সামনে পাশাপাশি এই যে তিনটি দোর দেখছেন, এরই ভেতর দিয়ে শ্রীশ্রীপদ্মনাথ স্বামীকে দর্শন করতে হবে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "এতো দূর থেকে কেন? আর একটু কাছে গিয়ে......"

বাধা দিয়ে বিনীতকণ্ঠে রাও বললেন, “না, সে উপায় নেই। এখানকার এই-ই নিয়ম। সবাইকে এ নিয়ম মানতে হয়।”

“বেশ। তা যদি হয় তো আমাদেরও মানতে হবে।”

সবাই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম। এক একটি দুয়ারের কাছে দীপালোক আনা হল, এবং সেই মৃদু আলোর সাহায্যে দেবতার কতক দেহাংশ আমরা দেখতে পেলাম। এমনি কোরে তিনটি দোর দিয়েই দীপালোকে দেবতাকে দর্শন হল।

প্রথম দুয়ার দিয়ে দেখলাম ভগবানের চরণ-কমল, তারপরের দুয়ারটি দিয়ে দেখলাম দেহের মধ্যাংশ ও শেষ দুয়ারটি দিয়ে মুখ ও দক্ষিণ হাত।

ডান হাতের ওপর কপোলদেশের একাংশ ন্যস্ত কোরে শ্রীশ্রীপদ্মনাভ স্বামী অর্দ্ধশায়িত ভঙ্গিতে বিরাজ করছেন।

মৃদু আলোকে ভাল কোরে ঠাকুরকে দেখতে পেলাম না। অন্যান্য স্থানে কর্পূরালোকে ভাল কোরে মূর্ত্তি দর্শন করেছি, কিন্তু এখানকার নিয়ম-শৃঙ্খল সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করলে। মনটা ক্ষুব্ধতায় ভবে রইল।

বিলুর মা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবার জন্য নতজানু হতেই রাও এবং মন্দিরের পুরোহিত সন্ত্রস্থ হয়ে নিবারণ করলেন।

সচকিত হয়ে বিলুর মা অবাক হয়ে গেলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, “প্রণাম করাও কি এখানে নিষিদ্ধ?”

যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে রাও বললেন, “এখানে নতজানু হয়ে প্রণাম করার বিধি নেই, এমনি কোরে নমস্কার করতে হয়।”

অগত্যা সবাই এই নিয়ম মানলাম। উপায় কি! ভগবানকে ভক্তিকরার পদ্ধতি যেখানে শৃঙ্খলিত, সেখানে এ ছাড়া আর উপায় কি?

বিধি-নিষেধ মেনে, আধেক আলো, আধেক ছায়ায় দেখা অস্পষ্ট পদ্মনাভের মূর্ত্তিকে নিজের কল্পনা দিয়ে পরিপূর্ণ রূপ দেবার চেষ্টা করতে করতে সভামণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এলাম।

সমুদ্রে জেলেরা মাছ ধরছে—ত্রিবেন্দ্রাম্

মোটরে উঠতেই রাও বললেন, "চলুন, রাজার মৎস্যাগার দেখে আসি।"

গাড়ী চললো মৎস্যাগার অভিমুখে।

যাবার পথে সমুদ্র-তীরে মাছ ধরার কৌশল দেখলাম।

মৎস্যাগারে পেঁ ৗছে দেখলাম, আয়োজন বড মন্দ নয়, সংগ্রহও আছে অনেক। মান্দ্রাজের মৎস্যাগারের সঙ্গে অবশ্য তুলনা চলে

না। তবু রাজার চেষ্টা, সংগ্রহ ও মৎস্য-সংরক্ষণ প্রীতি দেখে প্রীত হলাম।

পদ্মবিলাসে ফিরলাম যখন, তখন বেলা প্রায় সাড়ে ন'টা।

স্নান-পর্ব্ব সমাধা কোরে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে ত্রিবেন্দ্রাম্ রাজার দেওয়ান স্যর সি, পি, রামস্বামী আয়ারের সঙ্গে দেখা করতে বেরুলাম। বৈবাহিকের অনুরোধে এঁরই কৃপায় আমরা খাস রাজ-অতিথি হয়েছিলাম।

বেরুবার সময় প্রভাত বললে, "তুমি স্যর সি, পি,র কাছে যাও, সেই সুযোগে আমরা এখানকার যাদুঘরটা দেখে আসি। কাল বন্ধ ছিল, দেখা হয় নি।" খুকুমণি, প্রভাত, বিলুর মা ও আমার স্ত্রী গেল যাদুঘর দেখতে। রাও গেলেন এদের সঙ্গে।

দেওয়ান বাহাদুরের ঘরে ঢুকতেই, তিনি বললেন, "আমি এইমাত্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব ভাবছিলাম।

বললাম, "ভাল করেছেন, গিয়ে পৌঁছোলে লজ্জা পেতাম। দেখা ত আমারই করা উচিত। আপনার সার্টিফিকেট না থাকলে কি রাজ-অতিথি হতে পারতাম!"

'ও......' বলে সশব্দে হেসে উঠে, রামস্বামী আয়ার মহাশয় বললেন, "কিন্তু, অতিথি হয়েছেন যাঁর, তিনি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।"

"বটে! এ তো সৌভাগ্যের কথা!"

"আচ্ছা!" বলে স্যর আয়ার একটু কৌতূহলজনক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "যেদিন আপনি আসেন, সেইদিন মহারাজা

পদ্মনাভস্বামী দর্শন কোরে প্রাসাদে ফিরে আসবার পথে আপনাদের মোটর কি সেইখানে দাঁড়িয়েছিল ?"

আমি বললাম, "আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হয়েছিল মহারাজার ; এবং অতিথিবৎসল রাজাকে হাত তুলে নমস্কারও করেছিলাম।"

"বুঝেছি" বলে তিনি বললেন, "তাই, মহারাজা আমায় জিজ্ঞেস করছিলেন, 'স্টেটের মোটরে একজন বাঙালী ভদ্রলোককে দেখলাম। কোন বাঙালী ভদ্রলোক কি আমার অতিথি হয়েছেন ?' আমি আপনার নাম করতে তিনি বললেন, 'একদিন আমার এখানে তাঁকে আনুন না, আলাপ করি।' মহারাজা দিনক্ষণও স্থির কোরে দিয়েছেন—বলেছেন, পরশুদিন অপরাহ্ণে গেলে তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে।"

কুন্ঠিতস্বরে জবাব দিলাম, "কিন্তু দেখা করবার সময় ত হবে না স্যর রামস্বামী ! আমরা পরশুর আগেই চলে যাব। তা ছাড়া, দেরী করলে আমাদের ভ্রমণের যে তালিকা আছে, সব ওলোট-পালট হয়ে যাবে এবং বড়ই গোলমালে পড়ে যাব।"

"তবে আর কি হবে—খবরটা মহারাজাকে দিয়ে দোব আগে থেকে।"

বললাম, "তাই দেবেন। আর সেই সঙ্গে আমার সহস্র ধন্যবাদ জানিয়ে বলবেন, ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে যদি আসবার কখনো সৌভাগ্য হয় তো, রাজদর্শন লাভ থেকে কিছুতেই বঞ্চিত হব না।"

আরো দু-একটি সাধারণ কথাবার্ত্তার পর বিদায় নিলাম।

যাবার আগে স্যর রামস্বামী জিজ্ঞেস করলেন, "এখানকার আর্ট-গ্যালারী ( চিত্র-প্রদর্শনী ) দেখেছেন ?"

বললাম, "না, ফেরবার পথে দেখে যাব।"

এখান থেকে বেরিয়ে আর্ট-গ্যালারীতে গিয়ে ঢুকলাম।

অনেক বাঙালীর আঁকা ছবি এখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। বিশ্বকবির নিজের এবং কবির দুই ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্র-নাথের ছবি এঁরা সযত্নে এবং সসম্মানে প্রদর্শনীতে স্থান দিয়েছেন। বিশ্বভারতীর শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বোসেরও আঁকা ছবি আছে। ক্যাটালগে এই শিল্পীদের পরিচিতি ও অঙ্কনবৈশিষ্ট্য বেশ মধুর কোরে লেখা আছে। এই সব বাঙালী চিত্রকরদের শিষ্য প্রশিষ্যদেরও আঁকা অনেক ছবি দেখলাম। আনন্দ হল খুব। বাঙালীকে এই সুদূর ত্রিবাঙ্কুরে এমন সযত্নে ও সসম্মানে সমাদৃত হতে দেখে মনটা আনন্দে রঙীন হয়ে উঠল। একটি রুশীয় ভদ্রলোক গ্যালারীর একধারে বসে ছবি আঁকছেন দেখলাম। ছবিতে রঙের প্রাচুর্য্য দিচ্ছেন খুব। ভারতবর্ষ বর্ণ-বৈচিত্র্যের দেশ। এদেশে এসে সেই রঙের ছোপ বোধ হয় তাঁর মনে লেগেছে।

এখান থেকে গেলাম যাদুঘরে ; তারপর বিলুর মা, আমার ভাই প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরতে বেলা হল অনেক।

আহারাদি সেরে একটু বিশ্রামের উদ্‌যোগ করছি, এমন সময় এক শাড়ী-বিক্রেতা এসে উপস্থিত হলো। বিলুর মা, আমার স্ত্রী ও খুকুমণিকে ডাকলাম। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, একটি শাড়ীও
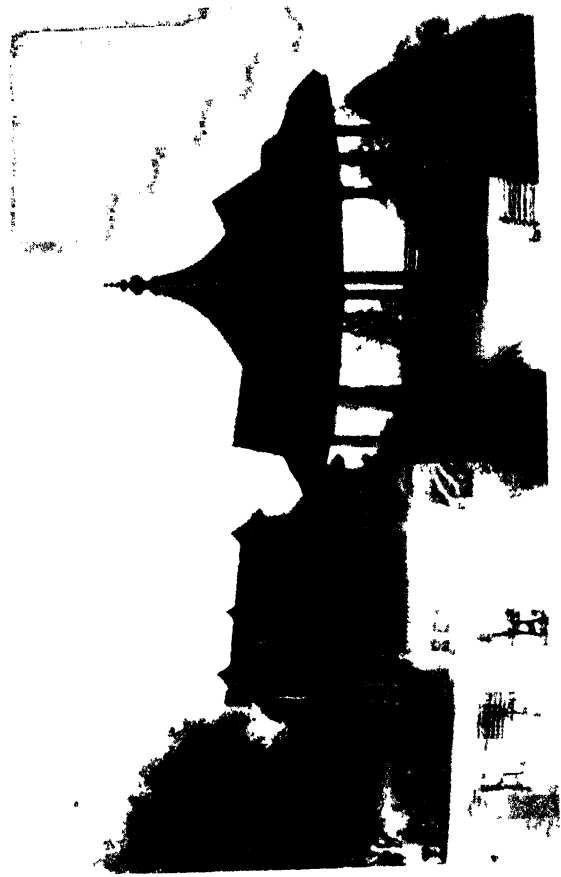
ত্রিবেন্দ্রাম্ মিউজিয়ম্ ও আর্ট গ্যালারী—পৃঃ ২৫০

কারো মনে ধরল না। শাড়ী-বিক্রেতার কপাল মন্দ—যাঁরা শাড়ী পরবার ও বিলুবার মালিক, তাঁরাই যখন অপছন্দ করলেন, তখন আমার আর কী হাত আছে! সুতরাং বেচারাকে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে যেতে হলো।

খানিক পরে আরো একজন এলেন। হাতীর দাঁতের কারুকার্য্য করা নানান প্রকারের সৌখীন দ্রব্য ছিল এর কাছে। সবাই মিলে পছন্দ করতে বসে গেলাম। কিছু কিছু কেনাও হলো। দেখলাম, শাড়ীওয়ালার চেয়ে এর ভাগ্য ভাল।

ছুপুর পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাও ঘরে ঢুকে বললেন, "স্টেটের গাড়ী এসেছে, চলুন বেরিয়ে পড়ি।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমরা মোটরে চেপে কন্যাকুমারিকা যাত্রা করলাম।

* * * *

কন্যাকুমারিকা ত্রিবেন্দ্রাম্ থেকে মোটরে ৪২ মাইল।

পথে যেতে যেতে শুচীন্দ্রম্ মন্দির দেখলাম। মোটর থামিয়ে শুচীন্দ্রমের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নেমে শুনলাম, দেবতার ছুয়ার বন্ধ; আহারের পর দেবতা বিশ্রাম করছেন।

সুতরাং আবার আমাদের মোটর কন্যাকুমারিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

রাও বললেন, "কন্যাকুমারিকার গল্প শুনবেন, মিঃ চৌধুরী?"

যদিও কন্যাকুমারিকার পৌরাণিক কাহিনী আমার জানা ছিল, তবু বললাম "বলুন।"

উদ্দেশ্য এই যে, রাও-এর মুখ থেকে যদি নতুন কিছু জানা যায়। তা ছাড়া, কথা কইতে কইতে গেলে এই দীর্ঘ সময়টা কাটবে বেশ।

রাও আরম্ভ করলেন ঃ—পুরাকালে বাণাসুর নামে এক অসুর ছিল। বহুদিন ধরে ব্রহ্মার দর্শন আশায় অসুর তপস্যা করলে।

তার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা একদিন দেখা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বর চাস্, বল ?

অসুর বর প্রার্থনা করলে, "কোন পুরুষের হাতে যেন আমার মৃত্যু না হয়।"

"তথাস্তু"।

বর পেয়ে অত্যাচারী অসুর নিজমূর্ত্তি ধরলে। স্বর্গরাজ্য জয় কোরে ইন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত কোরে তাড়িয়ে দিলে।

লজ্জায়, অপমানে ভারাক্রান্তহৃদয় ইন্দ্র বিষ্ণুর শরণাগত হলেন।

ইন্দ্রের অবস্থা দেখে ভগবানের অন্তর দ্রবীভূত হল এবং বললেন, "এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে তপস্যা। তুমি যাও, পৃথিবীতে গিয়ে তপস্যা কর—পার্ব্বতী সন্তুষ্ট হয়ে যদি যজ্ঞাগ্নি থেকে কন্যারূপে আবির্ভূতা হন, তবেই বাণাসুর-বধ সম্ভব হবে।

এই উপদেশ শুনে পৃথিবীতে গিয়ে ইন্দ্র পার্ব্বতীর তপস্যা করতে লাগলেন। সন্তুষ্টা পার্ব্বতী তখন যজ্ঞাগ্নি থেকে আবির্ভূতা হয়ে অভয় দিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র পার্ব্বতীর অংশসম্ভূতা এক অনুপম রূপলাবণ্যবতী কন্যা লাভ করলেন।

সংবাদ পৌঁছল বাণাসুরের কাছে। দর্পে স্ফীত বাণাসুর তখন উন্মত্ত। সামান্য ন' বছরের মেয়ে, সে তাকে বধ করবে! এতো শক্তি ধরে বালা!

কিন্তু, কতো শক্তি ধরে বালা, তার প্রমাণ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পেলেন।

বাণাসুর নিধন হলো।

বাণাসুর-নিধন কার্য্য সমাধা হবার পর কন্যাকুমারী মহাদেবের তপস্যা করতে লাগলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট মহাদেব একদিন স্বয়ং উপস্থিত হলেন। ব্রীড়াবনত কুমারী অপাঙ্গে একবার মহাদেবের দিকে চেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। শিব তখন কুমারীর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বললেন, "বেশ, আমি সম্মত আছি। কিন্তু এ সম্মতির মাঝে একটি সর্ত্ত আছে।"

অস্ফুটে কন্যাকুমারী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি সে সর্ত্ত?"

"সর্ত্ত এই যে, তোমাকে বিবাহ করার জন্য যে লগ্ন স্থির হবে, সে লগ্ন যদি কোন কারণে উত্তীর্ণ হয়ে যায় তো, আর এ বিবাহ হবে না।"

বিবাহের দিন এলো। কন্যাকুমারী যথারীতি অধিবাস সম্পন্ন কোরে মহাদেবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মহাদেবও যথাবিহিত লগ্নে উপস্থিত হবার জন্য যাত্রা করলেন। দুর্দ্দৈব এমন যে, পথে দেখা হলো দুর্ব্বাসার সঙ্গে। তিনি মহাদেবকে একটা শাস্ত্রসম্বন্ধীয় জটিল সমস্যার মীমাংসা কোরে দিতে বললেন।

দুর্ব্বাসা মুনির সমস্যা সমাধান করবার জন্য মহাদেব সেইখানে দাঁড়ালেন। রাত্রি অধিক হতে লাগল......ক্রমশঃ ক্রমশঃ আরো গভীর হলো রাত।

তারপর এক সময় সমস্যার সমাধান কোরে যাত্রা করবার উদ্যোগ করতেই নারদ কাকের স্বর অনুকরণ কোরে বন থেকে ডেকে উঠলেন। আর যাওয়া হল না মহাদেবের। সকাল হয়ে গেছে ভেবে তিনি রয়ে গেলেন শুচীন্দ্রমে।

এই শুচীন্দ্রমই সেই স্থান, যেখান থেকে সকাল হয়ে গেছে ভেবে মহাদেব আর অগ্রসর হননি। আমি রাওকে বললাম, "এ ছাড়া, স্কন্দপুরাণ কুমারিকা খণ্ডে এ সম্বন্ধে আর একটি গল্প পড়েছি। তাতে আছে— কোন এক রাজা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন, সে যজ্ঞে পুত্রের পরিবর্ত্তে তিনি এক কন্যা লাভ করলেন। এই কন্যার দেহ ছিল সুন্দর, কিন্তু মুখ ছিল মেষের মত।

জ্ঞান সঞ্চার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্পণে নিজের মুখের ছায়া দেখে কন্যার মনে পূর্ব্ব জীবনের কাহিনী মনে পড়ল। তখন তিনি রাজাকে বললেন, 'পিতা, ভারতের যেখানে ত্রি-সাগর-সঙ্গম হয়েছে, আমি সেইখানে তীর্থাকাঙ্ক্ষায় একবার যেতে চাই।'

রাজা তৎক্ষণাৎ সমস্ত বন্দোবস্ত কোরে দিলেন।

এই ত্রি-সাগর-সঙ্গমে গিয়ে রাজকন্যা দেখলে একটি মেষীর মুখ গুল্মজালে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, অথচ তার দেহ ভেসে গেছে সাগরোচ্ছ্বাসে।

গুল্মজালে আবদ্ধ এই মেষীর মুখকে দাহ কোরে রাজকন্যা

সঙ্গমস্থলে স্নান করলে। স্নানের পর সবাই দেখলে রাজকন্যার সে মুখের গঠন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়েছে এবং রূপ ও লাবণ্য এতো, যেন দেহ উপচে পড়চে।

তিনিই ভক্তি সহকারে এইস্থানে শিব প্রতিষ্ঠা কোরে চির-কুমারীর জীবন যাপন করেছিলেন।"

'কিন্তু আমরা জানি', বলে রাও আরম্ভ করলেন, "মহাদেব এলেন না, লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেল বলে পার্ব্বতীর এই অংশসম্ভূতা কন্যা চিরকালের জন্য কুমারী হয়ে রইলেন; তাই এঁর নাম "কন্যা-কুমারী" বা "কন্যাকুমারিকা" ও জায়গাটির নামও 'কন্যাকুমারিকা'।

বললাম, "এ কাহিনীও আমি ইতিপূর্ব্বে শুনেছি।"

মোটর বেগে চলতে লাগল। ভাবতে লাগলাম, কন্যাকুমারীর কথা। মনে মনে বললাম, ভগবান, তুমি কি কেবল ভক্তকে কষ্ট দেবার জন্যেই আছো? অনূঢ়া বালিকা কী দোষ করেছিল যে, তুমি তার সঙ্গে এমনি মর্ম্মান্তিক পরিহাস করলে!

আমাকে সজাগ কোরে রাও বললেন, "কন্যাকুমারিকা এসে গেছে, মিঃ চৌধুরী।" সোজা হয়ে উঠে বসলাম।

মোটর গিয়ে দাঁড়ালো রাজার অতিথিশালার সামনে। এতোটা পথ মোটরে এসে যেন জড়তা জমে গিয়েছিল দেহে। অতিথিশালায় নেমে একটু ঘুরে-ফিরে মুখ, হাত-পা ধুয়ে নিলাম।

আমার সহধর্ম্মিণী, বিলুর মা, খুকুমণি প্রভৃতি ত্রি-সাগর-সঙ্গমে স্নান করবেন বলে উতলা হয়ে উঠলেন। সবাইকে সঙ্গে কোরে কন্যাকুমারিকার সাগর-সঙ্গমে এসে দাঁড়ালাম।

কী অপূর্ব্ব দৃশ্য ! পৃথিবীর আর কোথাও এমন অফুরন্ত সৌন্দর্য্য আছে বলে মনে হয় না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার এই ভারতবর্ষ……আর কন্যাকুমারিকা সেই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ স্থান। মরি মরি……কোথাও কি এতটুকু কার্পণ্য নেই……

ত্রি-সাগব-সঙ্গম—কন্যাকুমারী

প্রকৃতি কি উজাড় কোরে সমস্ত সৌন্দর্য্য এইখানে ঢেলে দিয়েছেন ! একসঙ্গে তিনটি সমুদ্র এসে মিশেছে এই কন্যা-কুমারিকার পবিত্র তীর্থে—আরব মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে জলেব বর্ণপার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু এখানে তা দেখলাম না। মহানে মহানে যখন সম্মিলন হয়, বিরাট ও বিপুলে যখন সন্ধি হয়, তখন তাদের সম্মিলন বোধ হয় এমনিই ভেদহীন, বর্ণ-পার্থক্যহীন, অবিকল।

পুরীর সমুদ্র দেখেছি, ওয়ালটেয়রের সমুদ্র দেখেছি, কিন্তু সমুদ্রের এমন অপূর্ব্ব রূপ এর আগে প্রত্যক্ষ করি নি।

মেয়েরা কন্যাকুমারিকার সঙ্গম-তীর্থে স্নান করতে গেল। পায়ে চলা আঁকা-বাঁকা যে পথখানি বেলাভূমির বুকের ওপর দিয়ে সমুদ্র-জল স্পর্শ করেছে, সেই পথের ওপর দাঁড়িয়ে রইলাম আমি আর সুব্বারাও।

বেলাভূমির এক মুঠো বালি কুড়িয়ে নিয়ে আমাকে দেখিয়ে রাও বললেন, "এই দেখুন, কন্যাকুমারিকার বালুকাগুলি কতো বড় বড়। তাই লোকে বলে, রাত্রি অবসান হলে কন্যাকুমারী বিবাহের জন্যে প্রস্তুত অন্ন চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এই সব তার সাক্ষী।"

সত্যি। হাতে কোরে দেখলাম বালুকণাগুলির আকৃতি চালের মত। কোন কথাই মুখ দিয়ে বেরুল না, কেবল নীরবে চেয়ে রইলাম। কন্যাকুমারিকার এই বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সেই সুদূরাতীত যুগের নীরব সাক্ষ্য উপলব্ধি কোরে কী যে আনন্দ হল, তা যে না উপলব্ধি করেছে, তাকে বোঝান কোন মতেই সম্ভব নয়। মনটা কানায় কানায় ভরে উঠেছে! খালি চুপ কোরে ভাবতে ইচ্ছে করছে। মানুষের ভেতরটা যখন কূলে কূলে ভরে ওঠে, তখন বাইরেটা বোধ হয় এমনি কোরেই নীরব হয়ে যায়! সে তখন নিজের আনন্দে নিজেই বিভোর—প্রকাশ নেই, ব্যাপকতা নেই......শুধু আপনার পরিধিতে আপনি বিকশিত। রস-সমারোহে মগ্ন।

এই সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সমস্ত অন্তর দিয়ে তিল তিল কোরে কন্যাকুমারীকার গভীর পবিত্রতা উপলব্ধি করতে লাগলাম।

সমুদ্রের একটানা কলোচ্ছ্বাস……দূরে তাল-নারিকেলের সুদূরবিস্তৃত সারি……বেলাভূমির পাণ্ডুবর্ণ প্রান্তরেখা……অনতি-দূরে সাগর-জল থেকে উঁকি-দেওয়া প্রস্তরখণ্ড—কী যে অদ্ভুত সে আবেগ, কী যে অচিন্ত্যনীয় সে অনুভূতি, তা লিখে বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই……আর কেউ যে তা পারে, সে বিশ্বাসও আমি করি না। কবির কল্পনা, ভক্তের সাধনা, তীর্থের সুফল—সব যেন এক সঙ্গে জাগ্রত হয়ে আছে কন্যাকুমারিকার এই সমুদ্র-কূলে……এই ত্রি-সাগর-সঙ্গমতীর্থে।

স্নান সেরে মেয়েরা ফিরে এলো। তাদের সঙ্গে বেলাভূমি পার হয়ে এলাম ওপরে।

কন্যাকুমারী-মন্দির

মন্দিরে গিয়ে শুনলাম, দেবীর অধিবাস সম্পন্ন হয়েছে, মন্দির-দ্বার খুলেছে। এমনি কোরে বহু যুগযুগান্তর আগে দেবী নিজে একদিন এই অধিবাস সম্পন্ন করেছিলেন। কন্যা-

কুমারিকার সমুদ্র হয়ত সেদিন দেবীর প্রসাধন সম্পন্ন করবার জন্যে তরঙ্গ-বিক্ষোভ থামিয়ে প্রশান্ত মুকুরের মত স্থির হয়েছিল। এরই তীরে বসে সাগর-জলের আরসীতে মুখ দেখে কন্যাকুমারী হয় ত সেদিন চন্দনের পত্র-লেখা এঁকেছিলেন রাঙা-গালে...... কাজলের রেখা টেনেছিলেন চোখের কোণে......সিঁদুরের টিপ পরেছিলেন তরঙ্গিত ভ্রূর সঙ্গমতীর্থে। কুমকুমে-রাঙানো বাঁকানো দু'খানি ঠোঁটের আগায় চাপা হাসির বিদ্যুৎ ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে উঠেছিল—আলতা-রাঙানো দু'খানি পায়ের ঘায়ে হয়ত এই বালুভূমেও সোনার কমল ফুটেছিল।

তাই সেই স্মৃতির অনুসরণে পুরোহিতেরা আজো প্রত্যহ দেবীর অধিবাস সম্পন্ন করেন। সেই পুরোনো কাহিনীর স্মৃতি আজো দেবীর প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সেতু রচনা কোরে রেখেছে।

দেবী এখানে বালিকামূর্ত্তি। মনে হল, ভগবানের যেমন গোপাল অর্থাৎ বালকমূর্ত্তি আছে, এ তেমনি ভগবতীর বালিকামূর্ত্তি। ভারতবর্ষের আর কোথাও ভগবতীর বালিকামূর্ত্তি নেই।

দেবীর মূর্ত্তিখানি বড়ো সুন্দর। মুখে-চোখে অনুপম সুষমা ও নিরুপম লাবণ্য যেন শতবাহু ঘিরে পূর্ণিমা রচনা কোরে রেখেছে। দেখে দেখে মনটা কেমন কোরে উঠল। মনে হল, এই সরলা বালিকাই একদিন বধূ-সাজে সজ্জিতা হয়ে চন্দ্রশেখরের আসার আশায় প্রহরের পর প্রহর গণেছিলেন।

যথাবিহিত পূজার্চ্চনাদি সেরে মন্দিরের বাইরে এলাম। এসে

দেখি সূর্য্য অস্ত যাচ্ছেন। মনে মনে বললাম, "যাওহে এবার, যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যাও।" রঙের গাঢ় বর্ণচ্ছটায় সুদূর দিগন্ত রাঙা হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের জলে, আকাশে. গাছের মাথায়—চারিদিকে ছোপ লেগেছে রঙের। পৃথিবী রঙে রঙে একাকার। সূর্য্য যেন দিগ্বধূদের সঙ্গে হোলী খেলছেন। শুনেছি, অস্তাচলের পেছনে সূর্য্যদেব ডুবে যান। কোথায় কোন্ মহাদেশে সে অস্তাচল, জানিনে—তবে আজ প্রত্যক্ষ দেখছি যে, দেব দিনকরডুব দিচ্ছেন এই কন্যাকুমারিকার সমুদ্রের ভেতর। ধীরে ধীরে······শনৈঃ শনৈঃ দিবাকর নেমে যাচ্ছেন বিশাল নীলাম্বুধির বিপুল গর্ভে।

অকস্মাৎ······কেন জানি না—আমি কবি নই, দার্শনিক নই, তবু মনে হল ওই রক্তবর্ণ ডুবন্ত সূর্য্য, ও যেন সূর্য্য নয়······ ও যেন কন্যাকুমারিকার ললাটে সযত্নে আঁকা সিন্দুর-বিন্দু। গভীর অভিমানে, ব্যর্থতার নৈরাশ্যে, অপেক্ষার ক্লান্তিতে একটু একটু কোরে মুছে যাচ্ছে। ওই সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস······মনে হলো ও যেন কলোচ্ছ্বাস নয়—কন্যাকুমারিকার মর্ম্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস।

এই বিশাল সমুদ্র, এই বিপুল সঙ্গমের মহামিলন-তীর্থ······ এর প্রতি তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, প্রতি হিল্লোলে, বেলাভূমির প্রতি বালুকণায় কন্যাকুমারীর করুণ স্মৃতি-কাহিনী জড়ানো আছে। এখানকার ছলছল কলকল সঙ্গীত, উচ্ছ্বসিত বায়ু-প্রবাহ—সবই যে সেই সরলা বালিকার কামনা-গীতালীর সুরঝঙ্কারে অবিরল মুখর। এ সঙ্গীতের ভাষা আমরা বুঝতে পারি না, কিন্তু অনুভব করতে পারি মর্ম্মে

মর্ম্মে। এখানকার মৃত্তিকার পরতে পরতে, সমুদ্রের কল্লোলে কল্লোলে, বায়ুর হিল্লোলে হিল্লোলে ক্রমাগত উদাত্তকণ্ঠে কে যেন বলছে—আমি আছি, আমি আছি, আমি আছি। কঠিন নির্ম্মমতায় কালস্রোত হু হু কোরে বয়ে চলে যাবে। অসহ্য নিষ্ঠুরতায় দু'হাত দিয়ে ধ্বংশ কোরে, নিশ্চিহ্ন কোরে সব মুছে দিয়ে যাবে—তবু আমি বেঁচে থাকব······রূপহীন অমরতায়, মৃত্যুহীন অবিনশ্বরতায়। ভক্তের সাধনায়, ভক্তির ঐকান্তিকতায়, অনুরাগের বন্ধনে, মানুষের ভালবাসায় আমি চিরকাল বেঁচে রব। ভগবান আমায় বঞ্চনা করেছেন, কিন্তু মানুষের দয়া থেকে আমি বঞ্চিত হব না। এদের ভালবাসায়, এদের কামনায়, এদের ঈপ্সায় আমি যুগ-যুগান্তর ধরে বেঁচে থাকব।

সত্যি, আজো কন্যাকুমারী বেঁচে আছেন। সমুদ্র-উপকূলে এসে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হয়, আজো যেন তিনি দেবাদিদেব মহেশ্বরের অপেক্ষায় বসে আছেন এইখানে। ভাবলাম, কন্যা-কুমারীর বিবাহের লগ্ন হয় ত ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ভগবানকে পাবার কামনার লগ্ন এখনো ভ্রষ্ট হয় নি। সে যে চিরন্তন!

ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব ডুবে গেলেন। মনে হল, নীল-সমুদ্রের জলে এখনো জ্যোতির্ম্ময়ের মূর্ত্তিখানি আবছা-আবছা হয়ে জেগে আছে। ক্রমে ক্রমে সে আবছা-মূর্ত্তিও অস্পষ্ট হয়ে এলো, তারপর······তারপর আর দেখা গেল না।

মন্থর চরণে বেলাভূমি অতিক্রম করতে করতে ভাবলাম, এমনি কোরে আমিও একদিন ডুবে যাব। এই ডুবে-যাওয়াটাই

জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যি। এর চেয়ে নিছক, এর চেয়ে আসল, এর চেয়ে খাঁটি আর কিছু নেই। যা সত্য, যা শাশ্বত, তাব চেয়ে সুন্দর জগতে আর কী আছে। তাই জীবনের এই অবধারিত পরিণতিকে উল্লেখ কোরে কবি বলেছেন—

মরণ রে, তুহুঁ মোর শ্যাম সমান।

মনে মনে বললাম, কন্যাকুমারীর কাহিনী শুনে আমি ভুল করেছিলাম, বলেছিলাম, ভগবান, ভক্তকে কষ্ট দেবার জন্যেই কি তুমি শুধু আছ? কিন্তু এখন দেখছি তা নয়—এখন বুঝছি, কতো বড় মহৎ উদ্দেশ্য এর মধ্যে ছিল। দেবাদিদেব মহাদেব, তুমি অন্তর্য্যামী, তুমি মঙ্গলময়—অনেক বুঝে তবে তুমি আসোনি—লগ্ন ভ্রষ্ট করেছিলে। এলে ফুরিয়ে যেত......এমন কোরে অনাদি অনন্তকাল ধরে কন্যাকুমারী বেঁচে থাকতেন না। তাই আজো কন্যাকুমারী ফুরিয়ে যাননি......বিবাহ-বাসর সাজিয়ে দেবতার অপেক্ষায় এখানে প্রহর গণছেন। আজো তিনি অমর, অজর, অক্ষয়, অব্যয়। তাঁর এ প্রতীক্ষার শেষ নেই, সমাপ্তি নেই, আদি নেই, অন্ত নেই।

বেলাভূমির প্রান্তশেষে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে আঙুল দেখিয়ে রাও বললেন, "এই দেখুন, এখানকার পাথর, মাটি প্রভৃতির রঙ কেমন বিচিত্র। লোকে বলে, কন্যাকুমারী তাঁর বরণডালা এইখানে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

চেয়ে দেখলাম সত্যি। এখানকার পাথর, মাটি প্রভৃতির রঙ, বরণডালার রঙের অনুকরণে কন্যাকুমারীর জীবন-কাহিনীর সাক্ষী হয়ে আছে।

বেলাভূমি অতিক্রম কোরে আর একবার সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকালাম। সাগরের রঙ তখন কাল হয়ে এসেছে—মনে হচ্ছে, ও যেন একটা পৃথক জগৎ। ও জগতে রাত্রি বোধ হয় গভীর। ওপরে চেয়ে দেখলাম, আকাশে সবেমাত্র চাঁদ উঠেছে……তৃতীয়া কিম্বা চতুর্থীর চাঁদ। দেখে মনে হল, এমনি একদিন পূর্ণিমার চাঁদে এখানকার প্রকৃতি হেসে উঠেছিল। সে ছিল বোধ হয় কন্যা-কুমারীর বিবাহের রাত। চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে সমস্ত রাত কেটে গিয়েছিল, পূবের চাঁদ পশ্চিমের রেখান্তরালে ঢলে পড়ে ম্রিয়মান, পাণ্ডুর চোখ মেলে বলেছিল, "যাই।" তবু চন্দ্রশেখর এসে পৌঁছন নি। তারপর……কন্যাকুমারীর বিবাহ-রাত্রির অবসানে উদয়-পারে সূর্য্য উঁকি দিয়েছিলেন। সমুদ্রগর্ভ থেকে উদিত সূর্য্যের বিকীর্ণ রক্তাভা দেখে অভিমানিনী কন্যাকুমারী ছোট্ট মেয়েটির মত ঠোঁট ফুলিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, অধিবাসের দ্রব্য, বিবাহের বরণডালা……মুছে ফেলেছিলেন সযত্নে রচিত কপোলের পত্রলেখা……ললাটের সিন্দুরবিন্দু……নয়নের কাজল-চিহ্ন। গভীর বেদনায় আঁখি-বারুণীর তীররেখা ছাপিয়ে ফোঁটা ফোঁটা কোরে মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ে মৃত্তিকা ভিজিয়েছিল। সে অশ্রুর মুক্তা-মালা বোধ হয় আজো সমুদ্রের বেলাভূমিতে লুকোন আছে।

রাও তাগাদা দিলেন, "মিঃ চৌধুরী, আমাদের একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার। দেরী হলে শুচীন্দ্রম্-মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে।"

অস্ফুটে বললাম, "তাড়াতাড়ি ? তা বেশ চলুন।"

বললাম বটে চলুন, কিন্তু মন যেন আর যেতে চায় না। এই সাগর-তীরের বেলাভূমিতে সে বাকী ক'টা দিন অপার আনন্দে কাটিয়ে দিতে চায়।

তাড়াতাড়ি ? জীবনে অনেক তাড়াতাড়ি তো করেছি। সময়ের মূল্য, তাও তো অনেক মেনেছি। এবার না হয় একটু দেরীই হল··· হলই বা একটু ব্যতিক্রম। তাতে কী এমন ক্ষতি হবে ? এই সাগর-তীরে বসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভাবাবেশে কেঁদে ফেলেছিলেন, দুটি চক্ষু বেয়ে দরদর ধারে জল ঝরে পড়েছিল······স্বামী বিবেকানন্দ এই নির্জ্জনতায় বসে ভগবানের দেখা পেয়েছিলেন, শঙ্করাচার্য্য খুঁজে পেয়েছিলেন ইষ্ট-দেবতাকে। এই পূত-পবিত্র স্থান, এই আত্মানুভূতির অপূর্ব্ব পরিসর······এইখানে দাঁড়িয়ে স্থানের পবিত্রতায়, ভগবানের অনুগ্রহে যদি দু'দণ্ডের জন্যও নিজেকে ভুলতে পাবি······যদি মুহূর্ত্তের জন্যও সমস্ত শরীরকে শিহরিত কোরে সেই অপার আনন্দের বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যায়······ জীবন যে ধন্য হয়ে যাবে ! লাভ-লোকসানের পাটিগণিত নিয়ে যোগ-বিয়োগ ত অনেক করেছি ! লাভের জন্য, জৈব প্রয়োজনের তাগাদায় অনেক সময় ত নষ্ট করেছি—আজ অন্তরেব প্রেরণায়, অনুভূতির তাগিদে যদি একটু লোকসানই করি তো, কী এমন ক্ষতি হবে—কী এমন অন্যায় হবে ? আজ আছি, কাল হয়ত থাকব না।—

"জীবনেরে কে রাখিতে পারে,<br>
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।

তাব নিমন্ত্রণ লোকে লোকে,

নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।

আজ যে বাসনা মনেব অলিতে-গলিতে দুর্ব্বাব হযে উঠেছে, কাল হয় ত সে থাকবে না, স্তিমিত হযে নিভে যাবে। তবু……। একাব মতে মত নয……সবাইকে নিযে আমি। এদেব অস্তিত্বেব খাতিরেই অস্তিত্বেব মর্য্যাদা। সুতরাং, মোটবে গিযে উঠলাম, মোটর ছুটলো শুচীন্দ্রমেব উদ্দেশে।

* * * *

শুচীন্দ্রমে পৌঁছুলাম সাতটা নাগাদ। দেবালয়েব পবিধি
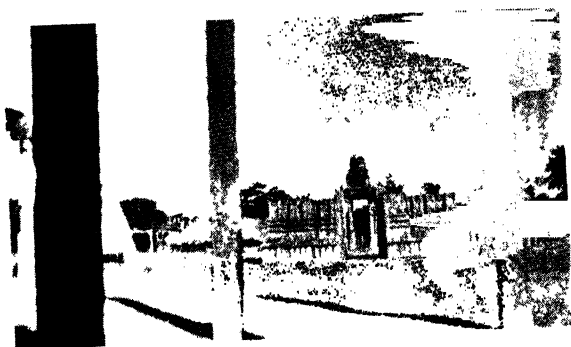
শুচীন্দ্রম্ মন্দিব-দ্বাব—(ত্রিবাঙ্কুব বাজ্য)

খুব ছোট নয়, মাঝামাঝি। মন্দিব গাত্রে, স্তম্ভে প্রচুব কারুকার্য্য থাকলেও সেগুলিব তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

পুবাকালে শুচীন্দ্রমেব নাম জ্ঞানাবণ্য ছিল। তখন এখানে

মহর্ষি অত্রি ও সতী অনুসূয়া বাস করতেন। শ্রীবিষ্ণুর উপাসনার জন্যে মহর্ষি অন্যত্র গেলে সতী অনুসূয়া স্বামীর পাদোদক সংগ্রহ কোরে, এই বনে একলা বাস করতে লাগলেন। এদিকে নারদ স্বর্গে এসে খবর দিলেন যে, সতী যদি পৃথিবীতে কেউ থাকে তো, সে অত্রি-পত্নী অনুসূয়া। শুনে স্বর্গের দেবীদের অনুসূয়ার ওপর অসূয়া হল। তাঁরা মনে মনে স্থির করলেন, একবার অনুসূয়ার সতীত্বের পরীক্ষা কোরে দেখবেন।

অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ভিক্ষুকের বেশে অতিথি হলেন অনুসূয়ার কুটিরে। অতিথি নারায়ণ—অনুসূয়া তাঁদের সেবার জন্যে যথোচিত আয়োজন করলেন।

কিন্তু আহারের পূর্ব্বে ছদ্মবেশী ত্রিমূর্ত্তি বললেন, "আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি যে, পরিবেশনকারিণীর দেহে যদি কোন আচ্ছাদন থাকে তো, আমরা তার হাতে আহার্য্য গ্রহণ করব না।" অনুসূয়া বিপদে পড়লেন। তবে কি অতিথি বিমুখ হবে? স্বামীর পাদোদকে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। সেই পাদোদক তিনি অতিথিদের গায়ে ছিটিয়ে দিলেন এবং দেওয়া মাত্রই অতিথিত্রয় শিশুতে পরিণত হল।

এমনি কোরে সতী অনুসূয়া ত্রিমূর্ত্তির ছলকেও পরাস্ত করলেন।

এদিকে নারদ গিয়ে ত্রিমূর্ত্তির দেবীদের সংবাদ দিলেন যে, অনুসূয়ার আশ্রমে অতিথি হয়ে আপনাদের স্বামী মহাপ্রভুরা শিশু হয়ে দোলনায় দোল খাচ্ছে। ছুটে এলেন স্বর্গের দেবীরা, এমন সময় অত্রিও আশ্রমে ফিরলেন।

কিন্তু মুস্কিল হল এই যে, কোন্ শিশুটি কার স্বামী, বহু চেষ্টা কোরেও দেবীরা তা স্থির করতে পারলেন না।

অবশেষে অনুসূয়ার দয়ায় তাঁরা আবার স্বামী ফিরে পেলেন।

জ্ঞানারণ্যের পর এর নাম কেমন কোরে শুচীন্দ্রম্ হয়েছে, সে গল্পও শুনলাম।

এক সময় ইন্দ্রের মাথায় কুবুদ্ধি চাপল। তিনি অহল্যাকে পাবার জন্য এক কৌশল করলেন। গৌতমের কুটীরের বাইরে কাকের স্বর অনুকরণ কোরে বারবার ডাকতে ঋষি ভাবলেন, সকাল হয়ে গেছে। সুতরাং তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ কোরে তিনি গঙ্গায় চললেন পূজার্চ্চনা করবার জন্য। এদিকে অহল্যাকে একলা পেয়ে ইন্দ্র প্রবেশ করলেন আশ্রমে।

গঙ্গাতীরে গিয়ে গৌতম বুঝতে পারলেন, রাত্রি এখনো গভীর। তখনি তাঁর সন্দেহ হলো, নিশ্চয়ই কোন একটা বিপদ ঘটেছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হলেন। ঋষির চোখ দিয়ে তখন রাগে অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। তিনি শাপ দিলেন, "তোর এই কুপ্রবৃত্তির জন্য দেহে তোর অসংখ্য যোনি সৃষ্টি হবে।" আর অহল্যাকে শাপ দিলেন, "তুই পাষাণ হবি।" হিন্দুমাত্রেই জানেন, রামচন্দ্রের শ্রীচরণ-স্পর্শে পাষাণ-অহল্যা-উদ্ধার হয়েছিলেন। আর ইন্দ্র এই অশুচি যোনি-চিহ্ন হতে মুক্তি পেয়ে শুচী হয়েছিলেন জ্ঞানারণ্যে তপস্যা কোরে। সেইজন্য এর নাম হয়েছে শুচীন্দ্রম্ (শুচী + ইন্দ্রম্)।

এখানে অনেক দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে। মন্দিরে পূজার্চ্চনা সেরে সেগুলি দর্শন কোরে আমরা মোটরে উঠলাম।

রাও বললেন, "আদিকেশব যাবার পথে নাগের কয়েল দর্শন কোরে যাব।"

বললাম, "পথেই পড়বে কি?"

বললেন, "হ্যাঁ। নাগের কয়েল যেখানে কুমারিকার যাত্রীরা বাস বদল করে, তার খুব কাছেই।"

চলন্ত মোটরে বসে তখনো কন্যাকুমারিকার স্বপ্ন দেখছি, সে আনন্দ আর কিছুতেই মন থেকে মুছতে চাইছে না।

জিজ্ঞাসা করলাম রাওকে, "আচ্ছা চৈতন্য-চরিতামৃতে পড়েছিলাম কন্যাকুমারিকার আমলকীতলায় শিব আছেন। কৈ, তা ত দেখলাম না! আগে ছিল কি?"

রাও বললেন, "তা জানি না। আমরা তীর্থযাত্রী নিয়ে এসে এখানে আমলকীতলার শিবও কখনো দেখি নি, বা কারো মুখে কখনো শুনেছি বলেও মনে পড়ে না।"

খানিকপরেই নাগের কয়েল এলো এবং আমরা দেবদর্শনাভিলাষে নামলাম।

দেবালয়টি ছোট। মূল-মন্দিরে বিষ্ণুর মূর্ত্তি বিরাজমান ও পাশের একটি প্রকোষ্ঠে ভগবানের বাহন শেষনাগের মূর্ত্তি। পৃথক ভাবে নাগ-মূর্ত্তি এই প্রথম দেখলাম। এইজন্যই বোধ হয় এর নাম নাগের কয়েল (কয়েল = মন্দির)।

এখান থেকে দিক পরিবর্ত্তন কোরে আমাদের মোটর চলল আদিকেশবের উদ্দেশে।

*　　*　　*　　*　　*

আদিকেশবে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত্রি আটটা বেজে গেছে। আদিকেশবে শ্রীবিষ্ণুর অনন্ত-শয়ন মূর্ত্তি।

এখানেও বিলুর মা নতজানু হয়ে প্রণাম করতে গিয়ে বাধা পেলেন। মন্দিরের ভেতরটি গাঢ় অন্ধকার। দীপালোকে দেবতা দর্শনের আশায় আমরা মন্দির-সংলগ্ন সোপানের ওপর ওঠবার উদ্যোগ করতেই পুরোহিত মহাশয় হাত নেড়ে সবাইকে বারণ করলেন। সুতরাং, মন্দির-সংলগ্ন সিঁড়ির এদিকে দাঁড়িয়ে মৃদু দীপালোকের সাহায্যে আদিকেশবের মূর্ত্তি দেখলাম। ভাল কোরে দেখতে না পেয়ে মনটা বিমর্ষ হলো। অপরাপর জায়গায় প্রাণভরে দেখে তৃপ্ত হয়েছি, কিন্তু এখানে তা হল না। মনে মনে শ্রীবিষ্ণুর অনন্ত-শয়ন মূর্ত্তির ছবি নিজের মনের ভেতর আঁকবার চেষ্টা করতে করতে নীচে নেমে মোটরে উঠলাম।

মনে পড়ল শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য-লীলার পদগুলি—

"সেইদিন চলি আইলা পয়স্বিনী-তীরে।<br>
স্নান করি গেলা আদিকেশব মন্দিরে॥<br>
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা।<br>
নতি-স্তুতি নৃত্য-গীত বহুত করিলা॥<br>
প্রেম দেখি লোকের হৈল চমৎকার।<br>
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার॥"

মহাপ্রভু একদিন এ মন্দিরে এসেছিলেন। তাঁর পূত চরণ-স্পর্শে এখানকার ধূলিকণা পবিত্র। পয়স্বিনী-তীরে স্নান কোরে যে আদিকেশবের মূর্ত্তি দেখে মহাপ্রভু ভাবাবেশে আবিষ্ট হয়েছিলেন, সে মূর্ত্তি আমরা ভাল কোরে দেখতে পেলাম না, এই আপশোষটাই মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল।

শুনলাম আদিকেশবের মন্দিরের কাছে একটি নদী আছে; তার নাম "পেরিয়ার"। জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, এ ছাড়া পয়স্বিনী বলে কাছাকাছি কোন নদী আছে কি?" সুব্বারাও 'না' বলতে আমি তাঁকে চৈতন্য-চরিতামৃতের পদগুলি বলে মহাপ্রভুর পয়স্বিনীতে স্নানের কথা উল্লেখ করলাম।

একটু ভেবে রাও বললেন, "'পেরিয়ার' কথাটি তামিল—এর অর্থ, বড় নদী। বোধ হয় বড় নদী বোঝাবার জন্যে সংস্কৃত কথা পয়স্বিনী প্রযোজ্য হয়েছে।"

আদিকেশব দর্শন কোরে পদ্মবিলাসে ফিরলাম রাত্রি দশটা নাগাদ। আহারাদি সেরে নিয়ে সেই রাত্রেই মালপত্রাদি সেলুনে পাঠিয়ে দিলাম।

ইচ্ছে ছিল, পদ্মবিলাসে রাত কাটিয়ে প্রত্যূষে সেলুনে গিয়ে উপস্থিত হব। কিন্তু, প্রভাত বললে, "সেটা যুক্তিসঙ্গত হবে না, কারণ, এখান থেকে স্টেশনে হয়ত দেরী হতে পারে। তার চেয়ে চলো রাত্তিরেই গিয়ে সেলুনে ঘুমোবার বন্দোবস্ত করি।"

যুক্তিটা মন্দ নয়, বললাম, "তাই চল। সকালে আর তাড়া-হুড়ো করে কাজ নেই।"

সুতরাং, অতিথি-অভ্যর্থনা আপিসের কর্ম্মচারীকে ডেকে পাঠিয়ে বিদায় গ্রহনান্তে আমরা সেলুনে গিয়ে উঠলাম।

পরদিন সকাল আটটার সময় ত্রিবেন্দ্রাম্ এক্সপ্রেসের সহযাত্রী হয়ে আমাদের সেলুন চলল তিরুবন্নমলয় বা অরুণাচলের দিকে।

ভ্রমণ-তালিকা যতো শেষ হয়ে আসছে, ততই যেন মায়ায় জড়িয়ে পড়ছি। তীর্থভ্রমণ কোরে কোরে মনটা বাউলধর্ম্মী হয়ে পড়েছে—ঘুরে বেড়ানোর নেশা যেন তাকে পেয়ে বসেছে। কেবলই আন্তরিক কণ্ঠে সে যেন বলছে, জীবনের বাকী দিন ক'টাও এমনি কোরে চলুক। যাত্রা যেন না থামে, পথ যেন না ফুরোয়। কিন্তু, এ পথ একদিন ফুরোবে, এ যাত্রাও একদিন থামবে, এ অববারিত সত্য। সে সত্যকে কোন কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তারপর......! তাই ভ্রমণ-তালিকা শেষ হয়ে আসছে মনে হলেই মনটা ম্লান হয়ে আসে......ভয় হয়।

চলন্ত গাড়ীতে বসে রোজনামচা লিখতে গিয়ে বারবার কোরে ত্রিবাঙ্কুরের কথা মনে পড়তে লাগল। ভারতীয় করদরাজ্যের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুরকে তৃতীয় স্থান দেওয়া যায়। শুনলাম, বাৎসরিক আয় এর চার কোটি টাকা।

সমস্ত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ও তার আয়ের মালিক বিগ্রহ শ্রীশ্রীপদ্মনাভ স্বামী। রাজা মাত্র সেবায়ৎ। সেবায়ৎ হিসেবে তাঁর একটা বাৎসরিক বৃত্তি আছে। রাজার নিজের ব্যক্তিগত ব্যয় যা, তা এই বৃত্তির টাকা থেকেই খরচ হয়। দান-দাতব্য প্রভৃতির খরচ সবই

এই বৃত্তির অর্থের অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যের আয়ের টাকায় রাজার কোন অধিকার নেই—সে টাকা ঠাকুরের নিজস্ব সম্পত্তি।

রাজার সঙ্গে যদিও আলাপ করবার ভাগ্য হয়নি, তবু মোটরে যাবার সময় চোখাচোখি হতে অনুমানে বুঝেছিলাম, রাজা বয়সে তরুণ।

স্যর রামস্বামী আয়ারের মুখে শুনেছিলাম, রাজা লেখাপড়াও ভাল জানেন। বয়সে তরুণ হলেও এবং বিদেশী শিক্ষার প্রভাব থাকলেও ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ধার্ম্মিক, স্বধর্ম্মানুরাগী এবং নিষ্ঠাবান। প্রত্যহ ন'টা থেকে দশটার মধ্যে শ্রীশ্রীপদ্মনাভ স্বামীকে ইনি প্রণাম করতে মন্দিরে যান। এই প্রণামের কথায় মনে পড়ল এখানকার দেব-দেবীকে প্রণাম করার বিধি-নিষেধের কথা। পূর্ব্বে যে সব বিধির উল্লেখ করেছি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সমস্ত দেবদেবীর বেলাতেই ঐ বিধি বলবৎ। দেব-দেবীর দর্শন করারও একটি নির্দ্ধারিত সময় আছে। সকালে ও সন্ধ্যায় পাঁচটা থেকে সাতটা, এই দু'ঘণ্টার মধ্যে দর্শন পাওয়া যায়, তা ছাড়া অন্য কোন সময় দর্শন পাবার উপায় নেই।

আর একটি বিধির কথা ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করেছি ; সেটি হচ্ছে, এখানকার অর্থাৎ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সমস্ত দেবদেবীকে দর্শন ও প্রণামের সময় পুরুষদের গায়ে কোন জামা বা চাদর থাকলে পুরোহিতেরা ঊর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত করতে বলেন। দর্শন ও প্রণাম করবার সময় সকলের বেলাতেই এই রীতি, এমন কি রাজারও।

রোজনামচায় এইগুলি 'টুকে' রাখছি, এমন সময় রাও ঢুকলেন, "মিঃ চৌধুরী কি ডায়েরী লিখছেন?"

বললাম, "হ্যাঁ। কেন বলুন তো?"

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে তিনি বললেন, "এখানকার অর্থাৎ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একটা নিয়ম আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। ডায়েরীতে 'নোট' করে নিন্।"

ডায়েরী থেকে মুখ তুলে বললাম, "কী বলুন তো?

"ত্রিবাঙ্কুরে রাজার ছেলে রাজা হয় না।"

"তবে...... ?"

"ভাগনে রাজা হয়—"

বললাম, "এই যে রাজা দেখলাম, উনি তাহলে আগেকার রাজার ভাগ্নে?"

রাও জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।"

## অরুণাচল

সমস্ত রাত ট্রেণে কাটিয়ে ভোরবেলা তিরুবন্নমলয় স্টেশনে নামলাম। এখান থেকে মোটরে অরুণাচল পাহাড়ে যেতে হয়— দূরত্ব হবে প্রায় এক মাইল।

তিরুবন্নমলয় ও অরুণাচল একই। "তিরুবন্নমলয়" নামটি এদেশীয় এবং ঐ নামে এখানকার বিগ্রহ শিবেরও নাম "তিরুবন্ন-

মলয়েশ্বর।" তীর্থ-সংহিতায় একে "অরুণাচল" ও "অরুণাচলেশ্বর" বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ইতিহাসে এই তিরুবন্নমলয়ের উল্লেখ দেখা যায়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ স্থানটি টিপু সুলতানের অধিকারে ছিল; পরে টিপুর পতনের সঙ্গে সঙ্গে এটি ইংরাজের হস্তগত হয়।

একটি ধর্ম্মশালা দেখিয়ে রাও বললেন, "এটি এখানকার নটকোটি শেঠীদের ধর্ম্মশালা। এই শেঠীরাই এ প্রদেশের বিখ্যাত ধনী। মন্দির-নির্ম্মাণ, সংস্কার প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে এঁরা অকাতরে ব্যয় করেন।

তিরুবন্নমলয়ে মূল বিগ্রহ শিব—শিব এখানে তেজলিঙ্গে বিরাজিত। এইটি দেখা হলে শিবের যে পঞ্চলিঙ্গের বিগ্রহ আছে, তার সব ক'টিই দেখা হবে। এর পূর্ব্বে আমরা কালহস্তীতে দেখেছি বায়ুলিঙ্গ (মরুৎ লিঙ্গ), চিদম্বরমে দেখেছি ব্যোমলিঙ্গ, শিবকাঞ্চীতে দেখেছি ক্ষিতিলিঙ্গ ও জম্বুকেশ্বরে দেখেছি অপলিঙ্গ। বাকী আছে তেজলিঙ্গ—সে এই তিরুবন্নমলয়ে।

বেলা ন'টা নাগাদ আমরা অরুণাচল অর্থাৎ তিরুবন্নমলয়ের পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলাম। মন্দিরটি পাহাড়ের গায়ে।

আমরা এক একটি কোরে সাতটি প্রকোষ্ঠ পার হয়ে মন্দিরের সামনে পৌঁছুলাম। মন্দিরের ভেতরটি ঘন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সেই জন্য দিবারাত্রি আলো জ্বলে।

শিবের নৈবেদ্য এখানে নারিকেল, কলা, সুপুরী ও পান।

রাও বললেন, "কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে এখানকার বাৎসরিক

অরুণাচলম্—পর্ব্বতমূলে মন্দিরের দৃশ্য—পৃঃ ২৭৪

উৎসব হয়। এই উৎসবের নাম "ব্রহ্মোৎসব" এবং এই এখানকার প্রধান উৎসবানুষ্ঠান।"

দেবতার পূজার্চ্চনা সেরে আমরা দেবী দর্শনে গেলাম। পার্ব্বতীর নাম এখানে "অপীতকুচাম্বলা"—স্থানীয় নাম "উন্নামাল্লুই।"

দেবীর মন্দিরের সামনে পেঁাছে রাও বললেন, "ব্রহ্মোৎসবের সময় সন্ধ্যার পর দেবী উন্নামাল্লুইকে বাইরে আনবার পূর্ব্বে কর্পূরের আলো জ্বেলে দেবীর সামনে একটি পরদা তৈরী করা হয়, এই অগ্নিশিখার আড়ালে দেবী বিরাজ করেন—মূর্ত্তি কারও দৃষ্টিগোচর হয় না। তারপর পুরোহিতেরা দেবীকে প্রাঙ্গণে এনে উপস্থিত করলে একটি হাউই-বাজী ছোঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরালোকের পরদাটি সরানো হয়। দেবী তখন ভক্তদের দর্শন দেন। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে একটি কুণ্ড আছে। স্থলপুরাণের মতে এই কুণ্ডে হোম কোরে পার্ব্বতী মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন। আগে থেকেই ঘৃত, নববস্ত্র প্রভৃতি দেওয়া থাকে; হাউইয়ের নিশানা দেখলেই সেখানে উপস্থিত একটি ব্যক্তি এই কুণ্ডে অগ্নিসংযোগ করে।

"বহু দূরদূরান্তরের লোক, যারা দেবীর কাছে মানস কোরে ঐ কার্ত্তিক মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে উপবাস কোরে থাকে, তারা ঐ কুণ্ডের অগ্নি দেখলে দেবীর পূজা সাঙ্গ হয়েছে জেনে উপবাস ভঙ্গ করে।"

সমস্ত প্রকোষ্ঠগুলি ও মন্দিরের চতুঃপার্শ্ব ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম।

অরুণাচলের পূর্ব্বদিকের গোপুরটি এগারো তোলা। মনে হয়, এতো চওড়া গোপুর এর আগে আর কোথাও দেখিনি। এ অঞ্চলের গোপুরের মধ্যে মাদুরার গোপুরই সবচেয়ে উঁচু এবং শ্রেষ্ঠ। তারপর রামেশ্বর এবং পরে অরুণাচলের নাম করা যায়।

শ্রীরঙ্গমের গোপুর এরই পরের পঙক্তিতে পড়ে।

আশে-পাশে ছোট ছোট আরো অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখে বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ আমরা সেলুনে ফিরে এলাম।

ঠিক হল, বৈকালে মহর্ষি রমণের আশ্রম দেখতে যাব।

দুপুরের পর সেলুনের জানালা দিয়ে বসে পর্ব্বতের চূড়া দেখছি, আর ভাবছি নানান কথা ; এমন সময় রাও এসে ঢুকলেন, বললেন, "আচ্ছা মিঃ চৌধুরী ! আপনি ও-বেলা মহর্ষি রমণের আশ্রমের কথা জানতে চেয়েছিলেন কেন বলুন ত ?"

বললাম, "দেখতে যাব বলে ? আপনি মহর্ষির সম্বন্ধে কিছু জানেন কি ?"

কুন্ঠিতস্বরে রাও বললেন, "না, বিশেষ কিছুই জানি না—তবে নামটা কখনো কানে শুনেছি মনে হয়।

বললাম, "কিন্তু, আপনাদের জানা উচিত। কারণ, মহর্ষি রমণ আপনাদের দেশের লোক। আমরা যদি বলি ঠাকুর পরমহংসের সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তা হলে সেটা কি কম লজ্জার কথা !"

চেয়ারটা টেনে নিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে রাও জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি জানেন নিশ্চয়ই। বলুন না শুনি।"

রাও-এর আগ্রহ দেখে মনে মনে খুসি হয়ে আরম্ভ করলাম, "প্রায় বছর চারেক আগে আমাকে এক বন্ধু একখানি বই দিয়েছিলেন। সে বইখানির নাম হচ্ছে—"My search in sacred India"— লেখক পল ব্রান্টান (Paul Brunton)। বইখানি পেয়ে পড়বার জন্য বড় কৌতূহল হল। কারণ, ভারতবর্ষের কোন্ সুখ্যাতি ওরা এতে লিপিবদ্ধ করেছে, তাই দেখবার বাসনাই প্রধান। পড়তে আরম্ভ করলাম। পল ব্রান্টানের শোনা কথা নয়—এ তাঁর নিজের জীবনের কাহিনী। তিনি ছিলেন একজন সাংবাদিক। হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, কে যেন তাঁকে বলছে, 'তোমার কাজ এখানে নয়—ভারতবর্ষে।'

ঘুমের ঘোর কাটবার পরও ঐ কথাটি সমস্ত দিন ধরে প্রাত্যহিক কাজের ফাঁকে উঁকি দিয়ে তাকে মনে করিয়ে দিতে লাগল, 'তোমার কাজ এখানে নয়—ভারতবর্ষে।'

এই ঘটনার দিন কতক পরেই পল ব্রান্টান ভারতবর্ষে এলেন। প্রায় দু'বৎসর কাল নানাস্থানে গুরুর অনুসন্ধান করতে করতে শেষে তিনি এই অরুণাচলে এসে দেখা পেলেন মহর্ষি রমণের।

মহর্ষির অজস্র গুণ-গান ও কেন পল ব্রান্টান তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন, তারই কৈফিয়ৎ এই বইয়ে বিস্তৃতভাবে লেখা আছে।

মুগ্ধ পল ব্রান্টান মহর্ষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এই হল ঘটনা, যা পড়ে মহর্ষিকে দেখবার আমার আগ্রহ হয়েছে।"

বিমুগ্ধের মত শুনছিলেন রাও, বললেন, "সাধারণ লোকে হয়ত এ সব কাহিনী বিশ্বাসই করবে না।"

বললাম, "বিশ্বাস না করার মত কিছু নেই তো এতে! অবিশ্বাসের কী আছে! তা ছাড়া প্রমাণও তো আছে যথেষ্ট। এই ভারতেই বুদ্ধদেব জন্মেছিলেন, যিনি বর্ণমালার প্রথম অক্ষর "অ" শিখেই বলেছিলেন, "অনিত্যঃ সর্ব্বসংসারস্কন্ধঃ" এবং পরবর্ত্তী বর্ণ "আ" শিখেই বলেছিলেন, "আত্মপরহিতঃ কার্য্যঃ।" এই ভারতবর্ষেই জন্মেছিলেন শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ, এই ভারতের মাটিতেই জন্মেছিলেন শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যাঁর ভাবের বন্যায় সমস্ত ভারতের দুকুল ভেসে গিয়েছিল। এই ভারতেই জন্মেছিলেন তৈলঙ্গস্বামী, যাঁর অলৌকিক কাহিনী শুনে সমস্ত জগৎ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। এই ভারতেই রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা প্রভৃতি সাধক জন্ম নিয়েছিলেন। এ কি যে সে দেশ! যুগে যুগে ভগবান এই ভারতেই সম্ভব হয়েছেন।

তাই ভারতের যশঃসৌরভে সমস্ত পৃথিবী ভরে আছে। এঁদেরই কীর্ত্তিগাথায় ভারতবর্ষ আজো মাথা উঁচু কোরে দাঁড়িয়ে আছে।

কথাগুলি শুনে রাও বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। দেশ-গৌরবের কাহিনী, জাতির যশোগাথা, ধর্ম্মের জয়গান কাকে না আনন্দ দেয়!

কথা কইতে কইতে পাঁচটা বেজে গেল।

বললাম, "চলুন এইবার বেরোন যাক।"

মহর্ষি রমণ—অরুণাচলম্‌ আশ্রমে—পৃঃ ২৭৯

অরুণাচল দেবমন্দির থেকে প্রায় দেড়মাইল দূরে মহর্ষি রমণের আশ্রম। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা এসে পৌঁছলাম।

চমৎকার জায়গা। পাহাড় যেখানে মাটি ছুঁয়েছে, ঠিক সেইখানে মহর্ষির আশ্রম। ভেতর ঢুকে দেখলাম, শিষ্যপরিবৃত * হয়ে মহর্ষি একটি বিলাতী সোফায় একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র-চর্ম্মের ওপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। "নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপমিব" মূর্ত্তিখানি; চাঞ্চল্য নেই, উদ্বেগ নেই, অঙ্গ সঞ্চালন নেই—ধীর, স্থির। সে এক অদ্ভুত স্থৈর্য্য। মনে হয়, মন যেন দূর দূরান্তরের কোন্ আনন্দ রসে গভীর ভাবে মগ্ন হয়ে গেছে, দেহের পরিধিগত সীমারেখার সঙ্গে তার কোন সংস্পর্শ ই নেই। অপূর্ব্ব দীপ্তি দুটি আয়ত চোখে। যেমন গভীর, তেমনি দ্যুতিমান। মনে হয়, ওই দুটি দীপ্তিমান আঁখি-প্রদীপ দিয়ে মনের অন্ধকারের পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রায় দু'ঘণ্টা আমরা এই মহাপুরুষের আশ্রমে বসে রইলাম। মাঝে জন কতক ব্রহ্মচারী বালক এসে তাঁদের সুধানিঃসৃত কণ্ঠে গান আরম্ভ করলেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থু॥"

---

* মহর্ষির সে দিনকার সমবেত শিষ্য-ভক্তদের মধ্যে একটি সুইডিস ভদ্রমহিলা ও একটি আমেরিকান ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। মিঃ পল ব্রাণ্টনের কথা জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, তিনি প্রায় দু'মাস পূর্ব্বে প্রব্রজ্যায় বেরিয়েছেন।

এই বেদগান শেষ হবার পরেই আর একদল গায়ক এলেন। সুললিত কণ্ঠে আরম্ভ হল তামিল ভজন—

বেশ কাটল সময়টা। পাহাড়ের পাদদেশে মহাপুরুষের আশ্রম, সামনে মহর্ষি রমণ, উদাত্ত কণ্ঠে বেদগান······সুললিত কণ্ঠে, ভজন-সুরে ভগবানের কাছে আপ্রাণ নিবেদন—বেশ লাগল সন্ধ্যেটা।

শুনলাম, মহর্ষি শাস্ত্র সম্বন্ধে বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন রকম বিতর্কে কারো সঙ্গে প্রবৃত্ত হন না। তবে কোন ভগবদ্ উপাসকের মনে ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় বা অন্য কোন প্রকারের আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রশ্ন উপস্থিত হলে তা নিবাকরণ করেন।

কিন্তু তার পূর্ব্বে এই সন্দিগ্ধ ব্যক্তির যে একান্ত ইচ্ছা আছে মহর্ষির উপদেশ গ্রহণে, সে আভাষ তাঁকে দেবার জন্য অন্ততঃ উপর্য্যুপরি তিন দিন আশ্রমে এসে স্থিরভাবে অপেক্ষা করতে হয়।

মহর্ষির বাণী, জীবনী প্রভৃতি পুস্তক.কারে প্রচারের জন্য আশ্রম সংলগ্ন একটি অ্যাপিস আছে। এই আপিস থেকে আশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। আপিসের সর্ব্বাধিকারী (Secretary) মহর্ষির ভাই।

দেশনেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং যমুনালাল একবার মহর্ষির সঙ্গে আশ্রমে দেখা করতে এসেছিলেন।

স্বরাজ কেমন কোরে পাওয়া যায়, স্বরাজের জন্যে চেষ্টা করা ন্যায় কি অন্যায় প্রভৃতি নানান প্রশ্ন যমুনালাল মহর্ষিকে করেছিলেন।

বাহুল্য বোধে সে সবের আর উল্লেখ করলাম না।

আশ্রম থেকে যাবার আগে রাজেন্দ্রপ্রসাদ মহর্ষিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "মহাত্মাজী (গান্ধিজী) আমায় আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে কোন কিছু বলবেন কি?" মৃদুহেসে মহর্ষি জবাব দিয়েছিলেন, "হৃদয় যখন হৃদয়ে লীন হয় তখন মৌখিক কথায় আর প্রয়োজন কি! যে শক্তি এখানেও কাজ করছে, সে শক্তি সেখানেও বর্ত্তমান। আমরা উভয়ে একই শক্তির বিভিন্ন রূপ।"

শুনলাম, মহর্ষির আহারের সময় যাঁরা উপস্থিত থাকেন, তাঁদিগকেই আহার্য্য বস্তু বিতরণ করা হয়।

আর একটি কথা শুনলাম। গভীর রাত্রে—কখন তা কেউ আজো দেখেনি...... মহর্ষি অরুণাচল পাহাড়ের ওপর উঠে সাধন-গুহায় প্রবেশ করেন। বাকী রাত্রিটুকু সেইখানেই সাধন-ভজন প্রভৃতিতে অতিবাহিত কোরে সকালবেলা আশ্রমে ফিরে আসেন।

ঘণ্টা দুই কাটিয়ে আশ্রম ছেড়ে যখন বাইরে এলাম, তখন সমাগত সন্ধ্যায় চারিদিককার জগৎকে মনে হতে লাগল নতুন। মনে হতে লাগল, আলো থেকে যেন অন্ধকারে এসে দাঁড়ালাম। এমনি কোরে জীবনেও একদিন সন্ধ্যা নামবে...... অন্ধকার গাঢ় হতে গাঢ়তর হবে......দৃষ্টি হবে স্তিমিতপ্রায়। তখন 'আমি' বলে যাকে নিয়ে এত টানাটানি চলছে, যাকে কেন্দ্র কোরে সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ, বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ সানন্দে জাল বুনছে...... সে সেদিন থাকবে না—সব ব্যক্তির, সব বস্তুর অতীত হয়ে সে নিরুদ্দেশের সন্ধানে পাড়ি দেবে। আত্মীয়স্বজন পিছু ডাকবে,

স্নেহ-আকর্ষণ নিবারণ করবে……অনুরাগ-ভালবাসার বন্ধন মাথা খুঁড়বে। তবু কি ধরে রাখা যাবে? না। এ দুর্ব্বার, একে নিবারণ করবে, এমন শক্তি পৃথিবীতে কারো নেই। তখন—

"পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।
আমি বাইব না মোর ভাঙ্গা-তরী এই ঘাটে॥"

তবু কী চেষ্টা মানুষের!–যার পরিণতিতে এই অবারিত সত্য স্থির নিশ্চিত, তবু তাকে ভুলে থাকবার জন্যে মানুষের কী প্রাণপণ। মানুষ জ্ঞানপাপী। তা ছাড়া আর কি! সে বোঝে সব, তবু ঘুরে মরে; সে জানে সব, তবু শশকের মত চোখ বুজে এই নিদারুণ সত্যকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে—

"হায়, রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।"

অথচ এই পথপ্রান্তে যে-সঞ্চয়কে ফেলে যেতে হবে, তার জন্যে কতো না আকুলি-বিকুলি……! রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনে হতেলাগল—আর মাত্র আজকের রাতটি!

কাল সকালেই সেলুনকে বিদায় দিতে হবে। দীর্ঘ একমাস কাল যে গাড়ীর ভেতর বাস করেছি, উপভোগ করেছি, আশ্রয় নিয়েছি, তাকে ছেড়ে দিতে হবে। আর সেই সঙ্গে এদেরও বিদায় দিতে হবে; তীর্থ-সঙ্গী সুব্বারাও……সেলুন-গাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক শিবলিঙ্গম্। দুটি মানুষ পেয়েছিলাম বেশ—একজন দেখেছে কিসে আমাদের সুখ-সুবিধা হয়, কিসে আমরা আরাম পেতে

পারি, ভোজনে, শয়নে, উপবেশনে কতোখানি সোয়াস্তির সমাবেশ করা যায়; আর, আর একজন দেখেছে, পারলৌকিক সঞ্চয় আমাদের কিসে সম্পূর্ণ হয়। ভগবৎ-ক্ষুধা, তীর্থদর্শনাকাঙ্ক্ষা আমাদের কেমন কোরে মেটে! একজন চেয়েছে বাইরেটা ভরিয়ে তুলতে, আর একজন চেয়েছে অন্তরটা পরিপূর্ণ করতে। এমনি কোরে এরা দু'জনেই ভেতর-বাইরে ভরে অনুক্ষণ বিরাজ করেছে।

তাই এদের ছেড়ে যেতেও মনটা কাতর হবে। কলকাতা ফিরে যাব, দক্ষিণ-ভারতের তীর্থ-পরিবেশ থেকে দূরে চলে যাব, কিন্তু এদের স্মৃতিকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারব না।

মন্দির-ঐশ্বর্য্য, ভগবৎ ভক্তি, তীর্থদর্শন প্রভৃতির স্মৃতির পিছন থেকে এরাও উঁকি দেবে ক্ষণে ক্ষণে......বলবে, আপনার এ আনন্দের পার্শ্বচর ছিলাম আমরা।

* * * *

ফিরে এলাম মান্দ্রাজে। এবার আমরা একটি সম্ভ্রান্ত চেটীর বাগান-বাটীতে আশ্রয় নিলাম। চেটী মহাশয় সেই বাটীর এক অংশে বাস করছিলেন; আমাদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কোরে দিয়েছিলেন। এই থাকবার বন্দোবস্তের মূলে ছিলেন আমার পূর্ব্ব পরিচিত নটেশ্বরম্ মুডেলিয়ার, যাঁর কথা গ্রন্থারম্ভের দিকে মান্দ্রাজের বিবরণে পূর্ব্বে বলেছি। এই চেটী মহাশয় প্রভূত অর্থশালী হলেও অত্যন্ত অমায়িক ও উদার প্রকৃতির। আমরা দু'দিন তাঁর আতিথ্যে বেশ আনন্দে ছিলাম। এই দু'দিন বাজার করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করি নাই, তবে সকালে ও সন্ধ্যায়

একবার কোরে পার্থসারথী ও স্থানীয় শিবমন্দিরে দর্শনাদি করেছিলাম।

ক্রমে কলিকাতায় ফেরবার দিন এলো। যাত্রার দিন, সকালবেলা রাওকে ডেকে পাঠালাম। ইচ্ছা যে, কিছু টাকা প্রীতির নিদর্শন বলে তাঁর হাতে দোব।

রাও এলেন, টাকা দিতে চাইতেই বললেন, "না। এ আমি নিতে পারব না।"

অবাক হয়ে বললাম, "কেন বলুন তো? ঘুষ নয়, এ আমার আন্তরিক প্রীতি।"

তবু না, রাও কিছুতেই রাজী হতে চান না।

আমার স্ত্রী এলেন, বিলুর মা এলেন......খুকুমণি, প্রভাত সবাই এলো।

স্ত্রী বললেন, "বলো, তোমার বউকে শাড়ী পরবার জন্যে টাকা দিচ্ছি।"

বললাম, "আপনার ছোট মাতাজী বলছেন, এ টাকাটি আমরা আপনার স্ত্রীকে শাড়ী কেনবার জন্য দিচ্ছি।......ঐ শুনুন আপনার বড় মাতাজী কি বলছেন।"

বিলুর মা সেই সঙ্গে হিন্দী কোরে বললেন, "আমরা মা, তুমি ছেলের মত, না নিলে খুবই দুঃখ পাব আমরা।"

হাত পেতে টাকাটি নিয়ে নমস্কার করলেন রাও।

চলে যাবার আগে বললেন, "মনটা আনচান্ করছে।

অনেক যাত্রী নিয়ে বহু তীর্থে বহুবার গেছি, অনেক লোকের সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু এমন আনন্দ কখনো পাই নি।"

রাও-এর কণ্ঠস্বরে কেমন একটা বেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল। কথা ক'টি শুনে সত্যিই মনটা কেমন কোরে উঠল, বললাম, "ভাগ্যে থাকে আবার হয় ত আপনার সঙ্গে দেখা হবে।" *

ম্লানমুখে রাও উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "দুপুরের পর আমি আসব। সমস্ত বন্দোবস্ত কোরে আপনাদের ট্রেণে তুলে দোব।"

ঘাড় নীচু কোরে মন্থর-চরণে রাও বেরিয়ে গেলেন। সবাইয়ের মুখ থেকে একসঙ্গে অস্ফুটে বেরুল, "বেশ লোকটি।"

দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্নে এসে দাঁড়ালো। রাও এলেন না, তার পরিবর্ত্তে এলেন তার ভাই, বললেন, "আপনাদের যাবার জন্যে কা কী বন্দোবস্ত কোরে দিতে হবে বলুন।"

বললাম, "সবই আমরা কোরে নিয়েছি, আর বিশেষ কিছু করতে হবে না। কিন্তু, রাও এলেন না কেন?"

"এখান থেকে ফিরে গিয়েই তাঁর ভীষণ জ্বর এসেছে। তবু সে আসতে চাইছিল আমার সঙ্গে। আপনার নাম কোরে বারবার বলছিল যে, যাবার আগে একবার দেখা করব তাঁর সঙ্গে।"

---

* গত বৎসর ৺পূজার সময় রাও একদল যাত্রী নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আমাদের বাড়ীতে একদিন ছিলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সকলে আমাদের দেশস্থ বাটীতে দুর্গাপূজা দেখতে গিয়েছিলাম। পূজা দেখে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলেন রাও। আর পূজার দালানে মায়ের সামনে কুম্ভকোনামের গাছ-প্রদীপ জ্বলছে দেখে প্রথমটা একটু আশ্চর্য্য হয়ে ছিলেন।

স্ত্রী বললেন, "আহা এই সময় বেচারীর জ্বর হল !"

সবাইয়েরই মনটা যেন অস্ফুটে বলে উঠল, "আহা !"

রাওয়ের ভাই আমাদের স্টেশনে তুলে দিতে এসেছিলেন। আর এসেছিলো আমাদের সেই চেঠী মহাশয়, যাঁর আশ্রয়ে আমরা ছিলাম। সঙ্গে অনেক ফুল-মালা ও মিষ্টান্ন। গাড়ী ছাড়বার ঘন্টা দিলে নমস্কার বিনিময় কোরে গাড়ীতে উঠে পড়লাম।

* * * *

ফিরে এলাম কলকাতায়। আসবার পথে শ্রীক্ষেত্র, কোনারক ও সাক্ষীগোপাল দেখে এলাম। ফেরার খবর পেয়ে নাতী-নাত্‌নী, আত্মীয়স্বজনেরা স্টেশনে এলেন নিতে। সুস্থ শরীরে স্বাস্থ্যোন্নতি কোরে ফিরে এসেছি দেখে তাদের মুখে হাসি আর ধরে না। আমারো কি আনন্দ কম হলো ! আপনার জন সবাইকে দেখে স্নেহ-মায়ার গ্রন্থিতে আর একবার পাক পড়ল।

মনে পড়ল, যাবার দিনের কথা। আর একদিন ঠিক এমনি কোরে এরা সমবেত হয়েছিল হাওড়া স্টেশনে। সেদিন এদের ছেড়ে যাবার আগে বুকটা আনচান কোরে উঠেছিল। তারপর ......দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতে, প্রান্তরে, তীর্থে, দেবস্থানমে ঘুরতে ঘুরতে সে বেদনার বোঝা কখন যে অতর্কিতে গা ঢাকা দিয়েছে, তা জানতেই পারি নি। আজ আবার প্রত্যাগমনের এই সন্ধি-সময়ে নতুন কোরে সেই বিদায়-বিধুর অনুভূতির কথা মনে পড়তে লাগল।

স্টেশন থেকে বাড়ী ফেরার পথে আত্মীয়স্বজনেরা প্রশ্ন করতে লাগল, "কেমন বেড়িয়ে এলেন, কী কী দেখলেন ?"

জবাব দিতে ইতস্ততঃ করছি দেখে আমার ভাই প্রভাত, বিলুর মা, খুকুমণি প্রভৃতি সবাই ভ্রমণ-কাহিনী শোনাতে লাগল। আমি কিন্তু চুপ কোরে রইলাম। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, মুখে বলে শেষ করবার জিনিষ এ নয়……এ শুধু অনুভূতির জিনিষ। মুখে বলে কতোটুকু পরিচয় সে সবের দেওয়া যায়! হৃদয় যা দেখে ভাষা হারায়, মন যা উপলব্ধি কোরে মূক হয়ে যায়—যার সান্নিধ্য মানুষকে বিমুগ্ধ, বিস্মিত, নির্ব্বাক করে…… যেখানের প্রতি ধূলিকণা……প্রতি প্রস্তরখণ্ড অমানুষিক ভক্তির, ঐকান্তিক সাধনার ও অসাধারণ নিষ্ঠার জয়গান করে। যেখানকার দেব-দেউলের গঠন-শিল্প অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দেয়……স্থাপত্য-কৌশল অভাবনীয় কৃতিত্বের ইতিহাস রচনা করে. সামান্য মুখের কথায় তার কতোটুকু রূপ মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব! যেখানকার দেব-দেবীর মহিমা-গাথা শুনে, শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হয়, যেখানকার সৃষ্টি আজো সভ্য-জগতের কাছে বিস্ময়ের বস্তু, বিজ্ঞানের কাছে গবেষণার বিষয়—জগতের কাছে, মানুষের কাছে আজো যা হিন্দুজাতির সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রতিভা ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় ঘোষণা করে……যে কীর্ত্তি যুগাতীত, কালাতীত……যে চিহ্ন, যে প্রমাণ, যে সাক্ষ্য সমস্ত আঘাত, প্রতিঘাত, সংঘাত প্রভৃতিকে উপেক্ষা কোরে আজো অম্লান, অপ্রতিহত……সামান্য মানুষ আমরা বর্ণনায়, ভাষায়, তার কতোটুকুর আভাষ দিতে পারি!

তাই মনে মনে ভাবি, এমন দেশ, এমন ধর্ম্ম পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি? জগতে এই একটি ধর্ম্ম আছে, যে ধর্ম্ম

অপর ধর্ম্মকে আঘাত করে না, হিংসা করে না, এমন কি ধর্ম্মপ্রচারের অজুহাতেও কোন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মিথ্যা নিন্দা প্রচার করে না। এই সেই ধর্ম্ম, যার অভ্যুত্থানের জন্য ভগবান নানা মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হয়ে লীলা-প্রচার করেছেন। এই সেই দেশ, যে মৃত্তিকার মাঝে ভগবান যুগে যুগে দেখা দিয়েছেন। এই সেই জাতি, যে জাতির মাঝে ভগবান মানব-রূপ পরিগ্রহ কোরে ভক্তি ও ভাবের বন্যায় সমস্ত পৃথিবী পরিপ্লাবিত করেছেন। ধন্য এই দেশ, ধন্য এই জাতি, ধন্য এর ধর্ম্ম।

তাই স্বামী বিবেকানন্দ গভীর অনুপ্রেরণায় উদাত্তস্বরে একদিন প্রচার করেছিলেন—"ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, বার্দ্ধক্যের বারাণসী—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

মোটর এসে বাড়ীর দ্বারে থামল, নামলাম। চারিদিকে চেয়ে দেখলাম একবার। এখানকার আবহাওয়া এখনো ঠিক তেমনি আছে। আমার বসবার ঘরটিতে এলাম......এখানটিও তেমনি আছে......বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নি। তেমনি সামনের সেল্‌ফে আলমারীতে সাজান সারি সারি বই......টেবিলের ওপর সযত্নে গোছান কাগজ-পত্র......ঘড়ি......পেপার-ওয়েট, পেন্সিল ......কলম। সবই সেই......পুরাতন অভ্যাসের নিদর্শন...... যৎসামান্যও বদলায় নি। এদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে হয় নিজেকে......এদের ওপর অনুরাগ আর আমায় তেমন

জোরে বিচলিত করে না। এরা ঠিক আছে, কিন্তু আমি বদলে গেছি। এখানে সবই গোছানো, কিন্তু আমার যেন সবই অগোছানো হয়ে গেছে। এ সব আর তেমন কোরে সেই পুরোনো দিনের মত কো'রে খাপ খাচ্ছে না।

দিন চলছে অপ্রতিহতগতিতে, আবার আরম্ভ হয়েছে সংসার-চক্রের অনুবর্তন। আজো দেখি, এরা আমায় কেউই পরিত্যাগ করে নি। এখনো কারণে-অকারণে সংসার আমার মতামতের অপেক্ষা করে, আমার পরামর্শ নিতে আসে। কিন্তু সংসার আমার কাছে সং-সার হয়ে গেছে। সেই সারিতে সার দিয়ে দাঁড়াতে আমার যেন কেমন বাধো বাধো ঠেকে। আমি যেন অন্যরকম হয়ে গেছি—যেন থেকেও নেই। সত্যি, আজ আমি হারিয়ে গেছি। নিজেকে নিজে তেমন কোরে খুঁজে পাই নে......ডাক দিলে তেমন কোরে সাড়াও পাই নে।

তবু সহস্র তাগিদে, অসংখ্য অভিযোগে সংসার যখন আমায় জাগাবার চেষ্টা করে, তখন মুখ দিয়ে আমার কথা বেরোয় না। নির্ব্বাক-বিস্ময়ে আমি চেয়ে থাকি, আর মন আমার শব্দহীন, ভাষাহীন, বাক্যহীন চপল আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে ওঠে—আমি নেই, আমি নেই, আমি নেই!

এই সুযোগে প্রতিধ্বনির মত আর একজন কে যেন বলে ওঠে, "সত্যি যদি নেই তো, এ কে?" সংশয়াকুল চিত্তে ভাবি, "তাই ত, এ তবে কে?"

তখুনি দাক্ষিণাত্যের পবিত্র তীর্থে যাকে খুঁজেছি, দেখেছি,

পেয়েছি, অনুভব করেছি—সেই মন এ সংশয়ের সমাধান কোরে বলে, "ফুল ঝরে গেলে বৃন্তে যেমন তার আভাষ থাকে, সূর্য্য ডুবে গেলে যেমন কিরণচ্ছটায় তার কাহিনী লেখা থাকে, আত্মা চলে গেলে যেমন দেহ পড়ে থাকে—এও তেমনি, এরা ক্ষণিকের !"

সংজ্ঞা নির্দ্দেশ কোরে আবার বলে, "এ যা দেখছ, তা পুরাতনের ছায়া, অভ্যাসের স্মৃতিচিহ্ন।"

সমস্ত শরীরে আনন্দের বিদ্যুৎ শিউরে শিউরে ওঠে, নির্জ্জনে বসে বারবার কোরে বলি, "কী পাই নি ! পেয়েছি অনেক। যা পেয়েছি, তার সঙ্গে সমস্ত জীবনের পাওয়ার তুলনা হয় না। মুখে বলে কী বোঝাব এর ?"

তবু সাধারণে যখন অভ্যস্তকণ্ঠে সেই পুরাতন প্রশ্নে জিজ্ঞেস করে, "সুফল কী পেলেন ?"

বলি, "পাই নি কিছুই, বরং হারিয়েছি। লাভের বদলে লোকসানই হয়েছে।" কিন্তু, এ লোকসান যে কতো লাভের সঙ্গে সমানে ওজন হয়, এ হারানো যে কতো পাওয়ার সঙ্গে সমানে মাপা যায়, তা যার হারিয়েছে, যার লোকসান হয়েছে, সেই জানে। সাধারণে এর কতোটুকু বুঝবে ?

হারাবার জন্যেই যে এই তীর্থযাত্রা, তা কি কেউ বুঝবে ? এ হারানোর সঙ্গে স্থাবর-অস্থাবরের সংশ্রব নেই—এর সংশ্রব জীবনের সঙ্গে, মনের সঙ্গে, আত্মার সঙ্গে।

তাই মাঝে মাঝে নিজের আনন্দে নিজেকে শোনাই—

"হৃদয় আমার হারিয়ে গেছে কোনখানে,
সে বারতা কেউ না জানে, কেউ না জানে।"

সত্যি, এ খবর কেউ জানে না, যারা সঙ্গে গিয়েছিল, তারাও না।

যে আমি একদিন বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিলাম চারিদিকে, মিশে ছিলাম সংসার-ধর্ম্মের পাকে পাকে, সেই আমি একান্ত হয়ে হারিয়ে গেছি দক্ষিণ-ভারতের দেব-দেউল ও পুণ্যতীর্থের মাঝে। আমার অন্তর আজো কাঙাল, আজো উপবাসী। তাই এই হারিয়ে-যাওয়া আমিকে কখনো দেখি তিরুপতি-বালাজীর মন্দির-দ্বারে, কখনো দেখি মাদুরায় মীনাক্ষী-দেবীর গোপুর-দ্বারে...... কখনো বল্কলমের সভামণ্ডপে, কখনো বা কন্যাকুমারিকার সুবিস্তৃত বেলাভূমে। বৈরাগী বাউলের বেশে সে প্রব্রজ্যা করেছে। কণ্ঠে তার তুলসীর মালা, ললাটে ত্রিপুণ্ড, অঙ্গে নামাবলী, হাতে একতারা। মুখে শুধু এক মন্ত্র, এক বাণী, এক গান। বারংবার সে শুধু বলছে—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥"

* * * *

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

---

# পরিশিষ্ট (ক)

সমগ্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে চারটি ভাষার আধিপত্য। যথা—তামিল, তেলেগু, মালেয়ালম্, কন্নাড়া। এই চার র মধ্যে তামিল ও তেলেগুই সমধিক প্রচলিত। তা ছাড়া, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই-ই প্রায় অল্পবিস্তর ইংরাজী জানে। তবু প্রয়োজন বোধে কয়েকটি দরকারী কথার তামিল ও তেলেগু ভাষান্তর দিলাম। আশা করি, এই ক'টি কথা মনে রাখলে অসুবিধার হাত থেকে অনেক সময় নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

ধরুন, জিজ্ঞেস করতে হবে, "কত গাড়ী ভাড়া ?" তামিলে এর ভাষান্তর হচ্ছে, "এত্রাই বাণ্ডি ওয়ার্ডাকে ?" আর তেলেগুতে হচ্ছে, "এণ্ডা বাণ্ডি আদ্দে ?"

হয়ত জিজ্ঞেস করবেন, "কতদূর ?" তামিলে এর ভাষান্তর হচ্ছে, "এন্না দূরম্ ?" আর তেলেগুতে হচ্ছে, "এণ্ডা দূরম্ ?"

কিম্বা জিজ্ঞেস করবেন হয়ত, "কতো দাম ?" তামিলে বলতে হবে, "এত্রাই বিলাই ?" আর তেলেগু হলে বলতে. হবে, "এণ্ডা বেলা ?"

মনে করুন, সে হয়ত বললে, "ওকাটি রূপয়।" কথাটা তেলেগু, মানে হচ্ছে, 'এক টাকা'। আর তামিলে 'এক টাকা'-কে বলে 'ওম্ন রূপা।'

তামিলে 'এক পয়সা'-কে বলে "কাল আনা" ; তেমনি 'সিকি' বা 'চার আনা'-কে বলে, "কাল রূপা। 'কাল' কথাটা থেকে মনে হয়, 'সিকিভাগ' বোঝায়।

ঘরের বা বাড়ীর ভাড়াকে তামিল ভাষায় বলে 'বাডাগাড' ও তেলেগুতে বলে 'আদ্দে'। পানকে তামিলে বলে 'বেত্তেলে' ও তেলেগুতে বলে 'তামালা পাকু'। আবার তামিলে সুপুরিকে বলে 'পাকু' আর তেলেগুকে বলে, 'চক্কা'।

---

# পরিশিষ্ট (খ)

নীচে আরো কয়েকটি দরকারী কথার ভাষান্তর দিলাম ঃ—

| বাংলা | তামিল | তেলেগু |
|---|---|---|
| জল | জলম্ | জিলু́ |
| চাল | আরিসী | বাঁয়স্ |
| লবণ | উপ্প্ | উপ্প্ |
| দুধ | পাল্ | পাল্ |
| তেল | ইয়েন্নাই | নূনে |
| দই | তাইর | পেরুণ্ডু |
| পাকা কলা | বালাই পড়ম | আরেটি পাণ্ডু |
| মধু | তেনে | থেন্যে |
| দোকান | কাডাই | দোকানমু |
| চাকর | বেলে কারণ | নৌখারি |
| দীপ | বিলাক্কু | দীপম্ |
| নদী | আরু | এরু |
| পুষ্করিণী | কুলাম্ | তটাকামু |
| পাইখানা | কাকুস | দোডিড |
| কলাপাতা | ওয়ালাই এলাই | আরেটি আকু |
| মন্দির | কয়েল | দেবালয়ম্ |
| ধূপ | উদুবাত্তি | উদুবাত্তি |

সমাপ্ত

# শুদ্ধিপত্র

| পৃষ্ঠা | পঙক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৯ | ২ | জান্যুয়ারী | ফেব্রুয়ারী |
| ২৩ | ৪ | সত্ত্বাবিকারী | স্বত্বাধিকারী |
| ২৫ | ৯ | ভ্রমণেচ্ছ | ভ্রমণেচ্ছু |
| ৩০ | ১৫ | কীর্ত্তির্গাথা | কীর্ত্তিগাথা |
| ৩৫ | ১৫ | মন্দির-প্রাঙ্গনের | মন্দির-প্রাঙ্গণের |
| ৪০ | ৭ | প্রাণপন | প্রাণপণ |
| ৪৪ | ১১ | ভান | ভাণ |
| ৪৫ | ১০ | পূর্ব্বঘাট | পশ্চিমঘাট |
| ৪৫ | ১১ | পশ্চিমঘাট | পূর্ব্বঘাট |
| ৫০ | ৩ | শ্রোতধারা | স্রোতধারা |
| ৫১ | ১৯ | মূর্ত্তি | মূর্ত্তি |
| ৫২ | ৭ | গু | ও |
| ৫৫ | ১১ | কারে | কোরে |
| ৫৮ | ২০ | বুঝয়ে | বুঝিয়ে |
| ঐ | ২১ | বৌদ্ধবর্ম্ম | বৌদ্ধধর্ম্ম |
| ৬৩ | ৬ | ভ্রমণেচ্চু | ভ্রমণেচ্ছু |
| ৭২ | ১৮ | প্রাঙ্গনে | প্রাঙ্গণে |
| ৮০ | ১৮ | ডুস্কর | দুষ্কর |
| ৮৪ | ৮ | পঞ্চত্ত্ব | পঞ্চত্ব |
| ৮৭ | ১১ | মন্দির-প্রাঙ্গনে | মন্দির-প্রাঙ্গণে |

| পৃষ্ঠা | পঙক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৯২ | ১০ | মন্দির-প্রাঙ্গনে | মন্দির-প্রাঙ্গণে |
| ৯৩ | ৬ | কামাক্ষা | কামাক্ষী |
| ঐ | ঐ | তাঞ্জোর | তাঞ্জোরে |
| ৯৪ | ৬ | নিচের | নীচের |
| ৯৪ | ৭ | চুণেব | চূণের |
| ৯৫ | ৭ | জেষ্ঠি | জোষ্ঠী |
| ঐ | ৯ | জেষ্ঠি | জ্যেষ্ঠী |
| ৯৫ | ১৭ | কিবীট | কিরীট |
| ৯৮ | ১২ | ধম্মই | ধর্ম্মই |
| ১১১ | ১১ | অক্ষৌহিনী | অক্ষৌহিণী |
| ১৩১ | ১ | সত্ত্বাবিকারীর | স্বত্বাধিকারীব |
| ১৩৬ | ১৮ | মতরাদী | মতবাদী |
| ১৩৭ | ২১।২২ | আছে | আছেন |
| ১৪৮ | ১৫ | সবোবরটির | সরোবরটির |
| ১৪৯ | ১৮ | শিলাতরণ-এ | শিলাতরণ এ |
| ১৬১ | ১০ | সপ্তফনা | সপ্তফণা |
| ১৭১ | ২২ | সংশ্রব | সংস্রব |
| ১৮০ | ১১ | পড়ল | পড়ল |
| ১৮৫ | ১ | যেন | যেন |
| ১৯১ | ৯ | ছাডা | ছাড়া |
| ১৯৩ | ১১ | গহণা | গহনা |
| ১৯৫ | ৫ | স্থান | স্নান |

| পৃষ্ঠা | পঙক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ১৯৮ | ৮ | সহধর্ম্মিনী | সহধর্ম্মিণী |
| ২০১ | ৮ | যখ | যখন |
| ২০১ | ৮ | সমাপণ | সমাপন |
| ২০২ | ৪ | অর্ন্তভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত |
| ২০৫ | ১৬ | বক্ষোপুরের | বক্ষঃপুরের |
| ২০৬ | ৪ | চৈতন্য-চরিতাম্ময়ত | চৈতন্য-চরিতামৃতে |
| ২১২ | ২২ | দূটি | দুটি |
| ২১৩ | ২২ | প্রজ্জ্বলিত | প্রজ্বলিত |
| ২১৪ | ৫ | সুন্দরেশ্বর | সুন্দরেশ্বরের |
| ২১৫ | ১২ | রাজাধানী | রাজধানী |
| ২২৪ | ১৬ | সমর্পন | সমর্পণ |
| ২২৬ | ২ | অণুপাতে | অনুপাতে |
| ২৪৪ | ১৮ | ক্ষুন্ন | ক্ষুণ্ণ |
| ২৪৫ | ৫ | উপভোগ | উপভোগ |
| ২৫৪ | ১১ | পুত্রেষ্ঠি | পুত্রেষ্টি |
| ২৬০ | ৮ | দিনকরডুব | দিনকর ডুব |
| ২৭২ | ১ | অর্ন্তভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত |
| ২৭৯ | ৫ | ব্র্যাঘ্র-চর্ম্মের | ব্যাঘ্র-চর্ম্মের |
| ২৮২ | ১৬ | হতেলাগল | হতে লাগল |
| ২৮৫ | ১৭ | কবব | করব |

কলিকাতা হইতে
ভিজিয়ানগ্রাম
ওয়ালটেয়ার
ভিজিগাপট্টম
রাজমহেন্দ্রী
বেজোয়াদা
গুন্টুর
গুডুর
রেনিগুণ্টা
তিরুপতি
আরকোনাম
মান্দ্রাজ
কাতপদী
(অরুণাচলম)
তিরুবন্নমলয়
চিংলিপুট
বঙ্গোপসাগর
মহীশূর
ভিলুপুরম
পণ্ডিচারী
বৃদ্ধাচলম
কুদালোর
ওতকামণ্ড
চিদম্বরম
মায়াভরম
ত্রিচিনপল্লী
কুম্ভকোনম
তাঞ্জোর
কোদাইকানাল
ডিণ্ডিগাল
পাম্বান
রামেশ্বরম
কোচিন
তেনকাসি
রামনদ
ধনুষ্কোটি
কুইলন
তিনেভেলি
টিউটিকোরিন
ত্রিবেন্দ্রাম
শুচীন্দ্রম
নাগের কয়েল
কন্যাকুমারিকা
সিংহল